

সিলেক্টেড মিস্ট্রি স্টোরিজ

আলফ্রেড হিচকক

অনুবাদ

অনীশ দাস অপু

শামীম পারভেজ

সিলেক্টেড মিস্ট্রি স্টোরিজ

মূল আলফ্রেড হিচকক

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

শামীম পারভেজ

নালন্দা

প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল নালন্দা, ৬৯ প্যারীদাস রোড ঢাকা-১১০০
স্বত্ব	অনুবাদকদ্বয়
প্রচ্ছদ	ধ্রুব এষ
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০০৮
মুদ্রণ	অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস ৬ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা ১১০০
বর্ণবিন্যাস	সিফাত কম্পিউটার ৪০/৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মূল্য	৩০০.০০ টাকা মাত্র

Selected Mesties Stories	Edited by Alfred Hitchcock
First Edition	February 2008
Publisher	Redwanur Rahman Jewel Nalonda 69 Payridas Road Banglabazar Dhaka-1100
Phone	01552456919
Price	300.00 Taka only
ISBN	984 70093 0017 2
email:	nalondaa@yahoo.com.

ভূমিকা

বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্রকার আলফ্রেড হিচককে বলা হয় কিং অব সাসপেন্স। জীবদ্দশায় 'দ্য বার্ডস', 'দ্য থার্টি নাইন স্টেপস'-সহ অসংখ্য রহস্য ছায়াছবি নির্মাণ করেছেন তিনি। তবে তার চেয়েও বেশি সম্পাদনা করেছেন রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্য। তাঁর নির্বাচিত সম্পাদিত গ্রন্থগুলো হটকেকের মত বিক্রি হতো সারা বিশ্বে। কারণ হিচকক তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে বিশ্বসেরা রহস্য সাহিত্যিকদের দূর্দান্ত সব রহস্য গল্প নির্বাচিত করতেন। আমাদের দেশের পাঠকরা আলফ্রেড হিচকক নামটির সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই অসাধারণ লেখকটির সম্পাদিত কোন বই বাংলাদেশে কেউ প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়নি। আমরাই প্রথম সেই উদ্যোগটি গ্রহণ করেছি। আমরা এ বইতে হিচকক সম্পাদিত অত্যন্ত জনপ্রিয় কিছু গল্প সংকলন থেকে বিশ্বের সেরা রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যিকদের রচিত অসাধারণ কিছু গল্প অনুবাদ করেছি। হিচককের সম্পাদিত যেসব বই থেকে এ গল্পগুলো অনুবাদ করা হয়েছে সেসব বইয়ের মধ্যে রয়েছে– **'MORE STORIES NOT FOR THE NERVOUS', 'GAMES KILLERS PLAY', ALIVE AND SCREAMING', 12 STORIES FOR LATE AT NIGHT', SCREAM ALONG WITH ME', DATES WITH DEATH', NOOSE REPORT'|**
যারা প্রকৃত বিদেশী রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যের আস্বাদন পেতে চান একনিমিষে নিয়ে যাবে রহস্যের অজানা ও লোমহর্ষক জগতে।

অনীশ দাস অপু
শামীম পারভেজ

সূচি

দ্য বার্ডস
দফনে দু মরিয়ে

ডিসেম্বরের তিন তারিখে হুট করে বদলে গেল আবহাওয়া, নেমে এলো শীত। এর আগ পর্যন্ত বইছিল শরতের মৃদু-মন্দ বাতাস। গাছে সোনালি-লাল পাতা, বেড়া-ঝোপের রঙও ছিল সবুজ। কর্ষণ করা জমি ছিল উর্বর।

যুদ্ধে অশক্ত হয়ে যাওয়া ন্যাট হোকেন খামারে পুরো সময় ব্যয় করত না পেনশন পায় বলে। হপ্তায় তিন দিন গতর খাটায় সে, ওরা ওকে হালকা কাজ দেয়; বেড়া দেওয়া, খড় কিংবা তালপাতা দিয়ে ঘরের ছাউনি বানানো, খামার-বাড়ির ছোটখাট মেরামত ইত্যাদি।

বিবাহিত ন্যাট তিন সন্তানের জনক, তবু একাকী সে; ভালবাসে একা কাজ করতে। কেউ ওকে নদীর তীরে ঢিবি তৈরি করতে দিলে খুশি হয় কিংবা খাঁড়ির শেষ মাথায় গেট বানানোর কাজ পেলে আনন্দিত হয়ে ওঠে। বাড়ির ধারে সাগর ফার্ম ল্যান্ডটাকে দু'দিক থেকে ঘিরে আছে। দুপুর বেলা কাজে বিরতি দেয় ন্যাট। বউ'র দেওয়া মাংসের বড়া খায় এবং পাহাড় চুড়োয় বসে পাখি দেখে। পাখি-দর্শনের জন্যে বসন্তের চেয়েও ভাল হলো শরৎকাল। বসন্তে পাখিরা সমুদ্র থেকে দূরে চলে যায়। তবে যারা মাইগ্রেট করেনি বা অন্য দেশে উড়াল দেয়নি, শীতকালটা এখানেই কাটিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল, তারাও চলে যাওয়ার দূরন্ত ইচ্ছায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এদের জীবন চক্রটা এমনই, অভিবাসী হওয়ার সুযোগ ঘটে না। দল বেঁধে আসে তারা খাঁড়ি বা উপদ্বীপে, অস্থির আর চঞ্চল, সারাক্ষণই রয়েছে ব্যস্ততার মাঝে; এই চক্রাকারে ঘুরছে, বৃত্ত নিয়ে চক্কর দিচ্ছে আকাশে, আবার মাটিতে নেমে আসছে খাবার খেতে। তবে খায়ও অনিচ্ছায়, যেন খিদে পায়নি। অস্থিরতা ওদেরকে আবার উড়িয়ে নিয়ে যায় শূন্যে।

সাদা-কালো, দাঁড়কাক এবং শঙ্খচিল, অদ্ভুত একটা অংশীদারিত্ব গড়ে নিয়ে একত্রে মিলে মিশে থাকে, এক ধরনের স্বাধীনতা খুঁজে বেড়ায়, সবসময় অসন্তুষ্ট এবং সর্বদা অশান্ত। স্টারলিং-এর দল, মখমলের মতো খসখস শব্দ করে, উড়ে যায় তাজা তৃণভূমিতে, এ যেন স্রেফ অস্থিরতার কারণেই ওড়া, আর ছোট পাখিগুলো, ফিন্‌চ ও ভরতের দল গাছ থেকে লাফিয়ে ঝোপের উপর গিয়ে পড়ে, যেন বাধ্য করা হয়েছে তাদেরকে।

ন্যাট লক্ষ করে ওদেরকে, সী-হার্ড বা সামুদ্রিক পাখিগুলোকেও দেখে। উপসাগরের ধারে স্রোতের জন্য অপেক্ষা করে তারা। এদের ধৈর্য্য অন্যদের চেয়ে বেশি। অয়েস্টার-ক্যাচার, রেড শ্যাঙ্ক স্যান্ডারলিং ও কারলিউরা অপেক্ষা করে জলের কিনারে; সাগরের জল ডুবিয়ে দেয় তীর, তারপর নেমে যায়, পড়ে থাকে সামুদ্রিক

আগাছা আর অমসৃণ নুড়ি, দৌড়ে যায় সামুদ্রিক পাখিরা, ছোটাছুটি করতে থাকে তীরে, তাদেরও তখন ওড়ার ইচ্ছে জাগে। চিৎকার- চেঁচামেচি করে তারা, শিস দেয়, ডাকে, আলতোভাবে ছুঁয়ে যায় ঝলমলে সাগর, তারপর দ্রুত ত্যাগ করে তীর। স্বল্পকালের শরৎ নিয়ে তারা সন্তুষ্ট নয়, শীতের আগমন ওদেরকে আতঙ্কিত করে তোলে।

পাহাড় চুড়োয় বসে মাংসের বড়া চিবোতে চিবোতে ভাবে ন্যাট সম্ভবত শরৎ পাখিদের কাছে একটা সতর্কবার্তার মত। সাবধান করে দেয় শীত আসছে। শীতে মারা যায় অনেকেই।

এবারে পাখিগুলো বছরের এ সময়টাতে যেন অন্যান্যবারের চেয়ে বেশি অস্থির। দিনগুলো স্থির বলে ওদের উত্তেজনাটা প্রকটভাবে ধরা দেয় চোখে। পশ্চিমের পাহাড়ে ট্রাক্টর চালায় যে চাষা সেও ন্যাটের মন্তব্য সমর্থন করে বলেছিল, 'হ্যাঁ, এবারে একটু বেশিই চোখে পড়ছে পাখিদের আনাগোনা। আর সাহসও যেন বেশি। আবার ট্রাক্টরকে কেউ কেউ পাত্তাই দিতে চায় না। আজ বিকেলে দুটো সীগাল মাথার উপরে এমনভাবে উড়ছিল, যেন ঠুকরে ফেলে দেবে মাথার ক্যাপ। আমার মনে হচ্ছে বদলে যাবে আবহাওয়া।

ন্যাটের শোয়ার ঘর পূর্ব দিকে মুখ করা। রাত দুটোর দিকে বাতাসের শব্দে জেগে গেল সে। চিমনি থেকে শোঁ শোঁ আওয়াজ আসছে। পুবালি বাতাস। ঠাণ্ডা ও শুকনো। ছাদের একটা সেলেট পাথর সম্ভবত আলগা হয়ে গেছে। ঠকঠক শব্দ হচ্ছে। কান পাতল ন্যাট। উপকূলে গর্জাচ্ছে সাগর। ছোট কামরাটি হঠাৎ শীতল হয়ে উঠেছে; দরজার ফাঁক দিয়ে বসে আসা দমকা বাতাস আছড়ে পড়ল বিছানায়। গায়ে কম্বল টেনে দিল ন্যাট, ঘুমন্ত স্ত্রীর দিকে একটু সরে এল, চোখ এবং কান সতর্ক।

জানালায় হঠাৎ ঠক ঠক শব্দ। কটেজের দেয়াল ঘেঁষে কোনও গাছ নেই যে ডালের বাড়ি খেয়ে এমন শব্দ তুলবে। শব্দটা হতেই লাগল। শেষে বিরক্ত ন্যাট নেমে পড়ল বিছানা থেকে, গেল জানালার ধারে। খুলল। সাথে সাথে হাতে কিছু একটা ঘষা খেল, আঙুলের গাঁটে ঠোকর দিল, আঁচড় কাটল চামড়ায়। পতপত শব্দে একজোড়া ডানা ঝাপটাল, উড়ে গেল ছাদের উপরে, সেখান থেকে বাড়ির পিছনে।

একটা পাখি। কী পাখি বলতে পারবে না ন্যাট। ভাল করে দেখতে পায়নি। বাতাসের তান্ডবে নিশ্চয় আশ্রয়চ্যুত হয়েছে।

জানালা বন্ধ করে দিল সে। ফিরে এলো বিছানায়। আঙুলের গাঁট চুষছে। ঠোকর মেরে রক্ত বের করে দিয়েছে পাখিটা। ঘুমাবার চেষ্টা করল ন্যাট।

আবার ঠক ঠক শব্দ। যেন জিদ ধরে ঠোকর দিচ্ছে। শব্দে জেগে গেল ন্যাটের বউ। স্বামীর দিকে পাশ ফিরে বলল, 'জানালাটা একটু দ্যাখো তো, ন্যাট। ঠকর ঠকর শব্দ হচ্ছে কেন!'

'পাখিটিকে হঠাও', বলল বউ। 'এমন শব্দ হলে ঘুমাব কী করে ?'

দ্বিতীয়বার জানালার সামনে গেল ন্যাট। খুলে দেখল একটি নয়, কমপক্ষে আধডজন পাখি বসে আছে জানালার চৌকাঠে; ওগুলো সোজা উড়ে এলো ন্যাটের মুখ লক্ষ্য করে, হামলা চালিয়ে বসল।

চিৎকার দিল ন্যাট, হাত দিয়ে বাড়ি মেরে সরিয়ে দিল সব ক'টাকে; প্রথমটার মতো এরাও উড়ে গেল ছাদে, তারপর চোখের আড়ালে। ঝট করে জানালা বন্ধ করল ন্যাট, লাগিয়ে দিল ছিটকিনি।

'শব্দ শুনেছ ?' বলল সে। 'ওরা আমাকে হামলা করেছিল। অন্ধ করে দিতে চেয়েছে।' জানালার সামনে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে উঁকি দিচ্ছে ন্যাট। কিছুই চোখে পড়ছে না। ঘুমে প্রায় আচ্ছন্ন ন্যাটের বউ বিড়বিড় করে কী বলল, বোঝা গেল না।

'আমি এখানে সারা রাত দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে পারব না', বউ'র নিস্পৃহ আচরনে রেগে গেছে ন্যাট। 'পাখিগুলো জানালার চৌকাঠে ছিল, শুনছ ? ঘরে ঢোকার চেষ্টা করেছে।'

এমন সময় প্যাসেজে, বাচ্চাদের ঘর থেকে ভেসে এলো ভয়ার্ত চিৎকার।

'জিল', শব্দে ঘুম টুটে গেছে ন্যাটের স্ত্রীর, উঠে বসেছে বিছানায়। 'শিগ্‌গির যাও। দেখো কী হলো মেয়েটার।

মোম জ্বালালো ন্যাট, বেডরুমের দরজা খুলে পা বাড়িয়েছে প্যাসেজে, এক ঝলক বাতাস নিভিয়ে দিল বাতি।

আতঙ্কিত আর্তনাদ শোনা গেল আবার, এবার দু'টি বাচ্চা একসঙ্গে চিৎকার করছে। হোঁচট খেতে খেতে ওদের ঘরে ঢুকলো ন্যাট, অন্ধকারে টের পেল ডানার ঝটপটানি। জানালা হাট করে খোলা। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি ঢুকছে ভিতরে, প্রথমে বাড়ি খাচ্ছে ঘরের ছাদে এবং দেয়ালে, তারপর উড়ন্ত অবস্থায় বাঁক নিয়ে ছুটে যাচ্ছে বাচ্চাদের বিছানা লক্ষ্য করে।

'ভয় নেই, আমি এসে পড়েছি', চেঁচাল ন্যাট। বাচ্চারা কাঁদতে কাঁদতে বিছানা থেকে লাফ দিল, জড়িয়ে ধরল তাদের বাবাকে। অন্ধকারে পাখিগুলো টার্গেট হিসেবে বেছে নিল ন্যাটকে। 'কী হয়েছে ন্যাট, কী হয়েছে ?' বেডরুম থেকে জোর গলায় ডাকলো তার স্ত্রী। সন্তানদেরকে ধাক্কা দিয়ে প্যাসেজে বের করে দিল ন্যাট। তারপর বন্ধ করে দিল দরজা। বাচ্চাদের শোয়ার ঘরে সে এখন একা। আর আছে পাখিগুলো।

হাতের কাছের বিছানা থেকে একটা কম্বল টেনে নিল ন্যাট, ডানে-বামে, শূন্যে ঘোরাতে লাগল। টের পেল কম্বলের গায়ে বাড়ি খাচ্ছে পাখিগুলো, শব্দ হচ্ছে থ্যাচ্ করে, কিন্তু রণে ভঙ্গ দিল না ওরা। বাড়ি খেয়ে দেয়ালে ছিটকে পড়ছে একটা, পরক্ষণে তেড়ে আসছে পাঁচটা। কামড় বসাচ্ছে, ঠোকর দিচ্ছে ন্যাটের হাতে, মাথায়। ছুঁচাল কাঁটা চামচের মতো ধারাল ওদের ঠোঁট। আত্মরক্ষার অস্ত্র কম্বলটা মাথায় বেঁধে নিল ন্যাট। এবার খালি হাতে শুরু করল লড়াই। দরজা খুলতে সাহস পাচ্ছে না। পাখিগুলো ওর পিছন পিছন বেরিয়ে পড়তে পারে ঘর থেকে।

অন্ধকারে কতক্ষণ লড়াই চালিয়ে গেছে জানে না ন্যাট, তবে অবশেষে ডানা ঝাপটানোর শব্দ কমে এল, একসময় আর শোনা গেল না। দাঁড়িয়ে রইল ন্যাট, কান খাড়া; বেডরুম থেকে বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। বন্ধ হয়ে গেছে ডানা ঝাপটানোর ভীতিকর শব্দ।

কম্বলটা দিয়ে চোখও বেঁধে রেখেছিল ন্যাট। কম্বলের বাঁধন খুলল। তাকালো চারদিকে। ঠাণ্ডা, ধূসর ভোরের আলো ঢুকেছে ঘরে। সকাল হয়ে গেছে বলে কেটে পড়েছে পাখিগুলো। মৃতগুলো মেঝের উপর। ক্ষুদে লাশগুলোর দিকে আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে থাকল ন্যাট। হতভম্বও। সবগুলোই আকারে ছোট, কমপক্ষে পঞ্চাশটা হবে সংখ্যায়। আছে দোয়েল, ফিঞ্চ, চড়ুই, ব্লু টিট এবং ব্রাম্বলিং। প্রাকৃতিক নিয়মে এরা যে যার অঞ্চলে দল বেঁধে থাকে। কিন্তু যুদ্ধের উন্মাদনায় এক হয়েছিল সবাই। কয়েকটা পাখির গা থেকে ঝরে গেছে পালক, কিছুর ঠোঁটে রক্ত। ন্যাটের রক্ত।

অসুস্থ বোধ করল ন্যাট, জানালার ধারে গেল। তাকালো মাঠ আর বাগানের দিকে।

ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়েছে। তুষার জমেছে মাটিতে। সাদা নয়, কালো। এ তুষার ভোরের সূর্যের আলোয় ঝলমল করে না। পুবালি বাতাস বয়ে এনেছে কালো তুষার। জোয়ারের টানে ফুঁসে উঠেছে সাগর, মাথায় সাদা ফেনার মুকুট পরে সজোরে আছড়ে পড়ছে উপকূলে। কোথাও একটিও পাখি দেখা যাচ্ছে না। বাগানের গেটে নেই চড়ুইর কিচিরমিচির, মিশেল থ্রাশ কিংবা ব্ল্যাক বার্ড ঘাসের বুকে খুঁজছে না পোকা। পুবালি বাতাস আর ঢেউয়ের গর্জন ছাড়া নিস্তব্ধ প্রকৃতি।

ছোট বেডরুমের দরজা ও জানালা বন্ধ করল ন্যাট। প্যাসেজ পার হয়ে ঢুকলো নিজের ঘরে। ওর স্ত্রী বসে আছে বিছানায়, একটি বাচ্চা ঘুমাচ্ছে তার পাশে, ছোটটি কোলে, মুখে ব্যান্ডেজ। জানালায় শক্ত করে গোঁজা পর্দা, জ্বলছে মোমবাতি। হলদে আলোয় ঝলমলে দেখাচ্ছে চেহারা। মাথা নেড়ে কথা বলতে নিষেধ করল সে। 'ছেলেটা এইমাত্র ঘুমিয়েছে', ফিসফিস করল মহিলা।' কোন কিছুতে বাড়ি খেয়েছে ও। চোখের কোণে রক্ত ছিল। জিল বলল পাখি। ঘুম থেকে জেগে দেখে ঘরভর্ত্তি পাখি।'

ন্যাটের দিকে তাকিয়ে আছে সে, মেয়ের কথা সত্যি কিনা জানতে চাইছে। তাকে আতঙ্কিত লাগছে, হতবুদ্ধি। ন্যাট ইচ্ছে করেই চেপে গেল সে-ও পাখির হামলার শিকার হয়েছিল, ঘণ্টা খানেক আগে।

'ওই ঘরে অনেকগুলো পাখি মরে পড়ে আছে', বলল ন্যাট। 'পঞ্চাশটার মত। নানা জাতের ছোট ছোট পাখি। পুবালি বাতাসে পাগলামিতে পেয়ে বসেছিল যেন ওগুলোকে।' স্ত্রীর পাশে বসল। হাত ধরল। 'আবহাওয়ার কারণে এমনটা ঘটেছে। পাখিগুলো বোধহয় এ অঞ্চলের নয়। দূর থেকে এসেছে। তাড়িয়ে এনেছে বাজে আবহাওয়া।' 'কিন্তু ন্যাট', গলায় স্বর নীচু ওর স্ত্রীর। 'আবহাওয়া তো শুধু কাল রাতে খারাপ হয়েছে এমন কোনও তুষারপাত হয়নি যে তাড়া খেয়ে ওরা এসেছে। ওরা ক্ষুধার্তও নয়। মাঠে ওদের জন্য প্রচুর খাবার আছে।'

'আবহাওয়া', পুনরাবৃত্তি করল ন্যাট। 'আমি বলছি, আবহাওয়ার কারণেই এমনটা হয়েছে।'

ওর চেহারাও ওর বউ'র মত। ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত। এক মুহূর্ত একজন অপরজনের চোখে চেয়ে থাকল কোনও কথা না বলে। 'নীচে যাচ্ছি আমি। চা খাব', বলল ন্যাট।

কিচেন বহাল তবিয়তে আছে দেখে স্বস্তি পেল সে। কাপ-প্লেটগুলো সুন্দরভাবে সাজানো টেবিলের উপর। স্ত্রীর উল বোনার জিনিসপত্র বাস্কেট চেয়ারে। বাচ্চাদের খেলনা কাবার্ডের এক কোনায়। সব ঠিক আছে।

ঝুঁকলো ন্যাট, লাকড়ি বের করে আগুন জ্বাললো ফায়ার প্লেসে। জ্বলন্ত কাঠের টুকরোগুলো যেন নিয়ে এলো স্বাভাবিকতা, ধোঁয়া ওঠা কেতলি আর বাদামী রঙের টিপট আরাম ও নিরাপত্তার প্রতীক। চা খেল ন্যাট, বউ'র জন্য একটা কাপ নিয়ে গেল। মুখ-হাত ধুয়ে নিল বাসন-মাজার ঘরে। পায়ে গলাল বুট। তারপর খুলল খিড়কির দরজা।

আকাশের রঙ সীসার মত। গতকালও বাদামী রঙের পাহাড়ের গায়ে ঝলসাচ্ছিল রোদ, আজ দেখাচ্ছে কালো ও নগ্ন। খুরের মতো গাছ-গাছালির উপর আক্রমণ চালিয়েছে পুবালি বাতাস, মাটিতে স্তূপ হয়ে আছে শুকনো পাতা, মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে উঠে পড়ছে শূন্যে, কাঁপতে কাঁপতে ছড়িয়ে পড়ছে এদিক-ওদিক। জুতো পরা পা দিয়ে মাটিতে লাথি কষাল ন্যাট। বরফ জমা কঠিন জমিন। এতো দ্রুত প্রকৃতি বদলে যায়। জীবনেও দেখেনি কিংবা শোনেনি ও। এক রাতের মধ্যে জেঁকে বসেছে কালো শীতকাল।

ঘুম থেকে জেগে গেছে বাচ্চারা। উপরতলায় বসে বাক বাকুম করে চলেছে জিল, ছোটটা, জনি, আবার তারস্বরে জুড়ে দিয়েছে কান্না। স্ত্রীর গলা শুনতে পেল ন্যাট, বাচ্চাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। একটু পর নীচে নেমে এলো ওরা। নাশতা তৈরি। শুরু হয়ে গেল দিনের রুটিন। 'তুমি পাখিগুলোকে তাড়িয়ে দিয়েছ ?' জিজ্ঞেস করল জিল। শান্ত দেখাচ্ছে ওকে। আগুন, দিনের আলো আর বাবার তৈরি নাশতা ওর মধ্যে স্বস্তি এনে দিয়েছে।

'হ্যাঁ, কেটে পড়েছে সব ক'টা', জবাব দিল ন্যাট। 'পুবের বাতাসের টানে ওরা এসে পড়েছিল এদিকে। পথ হারিয়ে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। খুঁজছিল আশ্রয়।'

'আমাদেরকে ঠোকর দেয়ার চেষ্টা করছিল ওরা', বলল জিল। 'আরেকটু হলে জনির চোখটা যেত।'

'ভয়ের চোটে অমন করেছে', ব্যাখ্যা করল ন্যাট। 'অন্ধকার ঘরে বুঝতে পারছিল না কোথায় এসেছে।'

'আর কখনও না এলেই বাঁচি', বলল জিল। 'জানালার বাইরে খাবার রাখব ওদের জন্য। খেয়ে হয়তো চলে যাবে।'

নাশতা শেষ করল জিল। কোট আর হুড পরতে চলে গেল। স্কুলে যাবে। ন্যাট কিছু বলল না। তার স্ত্রী টেবিলের ওপাশ দিয়ে তাকিয়ে আছে স্বামীর দিকে। নীরবে কথা হয়ে গেল দু'জনের। 'ওকে বাসে উঠিয়ে দিয়ে আসব আমি', বলল ন্যাট। 'আজ আর খামারে যাব না।'

জিল মুখ ধুচ্ছে, ন্যাট বউকে বলল, 'সবগুলো জানালা বন্ধ করে রাখবে, দরজাও। একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি। কাল রাতে কোথাও কিছু ঘটেছে কিনা জানা দরকার।'

ছোট মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। গতরাতের কথা বোধহয় ভুলে গেছে জিল। নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে বাপের সামনে, ছুটছে বাতাসে ভেসে বেড়ানো শুকনো পাতার পিছনে, হুডের নীচে ওর মুখখানা ঠাণ্ডা বাতাসে গোলাপি।

'বরফ পড়বে নাকি, বাবা ?' জানতে চাইল সে। 'কী ঠাণ্ডা!'

'নাহ্', জবাব দিল বাপ। 'বরফ পড়বে না। এবারের শীতে সাদা বরফ দেখতে পাবে না তুমি, কালো তুষার দেখবে।'

ঝোপঝাড়, মাঠ, বাগান, খামারের ওপাশে ছোট জঙ্গল সবখানে ন্যাটের চঞ্চল চোখ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যা খুঁজল, পেল না। একটি পাখিও নেই কোথাও।

বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো বাচ্চা, সবার মাথায় জিলের মতো হুড, ঠাণ্ডার কামড়ে মুখ সাদা।

জিল হাত নাড়তে নাড়তে দৌড়ে গেল ওদের কাছে। 'আমার বাবা বলেছে বরফ পড়বে না। এবারে কালো শীতকাল হবে।'

পাখি নিয়ে কোনও কথা বলল না বাচ্চাটা। আরেকটা মেয়ের সঙ্গে ঠেলাঠেলি শুরু করে দিল লাইনে দাঁড়ানো নিয়ে। পাহাড় থেকে স্বচ্ছন্দ গতিতে নেমে এলো বাস। ন্যাট দেখল তার মেয়ে ঢুকে পড়েছে বাসে, ঘুরল সে, হাঁটা দিল খামারের দিকে। আজ তার কাজ নেই। তবু সব ঠিক আছে কিনা দেখে আসবে একবার। গোয়ালা জিমকে দেখল উঠোনে।

'বস্ আছেন ?' জিজ্ঞেস করল ন্যাট।

'বাজারে গেছেন', জানাল জিম। 'আজ মঙ্গলবার না ?'

দ্রুত পা চালিয়ে একটা চালা ঘরের কিনারে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। ন্যাটের সঙ্গে কথা বলার সময় নেই তার। কাজ আছে। ন্যাট ভুলেই গিয়েছিল আজ মঙ্গলবার। এতেই বোঝা যায় গত রাতের ঘটনা ওকে কতটা নাড়া দিয়েছে। খামার-বাড়ির খিড়কি দরজায় চলে এলো ও। শুনতে পেল রান্নাঘরে রেডিওর বাজনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে গুনগুন করে গান গাইছেন মিসেস ট্রিগ।

'মিসাস আছেন নাকি ?' ডাকলো ন্যাট।

দোরগোড়ায় আবির্ভাব ঘটলো হাসিখুশি চেহারার, লম্বা-চওড়া এক মহিলার।

'হ্যালো, মি. হোকেন', বললেন তিনি। 'বলুন তো এই ঠাণ্ডাটা আসছে কোত্থেকে ? রাশিয়া থেকে ? আবহাওয়ার এরকম হঠাৎ পরিবর্তন কতদিন দেখিনি আমি। রেডিওতে বলল আরও শীত পড়বে। আর্কটিকে নাকি কী হয়েছে সে জন্য এমন ঠাণ্ডা পড়ছে।

'সকালে রেডিও শোনা হয়নি', বলল ন্যাট। 'রাতে একটা ঝামেলা হয়ে গিয়েছিল বাসায়।'

'বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়েনি তো ?'

'না...' ন্যাট বুঝতে পারছে না কীভাবে ব্যাখ্যা করবে ঘটনাটা। দিনের আলোতে পাখির সঙ্গে যুদ্ধের ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য ও অবান্তর শোনাবে।

মিসেস ট্রিগকে ঘটনাটা বলল বটে তবে মহিলার চাউনি দেখে বুঝতে পারল তিনি ওর কথা বিশ্বাস করেননি। ভেবেছেন দুঃস্বপ্ন দেখেছে ন্যাট।

'ওগুলো নিশ্চয় আসল পাখির মতো ছিল ?' হাসছেন তিনি। 'পালক-টালকসহ। লোকে ঘুমের মধ্যে অদ্ভুত আকারের যে সব পাখি দেখে সেরকম অবশ্যই নয়, তাই না ?'

'মিসেস ট্রিগ', বলল ন্যাট। 'পঞ্চাশটির মতো পাখি ছিল। রবিন, রেনসহ আরও হরেক রকম পাখি। বাচ্চাদের শোয়ার ঘরের মেঝেতে পড়েছিল। আমার উপর হামলা চালিয়েছে; জনির চোখ উপড়ে নিতে চেয়েছিল।'

মিসেস ট্রিগ স্থির দৃষ্টিতে দেখলেন ন্যাটকে, চোখে সন্দেহ।

'আবহাওয়ার কারণে হয়তো এসেছে', বললেন তিনি। 'আর্কটিক থেকে আসতে পারে।'

'না', বলল ন্যাট। 'সাধারণ পাখি। প্রতিদিন যেগুলোকে দেখেন।'

'অদ্ভুত ব্যাপার তো!' বললেন মিসেস ট্রিগ। 'ব্যাখ্যার অতীত, সত্যি। আপনি বরং গার্ডিয়ান পত্রিকায়-চিঠি লিখুন। ওরা আপনাকে তথ্য দিতে পারবে। আসি আসি। কাজ আছে।'

মুচকি হেসে রান্নাঘরে ফিরে গেলেন তিনি।

অসন্তুষ্ট ন্যাট চলে এলো খামার-বাড়ির গেটে। বেডরুমের মেঝেতে যদি মরা শরীরগুলো পড়ে না থাকত, যেগুলোকে এখন কবর দেবে ও, ন্যাটের কাছেও গল্পটা অতিরঞ্জিত মনে হত।

জিমকে দেখল দাঁড়িয়ে আছে গেটে।

'পাখি নিয়ে কোনও ঝামেলায় পড়েছ ?' জিজ্ঞেস করল ন্যাট।

'পাখি ? কীসের পাখি ?'

'গত রাতে আমাদের ঘরে ঢুকে যায়। খুবই হিংস্র স্বভাবের পাখি।'

'আচ্ছা ?' যে কোনও জিনিস নিজের মাথায় ঢুকতে সময় লাগে। 'হিংস্র কোনও পাখি-টাখির কথা শুনিনি', অবশেষে বলল সে। 'ওরা তো শান্ত প্রকৃতির হয়। জানালার ধারে মাঝে মধ্যে আসতে দেখেছি রুটির টুকরো-টাকরা খাওয়ার জন্য।'

'গত রাতের পাখিগুলো মোটেই শান্ত প্রকৃতির ছিল না।'

'ছিল না ? তা হলে হয়তো ঠাণ্ডার কারণে হিংস্র হয়েছে। খিদে পেয়েছিল। আপনি জানালার পাশে রুটির টুকরো টাকরা রেখে দেবেন।'

মিসেস ট্রিগের মতেই এ ব্যাপারে আগ্রহ লক্ষ্য করা গেল না জিমের মধ্যে। এ যেন যুদ্ধে এয়ার-রেইডের মত, ভাবলো ন্যাট। এ অঞ্চলের লোকে কোনও দিনই উপলব্ধি করতে পারবে না প্লিমাউথের মানুষকে কতটা ভোগান্তি সইতে হয়েছে।

বাড়ি ফিরে এলো ন্যাট। ওর স্ত্রী রান্নাঘরে। কোলে জনি।

'কারও সঙ্গে দেখা হলো ?' জানতে চাইল স্ত্রী।

'মিসেস ট্রিগ আর জিম', জবাব দিল ন্যাট। 'কেউই আমার কথা বিশ্বাস করেনি। তবে ওদিকে কিছুই ঘটেনি।'

'পাখিগুলোকে সরিয়ে ফেললে পারতে', বলল ওর স্ত্রী। 'বাচ্চাদের বিছানা করব। কিন্তু ও ঘরে ঢুকতে ভয় লাগছে।'

‘ভয়ের কিছু নেই’, বলল ন্যাট। ‘ওগুলো তো মরা।’

একটা বস্তা নিয়ে বেডরুমে ঢুকলো ন্যাট। শক্ত শরীরগুলো ছুঁড়ে ফেলল ওটার ভিতরে। মোট পঞ্চাশটা। সাধারণ পাখি সবক’টা, আকারে থ্রাশের চেয়েও ছোট। ভয়ের চোটেই বোধহয় এদিকে এসে পড়েছিল। ব্লুটিট, রেন, এদের ছোট ছোট ঠোঁটের শক্তির কথা মনে পড়লে অবিশ্বাস্য লাগে। ন্যাটের মুখ আর হাত ঠুকরে মাংস তুলে দিয়েছে এই খুদে পাখিগুলো। বস্তাটা নিয়ে বাগানে চলে এলো ও। এখন সবচেয়ে বড় ঝামেলার কাজ। লোহার মতো শক্ত মাটি খুঁড়বে কীভাবে ? বরফ পড়েনি, শুধু পুব দিক থেকে বাতাস বইছে, অথচ জমিন যেন জমাট বেঁধে গেছে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, অদ্ভুত। রেডিওতে বোধহয় ঠিকই বলেছে। আর্কটিক সার্কেলের সাথে এ আবহাওয়ার একটা যোগাযোগ আছে।

বস্তা হাতে দাঁড়িয়ে আছে ন্যাট, খুরের মতো ধারাল, হিম বাতাস যেন ওর হাড়ে পোঁচ বসিয়ে যাচ্ছে। মাথায় সাদা ফেনার মুকুট নিয়ে তীরে মাথা কুটছে সাগর। সিদ্ধান্ত নিল ন্যাট ওখানে কবর দেবে পাখিগুলোকে।

অন্তরীপের নীচে, সৈকতে চলে এলো ও। বাতাসের ধাক্কায় দাঁড়িয়ে থাকা দায়। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে ন্যাটের, নীল হয়ে গেছে হাত। প্রচন্ড শীত পড়তে দেখেছে ন্যাট। কিন্তু এমন সৃষ্টিছাড়া ঠাণ্ডার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। ভাটার সময়। শক্ত, অমসৃণ নুড়ি সৈকত জুড়ে। কুঁজো হয়ে এগোল ন্যাট। নরম বালুময় একটা জায়গা খুঁজে নিল। বাতাসের দিকে পিঠ, বুটের ছুঁচাল ডগা দিয়ে খুঁচিয়ে একটা গর্ত করে ফেলল। এটার মধ্যে পাখিগুলোকে ফেলবে। কিন্তু বস্তার মুখ খোলামাত্র বাতাসের তীব্র ঝাপটা উড়িয়ে নিয়ে গেল ওগুলোকে। আবার যেন পাখা মেলেছে মরা পাখির দল, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল তীরে।

‘জোয়ার এলে ভেসে যাবে ওরা’, মনে মনে বলল ন্যাট।

সাগরের দিকে তাকালো। সাদা ফেনার মুকুট পরা ঢেউ ফুঁসে উঠে আবার ভেঙে গেল। ভাটার কারণে গর্জনটা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না। অনেক দূরে ঢেউগুলো।

এরপর ওদেরকে দেখতে পেল ন্যাট। শঙ্খচিল। বসে আছে ঢেউয়ের উপর।

সাদা ফেনার মুকুট ভেবেছিল ন্যাট, আসলে ওগুলো শঙ্খচিল। শত শত, হাজার হাজার, লাখ লাখ.... সাগরের ঢেউয়ের তালে নামছে, উঠছে, যেন প্রকান্ড নৌবহর নোঙর করে আছে সাগরের বুকে, অপেক্ষা করছে জোয়ারের জন্য। পুব-পশ্চিমে, সবখানে ওরা। যতদূর চোখ গেল সাদা সাদা শঙ্খচিল দেখতে পেল ন্যাট। সাগর শান্ত থাকলে এতক্ষণে গোটা উপকূল সাদা মেঘের মতো ঢেকে ফেলত ওরা, মাথায় মাথা, গায়ে গা লাগিয়ে। পুবালি বাতাসের চাপে তীরে আসতে পারছে না।

ঘুরল ন্যাট, ফিরে চলল বাড়িতে। ঘটনাটা কাউকে জানানো দরকার। পুবালি বাতাস আর আবহাওয়ার কারণে কিছু একটা ঘটছে, ঠিক বুঝতে পারছে না ন্যাট। বাস স্টপের টেলিফোন বুদে গিয়ে পুলিশে ফোন করবে কিনা ভাবল একবার। কিন্তু কে কী করতে পারবে ? লাখ লাখ শঙ্খচিল ছুটে আসছে উপকূলে। খিদে আর ঝড় ওদেরকে

তাড়িয়ে এনেছে এদিকে। বললে পুলিশ ওকে পাগল ভাববে নয়তো মাতাল অথবা শক্ত ভঙ্গিতে ওর বক্তব্য শুনে মন্তব্য করবে, 'ধন্যবাদ। হ্যাঁ, ঘটনাটা ইতিমধ্যে শুনেছি আমরা। কঠিন আবহাওয়ার কারণেই পাখিগুলো ভিতরে ঢুকে পড়েছে।' চারপাশে একবার চোখ বুলাল ন্যাট। অন্য কোনও পাখির চিহ্নও নেই। ঠাণ্ডা সইতে না পেরে কি চলে গেছে সবাই ?

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে ন্যাটের স্ত্রী। স্বামীকে দেখে উত্তেজিত গলায় বলল, 'ন্যাট, রেডিওতে এইমাত্র বিশেষ খবর প্রচার হয়েছে। আমি লিখে রেখেছি।'

'কী বলল খবরে ?' জিজ্ঞেস করল ন্যাট।

'পাখি নিয়ে', জবাব দিল ওর বউ। 'শুধু এদিকে নয়, সবখানে দেখা গেছে পাখি। লন্ডনসহ দেশের সব জায়গায়। পাখিগুলোর যেন কী হয়েছে।'

ওরা এক সঙ্গে রান্নাঘরে ঢুকলো। টেবিলে রাখা কাগজটা পড়ল ন্যাট।

'আজ সকাল এগারোটায় হোম অফিস থেকে আসছে স্টেটমেন্ট। সারা দেশ থেকে খবর আসছে। শহরে, গ্রামে, গঞ্জে, সর্বত্র শত শত পাখি দেখা যাচ্ছে। ওরা আসছে কাতারে কাতারে, হাঁটা চলায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, সুযোগ পেলে লোকের উপর হামলাও চালিয়ে বসছে। ধারণা করা হচ্ছে, সুমেরু বায়ু স্রোত, যা এ মুহূর্তে প্রবাহিত হয়ে চলেছে ব্রিটিশ আইলের উপর দিয়ে, পাখিগুলোকে বাধ্য করেছে দক্ষিণে মাইগ্রেট করার জন্য, তীব্র খিদের কারণে এরা হয়তো মানুষকে আক্রমণ করছে। গৃহস্থদেরকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে তাঁরা যেন জানালা, দরজা বন্ধ রাখেন, লক্ষ রাখেন চিমনির দিকে এবং শিশুদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সাবধান থাকেন। আরও স্টেটমেন্ট প্রচার করা হবে পরবর্তীতে।

এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করছে ন্যাট; বউ'র দিকে তাকালো জ্বলজ্বলে চোখে। 'এবার যদি খামারের লোকগুলোর আমার কথা বিশ্বাস হয়! এটা যে গল্প নয় বুঝতে পারবেন মিসেস ট্রিগ। সারা দেশে ঘটছে ব্যাপারটা। সকাল থেকে আমার মন কুডাক ডাকছিল। সাগর তীরে গিয়ে দেখি লাখ লাখ শঙ্খচিল, গায়ে গা ঠেকানো, একটা পিন রাখার জায়গা নেই, ঢেউয়ের উপর ভাসছে, অপেক্ষা করছে।'

'কীসের জন্য অপেক্ষা করছে, ন্যাট ?' জিজ্ঞেস করল বউ।

স্থির চোখে স্ত্রীকে দেখল ন্যাট, তারপর দৃষ্টি ফেরাল কাগজের টুকরোয়।

'আমি জানি না', আস্তে আস্তে বলল সে। 'খবরে বলছে ওরা ক্ষুধার্ত।'

ড্রয়ার খুলে হাতুড়ি আর যন্ত্রপাতি বের করল ন্যাট।

'কী করছ, ন্যাট ?'

'জানালা আর চিমনিতে তক্তা বসাব।;

'জানালা বন্ধ থাকলেও ওরা ভেঙে ঘরে ঢুকবে ? ওই চড়ুই আর দোয়েল পাখি ? কীভাবে তা সম্ভব ?'

জবাব দিল না ন্যাট। দোয়েল বা চড়ুই নিয়ে ভাবছে না সে, ভাবছে শঙ্খচিলদের নিয়ে...

উপরতলায় উঠে এলো ও। বাকি সকালটা ব্যয় করল বেডরুমের জানালায় বাড়তি কাঠ লাগিয়ে আর চিমনির নীচের অংশটা বুজিয়ে দিয়ে। কাজ করার সময় যুদ্ধের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল ন্যাটের। প্লিমাউথে ব্ল্যাক আউটের সময় মা'র বাড়ির দরজা-জানালায় আলগা তক্তা লাগিয়ে দিয়েছিল সে যাতে বাইরে থেকে ঘরের আলো দেখা না যায়। শেল্টারও তৈরি করেছিল ন্যাট। তবে আসল সময়ে কাজে লাগেনি। খামার-বাড়িতে ওরা এরকম কোনও ব্যবস্থা নেবে কী ? ভাবল ন্যাট। সন্দেহ আছে। হ্যারী ট্রিগ এবং তাঁর মিসেস হেসেই উড়িয়ে দেবেন এরকম প্রস্তাব।

'খাবার রেডি', রান্নাঘর থেকে ঘোষণা দিল ন্যাটের স্ত্রী।

'আচ্ছা। আসছি।'

নিজের কাজে সন্তুষ্ট ন্যাট। ছোট ছোট শার্সির উপরে এবং চিমনির মুখে কাঠের ফ্রেমগুলো চমৎকার ফিট করেছে।

খাওয়া শেষে মুখটুখ ধুয়ে রেডিও ছাড়ল ন্যাট। একটা বাজে। একই ঘোষণা পুনরাবৃত্তি করা হলো, সকালে যা বলা হয়েছিল। তবে নিউজ বুলেটিনে ঘোষক জানাল, 'ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। দশটার সময় লন্ডনের আকাশ পাখিদের কারণে দেখা যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছেল বিরাট একখন্ড কালো মেঘে ঢেকে আছে নগরী।'

'পাখিগুলো আশ্রয় নিয়েছে ছাদে, জানালার তাক এবং চিমনির উপরে। এসব পাখির মধ্যে রয়েছে ব্ল্যাকবার্ড, থ্রাশ, চড়ুই প্রচুর পরিমাণে কবুতর ও স্টার্লিং। এ ছাড়া কালো মাথার শঙ্খচিল। অস্বাভাবিক দৃশ্যটা দেখার জন্য গাড়ি থামানোর কারণে অনেক জায়গায় বেঁধে গেছে ট্রাফিক জ্যাম, দোকান এবং অফিসের কাজ কর্ম ফেলে লোকে বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়, ফুটপাথ পর্যন্ত ভরে গেছে উৎসুক পথচারী ও দর্শকদের কারণে।'

ঘোষক আরও বলল ঠাণ্ডা এবং খিদের কারণেই নাকি এতো পাখির আগমন। লোকজনকে আবারও সাবধানে থাকার পরামর্শ দেয়া হলো। ঘোষকের গলা শুনে ন্যাটের মনে হলো লোকটা গোটা ব্যাপারকে একটা মস্ত ঠাট্টা ধরে নিয়েছে। এর মতো লোকের অভাব নেই যারা এটাকে গ্রাহ্যই করতে চায় না। অন্ধকারে হিংস্র হয়ে ওঠা পাখির সাথে লড়াই করতে কেমন লাগে এরা জানে না। নির্বাচনী রাতের মতো আজ রাতেও লন্ডনে যথারীতি পার্টি বসবে। মৌজ মাস্তিতে মেতে উঠবে লোকজন। মাতাল হয়ে হাসতে হাসতে বলবে, 'এসো, ভায়ারা! পাখি দেখে যাও।'

রেডিওর সুইচ অফ করে দিল ন্যাট। সিধে হলো। রান্নাঘরের জানালায় ফ্রেম লাগানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জনিকে হাঁটুর উপর বসিয়ে স্বামীর কাজ দেখছে স্ত্রী।

'এখানে বোর্ড লাগাচ্ছ কেন ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'কারণ আমি কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না', জবাব দিল ন্যাট। 'ওদের একটা কাজ করা উচিত', বলল ন্যাটের বউ। 'সেনাবাহিনী তলব করে পাখিগুলোকে গুলি করলেই হয়। ভয়ে পালিয়ে যাবে সবাই।'

‘কীভাবে করবে শুনি ?’ প্রশ্ন করল ন্যাট।

‘ডকে সৈন্যবাহিনী তো আছেই’, জবাব দিল ওর বউ। ‘ওদেরকে খবর দিলেই চুকে যায় ঝামেলা।’

‘না, যায় না’, বলল ন্যাট। ‘লন্ডনের লোক সংখ্যা আশি লাখের উপরে। এ শহরে বিল্ডিং, ফ্ল্যাট আর বাড়ির অভাব নেই। ওদের কি এতো সেনাবল আছে যে প্রতিটি বাড়ির ছাদ থেকে গুলি করে পাখি তাড়িয়ে দিতে পারবে ?’

‘জানি না। তবে কিছু একটা তো করতেই হবে। কিছু একটা ওদের অবশ্যই করা উচিত।’

ন্যাট ভাবল ‘ওরা’ এ মুহূর্তে নিশ্চয় কিছু একটা করার কথা ভাবছে, তবে ‘ওরা’ যে সিদ্ধান্তই নিক না কেন, কোনও লাভ হবে না। লন্ডনবাসীকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হবে নিজে নিজে।

‘ভাঁড়ার ঘরে খাবারদাবার আছে কী রকম ?’ জানতে চাইল ন্যাট।

‘আমি বাসি খাবার ঘরে রাখি না জানোই তো’, জবাব দিল স্ত্রী।

‘কাল বাজার করার দিন। কাল কিছু খাবার কিনে আনব।’

ন্যাট ওর বউকে আতঙ্কিত করে তুলতে চায় না। কাল ওর শহরে না-ও যাওয়া হতে পারে। ভাঁড়ার ঘরে ঢুকলো ন্যাট। কাবার্ডে টিনের মধ্যে ময়দা, মাখন ইত্যাদি রেখে দেয় ওর স্ত্রী। মাখন টাখন আছে মোটামুটি। তবে রুটি ফুরিয়ে এসেছে।

‘রুটিঅলা কবে আসবে ?’

‘কাল।’

একটা টিনে ময়দা দেখতে পেল ন্যাট। রুটিঅলা কাল না এলেও চলে যাবে। যেটুকু ময়দা আছে, রুটি বানানোর জন্য যথেষ্ট।

‘পুরানো দিনের মতো কিছু খাবার আমাদের সঞ্চয় করে রাখা উচিত’, পরামর্শ দিল ন্যাট। ‘সমস্যায় পড়লে খাওয়া যাবে।’

‘চেষ্টা করেছিলাম’, জানাল বউ। ‘কিন্তু বাচ্চারা টিনের মাছ খেতে চায় না। তাজা মাছ না হলে ওদের মুখে রোচে না।’

রান্নাঘরের জানালায় আবার তক্তা লাগাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ন্যাট। মোমবাতি। বাড়িতে মোমবাতির স্বল্পতাও রয়েছে। এ জিনিসটাও ওর বউ নিশ্চয় কাল কিনবে ভেবে রেখেছে। আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে। তবে...

খিড়কির দরজা খুলে বাগানে চলে এলো ন্যাট। তাকালো সাগরের দিকে। সারা দিন আজ সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। এখন, বেলা তিনটার সময় এক ধরনের অন্ধকার নেমে এসেছে, আকাশের চেহারা গম্ভীর, ভারী লবণের মতো বর্ণহীন। পাহাড়ের গায়ে ক্রুদ্ধ আক্রোশে ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ শোনা যায়। রাস্তা ধরে এগোল ন্যাট। সৈকতের মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। জোয়ার এসেছে। দুপুরে তীরের যে পাথরগুলো দেখে গেছে ও, ওগুলো এখন জলের তলায়। তবে সাগর নয়, ওর চোখ শঙ্খচিলের দিকে। সাগরের বুক থেকে উঠে আসছে। হাজারে হাজারে। ডানা মেলে

বৃত্তাকারে ঘূরছে। ওদের কারণে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে আকাশ, সৃষ্টি হয়েছে ভৌতিক আঁধারের। শব্দ করছে না পাখিগুলো। নীরব। সাগরের বুক থেকে উপরে উঠছে ওরা, তৈরি করছে বৃত্ত, বাতাসের ধাক্কায় পড়ে যাচ্ছে নীচে। শক্তি সঞ্চয় করে উঠে আসছে আবার।

ঘুরল ন্যাট। দৌড়াতে দৌড়াতে ফিরে এলো বাড়ি।

'আমি জিলকে আনতে গেলাম', বলল ও। 'বাসস্টপে।'

'কী হয়েছে ?' জিজ্ঞেস করল ওর স্ত্রী। 'তোমার মুখ সাদা কেন ?'

'জনিকে নিয়ে ভিতরে যাও', বলল ন্যাট। 'দরজা বন্ধ করে রাখবে। আলো জ্বালিয়ে টেনে দেবে পর্দা।'

'মাত্র তিনটা বাজে', বলল ওর স্ত্রী।

'তাতে কিছু আসে যায় না। যা বললাম করো।'

খিড়কি দরজার বাইরে টুলশেডে উঁকি দিল ন্যাট। ব্যবহার করা যায় এমন কিছু চোখে পড়ল না। কোদালটা বেশি ভারী, ফর্কটা কাজে আসবে না। আগাছা সাফ করার নিড়ানিটা তুলে নিল ও। এটা সহজে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, উদ্দেশ্যও পূরণ হবে।

বাসস্টপের দিকে হাঁটা দিল ন্যাট। মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনটা দেখল।

শঙ্খচিলের দল আরও উপরে উঠে এসেছে, আকারে বড় হয়েছে বৃত্ত, বিস্তৃত হয়ে, বিশাল কাঠামো নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে শূন্যে।

গতি দ্রুত হলো ন্যাটের; যদিও জানে চারটের আগে আসবে না বাস। রাস্তায় দেখা হলো না কারও সঙ্গে। এতে বরং ভালই হলো। এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করার সময় নয়।

পাহাড়ের উপরে উঠে এলো ন্যাট। অপেক্ষা করছে। অনেক আগে এসে পড়েছে। বাস আসতে এখনও আধঘণ্টা বাকি। উঁচু জমিনের মাঠ থেকে শোঁ শোঁ শব্দে ধেয়ে আসছে পুবের বাতাস। দূরে মাটির পাহাড়। বিবর্ণ আকাশের গায়ে সাদা ও পরিষ্কার দেখাচ্ছে। ওগুলোর পিছন থেকে কালো মতো কী একটা উঠে এলো, নোংরা একটা দাগ, ওটা প্রশস্ত হচ্ছে, চওড়া এবং ঘন, দাগটা পরিণত হলো মেঘে, ওটা আরও পাঁচটা মেঘের মধ্যে ড্রাইভ দিয়ে পড়ল, ছড়িয়ে যাচ্ছে উত্তর, পুবে, দক্ষিণ ও পশ্চিমে। ওগুলো আদৌ মেঘ নয় পাখি, সবগুলো পাখি। আকাশের বুকে উড়ে চলেছে ওরা, একটা ঝাঁক মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল, মাটি থেকে দু'তিনশো ফুট উঁচুতে, ন্যাট ওদের গতি লক্ষ করে বুঝতে পারল পাখিগুলো ইনল্যান্ডের দিকে যাচ্ছে। দলে আছে রুক, কাক, দাঁড়কাক, ম্যাগপাই, জে। সবগুলোই সাধারণত ছোট শিকার ধরে, তবে আজকের বিকেলে ওরা উড়ে চলেছে ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে।

'ওরা শহরে যাচ্ছে', ভাবলো ন্যাট, 'জানে কী করতে হবে। শঙ্খচিলেরা আমাদের উপর হামলা চালাবে অন্যগুলো শহরে।'

টেলিফোন বুদে ঢুকলো ন্যাট, রিসিভার তুলল। এক্সচেঞ্জের লোকে ওর বক্তব্য প্রচার করে দেবে।

'আমি হাইওয়ে থেকে বলছি', জানাল ন্যাট, 'বাসস্টপের সামনে। পাখিদের বিশাল একটা ঝাঁক উড়ে যেত দেখলাম শহরের দিকে। শঙ্খচিলেরা উপকূলে জড়ো হচ্ছে।'

'আচ্ছা', ভেসে এলো ক্লান্ত একটা কণ্ঠ।

'আপনি খবরটা জায়গামত পৌঁছে দিতে পারবেন ?'

'হ্যাঁ...হ্যাঁ...' এবার অধৈর্য শোনাল, ছেড়ে দিতে পারলে বাঁচে।

বাস উঠে এলো পাহাড়ে। তিন/চারটা বাচ্চার সঙ্গে লাফিয়ে নামলো জিল। শহরের দিকে রওনা হয়ে গেল বাস।

'নিড়ানি কীসের জন্য, বাবা ?'

বাচ্চাগুলো ঘিরে ধরেছে ন্যাটকে, হাসছে, আঙুল তুলে যন্ত্রটা দেখাচ্ছে।

'এমনি নিয়ে এলাম', বলল ন্যাট। 'বাড়ি চলো। ঠাণ্ডা পড়েছে। খেলতে হবে না। এই যে তুমি, মাঠ ধরে ছোটো তো। দেখি কেমন দৌড়াতে পারো।'

জিলের বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছে ন্যাট। এরা কাউন্সিল হাউজে থাকে। শর্টকাট রাস্তা ধরে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবে বাড়ি।

'আমরা এখন লেনে খেলব', বলল একজন।

'না। খেলবে না। বাড়ি যাও। নয়তো তোমার মা'র কাছে নালিশ করব।'

ফিসফিস করে কথা বলল ওরা নিজেদের মধ্যে, তারপর মাঠ ধরে ছুটল। জিল বাবার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মুখ গম্ভীর।

'আমরা সবসময় লেনে খেলা করি', বলল সে।

'আজ খেলার দরকার নেই', বলল ন্যাট। 'বাড়ি চলো। সময় নষ্ট কোরো না।;

শঙ্খচিলদেরকে দেখতে পাচ্ছে ন্যাট, চক্কর দিচ্ছে মাঠের উপরে। এখনও নিশ্চুপ। কোনও আওয়াজ করছে না।

'দেখো, বাবা, কত্ত শঙ্খচিল!'

'দেখেছি। জলদি চলো।'

'ওরা কোথায় যাচ্ছে ?'

'শহরে। ওখানে ঠাণ্ডা কম।'

জিলের হাত চেপে ধরল ন্যাট, লেন বা সরু গলিপথ ধরে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চলল।

'এত জোরে হাঁটছ কেন ? আমি পারছি না।'

শঙ্খচিলগুলো রুক আর কাকের মত, কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে ঝাঁক বেঁধে, হাজারে হাজারে ছুটে চলেছে চার কোণে।

'বাবা, শঙ্খচিলগুলো করছে কী ?'

কাক এবং দাঁড়কাকের মতো চলে যায়নি ওরা, মাথার উপর চক্কর দিচ্ছে। খুব বেশি উঁচুতেও নেই। যেন সঙ্কেতের অপেক্ষা করছে। যেন কোনও সিদ্ধান্ত এখনও দেয়া হয়নি।

'তুমি পিঠে উঠবে, জিল ?' এসো। পিঠে চড়ে বসো।'

মেয়েকে পিঠে তুলে নিল ন্যাট দ্রুত ছোটার জন্য। কিন্তু ভুল করেছে না। জিলের ওজন কম নয়। তার উপর বইপত্রের বোঝা তো আছেই। জিল বারবার পিছলে যাচ্ছে। বাপের ভয় সংক্রামিত হয়েছে মেয়ের মধ্যেও।

'শঙ্খচিলগুলোকে ভাল লাগছে না আমার', বলল জিল। 'ওগুলো আরও কাছিয়ে আসছে।'

মেয়েকে পিঠ থেকে নামিয়ে দিল ন্যাট। দৌড়াতে লাগল। পিছন পিছন জিল। খামার পার হওয়ার সময় দেখল মি. ট্রিগ গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করছেন।

'আমাদেরকে একটা লিফট দেবেন ?' ডাকল ন্যাট।

'কী হয়েছে ?'

ড্রাইভিং সীটে বসা মি. ট্রিগ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। হাসিহাসি মুখ। 'তুমি শঙ্খচিলগুলোকে দেখেছ ? জিম আর আমি ওদেরকে উড়িয়ে দেব। সবাই হঠাৎ করে পাখি নিয়ে পাগল হয়ে উঠেছে সবার মুখে শুধু পাখি আর পাখি। শুনলাম তোমাদের নাকি পাখি হামলা করেছিল। বন্দুক লাগবে ?' মাথা নাড়ল ন্যাট।

ছোট গাড়িটিতে মাল বোঝাই। জিল কোনমতে পিছনের সীটে, পেট্রলের টিনের উপর গুটিশুটি মেরে বসতে পারলে যেতে পারবে।

'বন্দুক লাগবে না', বলল ন্যাট, 'জিলকে বাড়ি পৌঁছে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব। ও পাখি ভয় পায়।'

মেয়ের সামনে আর কিছু বলতে চাইল না ন্যাট।

'ঠিক আছে', বললেন মি. ট্রিগ। 'ওকে বাড়ি পৌঁছে দেব। তুমি আমাদের পাখি শিকার উৎসবে যোগ দাও না কেন ? মজা হবে।'

গাড়িতে উঠে বসল জিল। গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে লেন ধরে ছুটে চললেন ড্রাইভার। ন্যাট তাকিয়ে রইল ওদিকে।

ট্রিগের মাথার ঠিক নেই। এক আকাশ পাখির বিরুদ্ধে একটা বন্দুক কী কাজে আসবে ?

বাড়ির দিকে জোর কদমে এগোল ন্যাট। মি. ট্রিগ গাড়ি নিয়ে এদিকেই আসছেন। ন্যাটের পাশে থেমে গেল একটা ঝাঁকি খেয়ে।

'বাচ্চাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছি', বললেন তিনি। 'তোমার স্ত্রী পথ চেয়ে বসেছিল মেয়ের জন্য। ব্যাপারটা নিয়ে কী ভাবছেন ? শহরের লোকে বলছে এটা নাকি রাশানদের কান্ড। রাশানরা বিষ খাইয়েছে পাখিগুলোকে।'

'বিষ খাওয়াবে কীভাবে ?' প্রশ্ন করল ন্যাট।

'আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। গুজব কীভাবে ছড়ায় জানোই তো। আমার শুটিং ম্যাচে আসছেন তো ?'

'না। বাড়িতে থাকব। নইলে বউ খুব দুশ্চিন্তা করবে।'

'আমার বউ বলে পাখিগুলোকে ধরে ধরে খাওয়া উচিত', বললেন ট্রিগ। 'আমরা শঙ্খচিল পুড়িয়ে খাব, ঝোল রেধে খাব, আচার বানাব। দাঁড়াও না কয়েকটাকে গুলি করে ফেলে দিই। তারপর দেখেন বাকিগুলো কীভাবে কেটে পড়ে।'

'জানালায় বোর্ড লাগিয়েছেন ?' জানতে চাইল ন্যাট।

'না। এসবের কোনও মানে হয় না। বেতারের কাজ খালি ভয় দেখানো। জানালায় বোর্ড লাগানোর চেয়ে অনেক জরুরী কাজ পড়ে আছে আমার।'

'আপনার জায়গায় আমি হলে কিন্তু কাজটা করতাম।'

'ধ্যাত। তুমি খামোকা ভয় পাচ্ছ। আমার বাড়িতে ঘুমাতে আসবে ?'

'না। ধন্যবাদ। লাভ নেই।'

'ঠিক আছে। কাল সকালে দেখা হবে। তোমাকে শঙ্খচিল দিয়ে নাশতা খাওয়াব।'

দাঁত বের করে হাসলেন ট্রিগ, গাড়ি নিয়ে এগোলেন খামারের ফটক অভিমুখে।

দ্রুত পা চালাল ন্যাট। ছোট্ট জঙ্গলটা পার হয়ে এল, পাশ কাটাল পুরানো গোলাবাড়ি, তারপর চলল মাঠের দিকে।

ডানা ঝাপটানোর শব্দে চমকে উঠল ন্যাট। আকাশ থেকে কালো ঠোঁটের একটা শঙ্খচিল ঝাঁপ দিল ওকে লক্ষ্য করে। মিস হলো টার্গেট। পাক খেয়ে আবার উঠে গেল শূন্যে। ওটার সঙ্গে দেখতে দেখতে যোগ দিল ডজন খানেক শঙ্খচিল এবং হেরিং। হাতের নিড়ানি ফেলে দিল ন্যাট। এটা কাজে আসবে না। হাত দিয়ে মাথা ঢেকে দৌড়াল বাড়ির দিকে। পাখিগুলো ধাওয়া করল ন্যাটকে। মাথার উপর ডানা ঝাপটানোর ভয়ঙ্কর পতপত শব্দ।

ঠোকর দিতে লাগল ওরা। ন্যাটের হাত, কব্জি ও ঘাড় রক্তাক্ত হয়ে উঠল। প্রতিটি ঠোকরে গা থেকে মাংস তুলে নিচ্ছে ওরা। চোখ বাঁচাতে হবে ন্যাটকে। গায়ে যত ইচ্ছা ঠোকরাক, চোখে আঘাত লাগতে দেয়া যাবে না। 'ওরা এখনও জানে না কীভাবে ঝুলে থাকতে হয় কাঁধে, এক যোগে মাথা লক্ষ্য করে ডাইভ দিতে হয়। তবে প্রতিটি ডাইভে, প্রতিটি হামলার পর আরও সাহসী হয়ে উঠছে পাখিগুলো। নিজেদের কথা ভাবছে না মোটেই। টার্গেট মিস হয়ে গেলে আছঁড়ে পড়ছে শক্ত জমিনে, ভেঙে যাচ্ছে ডানা। দৌড়াতে দৌড়াতে হোঁচট খেতে লাগল ন্যাট, লাথি মেরে সরিয়ে দিচ্ছে সামনে পড়ে থাকা আহত শরীরগুলো।

দরজার সামনে চলে এলো ন্যাট,রক্তাক্ত হাতে বাড়ি দিল কপাটে। জানালায় তক্তা লাগানো বলে ভিতরে ঢুকতে পারছে না আলো। অন্ধকার।

'দরজা খোলা', চিৎকার করছে ও, 'আমি ন্যাট, শিগগির দরজা খোলো।'

ওর চিৎকার শুনতে পেল মাথার উপর চক্কর দেয়া পাখিগুলো। প্রকান্ড গানেটটাকে চোখ পড়ল ন্যাটের। বিশাল রাজহংস ওকে লক্ষ্য করে ডাইভের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। শঙ্খচিলগুলো চেচাঁমেচি করছে, ধাক্কা খাচ্ছে একটা আরেকটার সঙ্গে। তারপর চলে গেল। শুধু গানেটটা রইল। হঠাৎ শরীরের সঙ্গে ভাঁজ হয়ে এলো ডানা, জমিন লক্ষ্য করে ছুটে এলো ওটা একটা পাথর খন্ডের মত। গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিল ন্যাট, খুলে গেল দরজা। হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে দোরগোড়ায়, ওর স্ত্রী একটানে ভিতরে নিয়ে গেল ওকে।

ধপ করে একটা শব্দ শুনতে পেল ওরা। মাটিতে আছড়ে পড়েছে গানেট।

ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করে দিল ন্যাটের স্ত্রী। তেমন গভীর নয় ক্ষত। হাতের পিছন এবং কব্জি বেশি কেটেছে, ছড়েছে। ক্যাপ না থাকলে মাথাটাও বাঁচানো যেত না। গানেটটা ফুটো করে দিত খুলি।

বাচ্চারা কাঁদছে। বাবার হাতে রক্ত দেখেছে ওরা।

'এখন কোনও সমস্যা নেই, বলল ন্যাট।' লাগেনি তো আমার। শুধু কয়েক জায়গায় সামান্য কেটে ছিড়ে গেছে। তুমি জনির সাথে খেলা করো, জিল। মা রক্ত ধুয়ে দেবে।

কিচেনের পাশের ঘরের দরজা ভিজিয়ে রাখল ন্যাট যাতে দেখতে না পায় বাচ্চারা। ওর স্ত্রীর মুখ ফ্যাকাসে। সিঙ্কের কল ছেড়ে দিয়েছে সে। 'ওদেরকে দেখেছি আমি' ফিসফিস করল বউ। 'জিল দৌড়ে ঘরে ঢুকলো। দেখলাম মাথার উপর জড়ো হচ্ছে ওরা। প্রচন্ড রাগে জোরে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। জ্যাম হয়ে গিয়েছিল দরজা। তাই তুমি প্রথমবার ধাক্কা দেয়ার সময় খুলতে পারি-নি।'

কিচেনে ঢুকলো ন্যাট, পিছন পিছন ওর স্ত্রী। জনি চুপচাপ খেলছে মেঝেতে বসে। জিলের চেহারায় উদ্বেগ।

'পাখিদের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, বাবা', বলল সে। 'শোনো।'

কান পাতল ন্যাট। জানালা এবং দরজা থেকে ভোঁতা, অস্পষ্ট শব্দ আসছে। ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ, জানালা-দরজায় ধাক্কা খাচ্ছে, নখের আঁচড় কাটছে, পিছলে যাচ্ছে। ভিতরে ঢোকার রাস্তা খুঁজছে। মাঝে মাঝে ঠাস বা থ্যাচ করে শব্দ হলো, কোনও পাখি ডাইভ দিয়েছিল, বাড়ি খেয়ে পড়ে গেছে। এভাবে মরবে কিছু, ভাবলো ন্যাট। তবে বেশি নয়।

জানালাগুলো পরীক্ষা করে দেখল ন্যাট। নিঁখুত কাজ ওর। প্রতিটি ফাইল কিংবা গর্ত বন্ধ করে দিয়েছে। অবশ্য আরও কিছু কাজ বাকি রয়ে গেছে। সে, মেঝেতে পড়ে থাকা কাঠের গোঁজ, পুরানো টিনের টুকরো, তক্তার ফালি, ধাতব খন্ড ইত্যাদি জোগাড় করে জানালা ও দরজার বোর্ডের উপর পেরেক ঠূকে লাগিয়ে দিল। হাতুড়ির শব্দে ঢাকা পড়ে গেল পাখিদের নানা সুরের চিৎকার-স্ত্রী ও বাচ্চাদেরকে ন্যাট কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনতে দিতে চায় না। 'রেডিওটা চালাও' বলল ও। 'রেডিও শুনব।'

রেডিওর শব্দেও পাখিদের ডাক চাপা পরে যাবে অনেকটাই। উপরে, বেডরুমে চলে এলো ন্যাট। জানালাগুলোয় টিন, তক্তার ফালি লাগিয়ে দিল। এখন ছাদ থেকে পাখিদের শব্দ শুনতে পাচ্ছে ন্যাট। নখের আঁচড়, পিছল পড়া, পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা।

ম্যাট্রেস নীচে নিয়ে এলো ন্যাট। ভয় ঘনালো ওর স্ত্রীর চোখে। ভেবেছে দোতলার জানালা ভেঙে ঢুকে পড়েছে পাখি।

'আজ রাতে সবাই কিচেনে ঘুমাব', খুশি খুশি গলায় বলল ন্যাট। 'আগুনের পাশে আরামে ঘুমাতে পারব। জানালায় পাখির খচরমচর শব্দেও সমস্যা নেই।'

বাচ্চাদের নিয়ে আসবাবগুলো নতুন করে সাজাল সে। জানালার কাছে নিয়ে গেল ড্রেসার। সেফগার্ড হিসেবে কাজ করবে। ম্যাট্রেসগুলো বিছাল এরপর, একটার পাশে আরেকটা, ড্রেসারটা সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে, তাঁর দেয়াল ঘেঁষে।

'এখন আমরা যথেষ্ট নিরাপদ, ভাবলো ন্যাট। এয়াররেইড সেন্টারের মত। শুধু খাবার নিয়ে চিন্তা। খাবার আর আগুনের জন্যে কয়লা। যা খাবার আছে তাতে দু'তিনদিন চলে যাবে। তারপর...

তারপর কী হবে ভেবে লাভ নেই। রেডিওতে ঘোষণা শুরু হবে। কী করতে হবে বলবে। তবে এ মুহূর্তে নাচের মিউজিক চলছে। এ সময়ে এ ধরনের মিউজিক চালানো অস্বাভাবিক। ন্যাটের মনে পড়ল লন্ডনে প্রচন্ড গোলা বষর্ণের সময় একবার এ ধরণের মিউজিক চালানো হয়েছিল। যুদ্ধের সময় বিবিসি লন্ডনে ছিল না। অন্য জায়গা থেকে স্বল্প সময়ের জন্য প্রোগ্রাম চালাত। আজ আবার সেই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি, ভাবছে ন্যাট। রান্নাঘরে দরজা-জানালা বন্ধ অবস্থায় ভাল থাকবে ওরা। অন্তত শহরের চেয়ে। ভাগ্যিস, ওরা শহরে নেই।

ছ'টার সময় থেমে গেল রেকর্ড। টাইম সিগনাল দেয়া হয়েছে। বাচ্চারা ভয় পাবে, তবুও খবরটা শোনা দরকার। কয়েক সেকেন্ড পিপ পিপ শব্দের পর এক মুহূর্ত বিরতি। তারপর ভেসে এলো ঘোষকের কণ্ঠ। গম্ভীর, বিষন্ন। দুপুরের থেকে একদম আলাদা। লন্ডন থেকে বলছি, বলল সে। আজ বিকেল চারটায় জাতীয় জরুরী অবস্থা জারী করা হয়েছে। জনগণের জান-মালের নিরাপত্তার জন্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তবে সকলের বোঝা উচিত চট করে কাজটা করা সম্ভব নয়। প্রতিটি লোককে যার যার বাড়িতে সর্তক অবস্থায় থাকতে হবে, ফ্ল্যাট ও অ্যাপার্টমেন্ট, যেখানে অসংখ্য মানুষের বাস, একত্রিত হয়ে বাড়ির ভিতরে পাখিদের প্রবেশের চেষ্টা রুখে দেবেন। বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে প্রতিটি মানুষ আজ রাতে ঘরে থাকবেন, কেউ রাস্তায় বেরুবেন না। বিপুল সংখ্যার পাখিরা কাউকে দেখলেই হামলা চালিয়ে বসছে, দালান-কোঠাতেও তারা আক্রমণ চালাচ্ছে; তবে সতর্ক থাকলে এদেরকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব। জনগণকে শান্ত থাকতে বলা হচ্ছে, আতঙ্কিত হবেন না। খুব বেশি জরুরী পরিস্থিতি ছাড়া কাল সকাল সাতটার আগে আর প্রচার করা হবে না খবর।'

জাতীয় সঙ্গীত বাজালে রেডিও সুইচ অফ করে দিল ন্যাট। চাইল স্ত্রীর দিকে। ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে।

'খবরে কী বলল ?' জানতে চাইল জিল।

'আজ রাতে আর কোনও প্রোগ্রাম নেই।' বলল ন্যাট। 'বিবিসির একটু সমস্যা হয়েছে।'

'পাখিগুলোর সমস্যা করেছে ?'

'পাখিগুলোর জন্য ?' জিজ্ঞেস করল জিল। 'পাখিরা সমস্যা করেছে ?'

'না', জবাব দিল ন্যাট, 'সবাই ব্যস্ত তবে পাখিরা শহরে কিছু সমস্যা যে করছে না তা নয়। যাকগে, একটা রাত রেডিও না শুনলেও চলবে।'

'আমাদের একটা গ্রামোফোন থাকলে বেশ হত', বলল জিল। মুখ ফেরাল ড্রেসারের দিকে। না শোনার ভান করলেও জানালায় পাখিদের নখের আঁচড়, অনবরত ঠক ঠক, ডানা ঝাপটানোর শব্দ অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।

'আজ সাপারটা একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নেব আমরা', ঘোষণা দিল ন্যাট। 'টোস্টেড চীজ চলবে তো ? আমরা সবাই এ খাবারটা পছন্দ করি, না ?'

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল ন্যাট। জিলের চেহারা থেকে আতঙ্কের ভাবটা দূর করে দিতে চায়।

বউকে সাপার বানাতে সাহায্য করল ন্যাট। শিস দিচ্ছে, গাইছে, তবে জানালার কাঁচে খচরমচর শব্দটা আগের মতো আর তীক্ষ্ণ নয়। বেডরুমে চলে এলো ও, কান পাতল। ছাদ থেকেও কোনও শব্দ আসছে না। 'ওরা জানে এখানে ঢোকা সহজ হবে না', ভাবছে ন্যাট। 'তাই অন্য কোথাও চেষ্টা করছে। আমাদের পিছনে সময় নষ্ট করতে চায় না।'

সাপারটা নির্বিঘ্নেই সারা গেল। কোনও ঘটনা ঘটলো না। মুখটুখ ধুচ্ছে ওরা, নতুন একটা শব্দ শুনতে পেল। পরিচিত আওয়াজ-গুনগুন শব্দ তুলছে।

ন্যাটের দিকে মুখ তুলে চাইল ওর বউ, উজ্জ্বল চেহারা। 'প্লেন। ওরা পাখিগুলোকে ধ্বংস করার জন্য প্লেন পাঠিয়েছে। এবার ওদের রক্ষা নেই। গুলির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ ?'

সমুদ্রের দিক থেকে শব্দ আসছে। গুলির আওয়াজ হতে পারে। নিশ্চিত নয় ন্যাট। নৌবাহিনীর প্লেন হয়তো শঙ্খচিলগুলোকে লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছে। কিন্তু ওগুলো তো অন্তরীপে চলে গেছে। তীরে গুলি চালাতে পারবে না ওরা। ওখানে মানুষজন থাকে।

'প্লেনের শব্দ শুনতে ভাল লাগছে না ?' মন্তব্য করল ন্যাটের স্ত্রী। জনিকে নিয়ে লাফাতে শুরু করেছে জিল। 'প্লেনগুলো মেরে ফেলবে পাখিগুলোকে। গুলি করে অক্কা পাইয়ে দেবে।'

ঠিক তখন প্রায় মাইল দুই দূরে একটা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল, তার পরপরই দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টা। গুনগুন শব্দটা ক্রমে মিলিয়ে গেল সমুদ্রের দিকে।

'কীসের শব্দ ?' জিজ্ঞেস করল ন্যাটের স্ত্রী। 'পাখিদের উপর বোমা ফেলছে ?'

'জানি না', জবাব দিল ন্যাট। 'তবে মনে হয় তা নয়।' বউকে ও বলেনি বিস্ফোরণের শব্দটা আসলে প্লেন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আওয়াজ। কর্তৃপক্ষ প্লেন পাঠিয়েছে পাখি মারার জন্য। কিন্তু প্রপেলার আর ফিউজিলাজের মধ্যে পাখি ঢুকে প্লেন ক্রাশ হয়ে গেলে আর কী করার থাকে ? সারা দেশেই হয়তো এমনটা ঘটছে।

'প্লেনগুলো কই গেল, বাবা ?' জানতে চাইল জিল।

'ওদের বাসায় ফিরে গেছে', বলল ন্যাট। 'এসো', বিছানা করে ফেলি।'

ওর স্ত্রীর ব্যস্ত থাকল বিছানা পাতা আর বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানো কাজে, ন্যাট ফাঁকে বাড়ির চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে এল। তক্তা-টক্তা কোথাও আলগা হয়ে গেছে কিনা পরখ করে দেখল। প্লেনের আওয়াজ আর নেই, নৌবাহিনীর গুলির শব্দও শোনা যাচ্ছে না। 'খামোকা জীবন আর শ্রম নষ্ট', আপন মনে বলছে ন্যাট। 'এভাবে ওদেরকে ধ্বংস করা যাবে না। মাস্টার্ড গ্যাস দিয়ে চেষ্টা করা যেতে পারে। তবে আগে আমাদেরকে সাবধান করতে হবে। আজ রাতে দেশের সেরা মাথাগুলো নিশ্চয় এর পিছনে কাজ করবেন।'

ভাবনাটা এক ধরণের নিশ্চয়তা এনে দিল ন্যাটের মধ্যে। কল্পনায় দেখল দেশের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, প্রকৃতিবিদ আর টেকনিশিয়ানরা পরামর্শ সভা ডেকেছেন; সমস্যাটার সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা করছেন।

উপরতলার বেডরুমে কোনও শব্দ নেই। জানালায় খচরমচর শোনা যাচ্ছে না। নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করছে ওরা, ভাবল ন্যাট। বাতাস বইছে এখনও। চিমনির মধ্যে গর্জাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে ও। সৈকতে সগর্জনে আছড়ে পড়ছে সাগর। এখন জোয়ারের সময়। হয়তো জোয়ারের কারণে যুদ্ধ বিরতি দিয়েছে পাখির দল। প্রকৃতির কিছু নিয়ম কানুন ওরা মেনে চলে।

ঘড়ি দেখল ন্যাট। প্রায় আটটা বাজে। এক ঘন্টা আগে শুরু হয়েছে জোয়ার। পাখিদের নীরবতার কারণ বুঝতে পারছে ন্যাট; জোয়ারের শিকার হয়েছে ওরা। শহরে এ ব্যাপারটা নেই, কিন্তু উপকূলে আছে। সময়ের হিসেবটা মাথায় টুকে রাখল ন্যাট। আরও ঘন্টা ছয় নিরাপদে থাকবে ওরা। রাত সোয়া একটার দিকে আবার শুরু হবে জোয়ার, ভেসে যাওয়া পাখিরা ফিরে আসবে ওই সময়...

এখন দুটো কাজ করতে পারে ন্যাট। স্ত্রী আর বাচ্চাদের সঙ্গে বিশ্রাম নিতে পারে। ঘন্টা কয়েক ঘুমিয়ে নেবে। দ্বিতীয়টি হলো খামারে গিয়ে দেখে আসতে পারে ওখানকার পরিস্থিতি, ফোন ঠিক থাকলে এক্সচেঞ্জ থেকে খবরও হয়তো পাবে। মৃদু গলায় বউকে ডাকলো ন্যাট। বাচ্চাদেরকে মাত্র ঘুম পাড়িয়েছে সে। সিঁড়ি বেয়ে অর্ধেক নেমেছে, পরিকল্পনাটা ফিসফিস করে তাকে বলল ন্যাট।

'তুমি যাবে না', সাফ জানিয়ে দিল স্ত্রী, 'আমাকে আর বাচ্চাদেরকে একলা রেখে কোথাও যাওয়া চলবে না তোমার। আমি কিছুতেই একা থাকতে পারব না।'

গলার স্বর চড়ে গেল তার, ঠোঁটে আঙুল চেপে ধরে বউকে শান্ত করল ন্যাট। 'ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি না। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব। সাতটার সময় খবর শুনব। তবে সকালে ভাটা শুরু হয়ে গেলে খামারে একবার যেতেই হবে। রুটি, আলু আর দুধ নিয়ে আসব।'

মস্তিষ্ক আবার চালু হয়ে গেল ন্যাটের। জরুরী অবস্থা নিয়ে চিন্তা করছে। আজ সন্ধ্যায় খামারে দুধ দোয়ানো হয়েছে কিনা সন্দেহ। গ্রিগ গরুগুলোকে গোয়াল ঘরে সাবধানে রেখেছেন কিনা কে জানে। ন্যাটকে তিনি তো পাত্তাই দিতে চাননি। হাসছিলেন বিদ্রূপের ভঙ্গিতে। গাড়িতে বসা তাঁর চেহারাটা মনে পড়ছে ন্যাটের।

বাচ্চারা ঘুমাচ্ছে। ওদের মা ম্যাট্রেসে বসা, নার্ভাস চোখে তাকিয়ে আছে স্বামীর দিকে।

'তুমি কী করছ?' ফিসফিস করল সে।

বউকে চুপ করে থাকতে ইশারা করল ন্যাট। আস্তে আস্তে, কোনও শব্দ না করে খুলে ফেলল খিড়কির দরজা। তাকালো বাইরে।

কালিগোলা অন্ধকার। সাগর থেকে তীব্র হিমেল ঝাপটা নিয়ে ছুটে আসছে বাতাস। দরজার বাইরের সিঁড়িতে লাথি কষাল ন্যাট। ধাপের উপর পড়ে আছে মরা

পাখি। পাখির লাশ ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। জানালার নীচে, দেয়ালে। ঘাড় ভাঙা সবক'টার। এগুলো হলো ডাইভ দেয়া পাখি। একরোখা। আত্মহননে ভয় নেই। চারপাশে চোখ বুলাল ন্যাট। শুধুই মরা পাখি। একটাও জ্যান্ত পাখি নজরে এলো না। জোয়ারের টানে সাগরে গেছে। দুপুরের মতো শঙ্খচিলগুলো হয়তো এ মুহূর্তে ঢেউয়ের মাথায় চড়ে দুলছে।

দূরে, পাহাড়ের উপর, দু'দিন আগে যেখানে ট্রাক্টরটা ছিল, ওদিকে দাউদাউ করে কিছু একটা জ্বলছে। এয়ারক্রাফট। বাতাস পেয়ে মশালের মতো জ্বলছে।

মরা পাখিগুলোর দিকে আবার তাকালো ন্যাট। মাথায় একটা বুদ্ধি এল। জানালার ধারিতে (Window sill) যদি একটার উপর আরেকটা জড়ো করে রাখে, পরবর্তী হামলার সময় কিছুটা হলেও নিরাপত্তা দেবে লাশগুলো। লাশগুলোকে ঠুকরে কিংবা আঁচড়ে সরাতে হবে আগে, তারপর জ্যান্ত পাখিরা জানালার শার্সিতে হামলা চালানোর সুযোগ পাবে। অন্ধকারে কাজ শুরু করে দিল ন্যাট। লাশ ধরতে ঘেন্না লাগছে। শরীর এখনও গরম, রক্তাক্ত। পালকে লেগে আছে রক্ত। পেট গুলিয়ে উঠল ন্যাটের, তবে কাজ চালিয়ে গেল। চেহারা শুকনো করে দেখল প্রতিটি জানালার শার্সি ফেটে গেছে। শুধু তক্তার কারণে ভিতরে ঢুকতে পারেনি ওরা। ভাঙা এবং ফেটে যাওয়া জানালার কাঁচে রক্তাক্ত পাখিগুলোকে বসিয়ে দিল ন্যাট।

কাজ শেষ করে ঘরে ঢুকলো ও। রান্নাঘরের দরজায় ব্যারিকেড দিল, জোরদার হলো নিরাপত্তা ব্যবস্থা। খুলে ফেলল হাতের ব্যান্ডেজ। পাখির রক্তে চটচটে হয়ে গেছে। নতুন ব্যান্ডেজ বাঁধল।

ওর স্ত্রী কোকো নিয়ে এল। তৃষ্ণার্তের মতো পান করল ন্যাট। ভয়ানক পরিশ্রান্ত।

'সব ঠিক আছে', হাসলো ও। 'ভেবো না। আমরা সামলে নিতে পারব।' ম্যাট্রেসে শুয়ে পড়ল ম্যাট। চোখ বুজল। প্রায় সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ল। তবে ঘুমটা স্বস্তির হলো না। ঘুমের মধ্যেও মনে হতে লাগল কিছু একটা ভুল করে ফেলেছে ও। একটা কাজ করার দরকার ছিল যেটা করা হয়নি। একটা বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত ছিল, হয়নি। জ্বলন্ত প্লেনের স্বপ্ন দেখল। দুঃস্বপ্নও ওকে জাগিয়ে তুলতে পারল না। জেগে গেল কাঁধে স্ত্রীর ধাক্কা খেয়ে।

'ওরা আবার শুরু করছে', ফোঁপাচ্ছে সে, 'কিছুক্ষণ আগে। আমি একা একা আর সহ্য করতে পারিনি। বাজে একটা গন্ধও পাচ্ছি। কিছু বোধহয় পুড়ছে।'

মনে পড়ে গেল ন্যাটের। আগুন জ্বালিয়ে রাখতে ভুলে গেছে সে। প্রায় নিভু নিভু দশা। লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়ল ন্যাট, বাতি জ্বালল। জানালা এবং দরজায় যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। তবে ও নিয়ে ভাবছে না ন্যাট। ঝলসানো পালকের গন্ধ ঘরে। সাথে সাথে ব্যাপারটা বুঝে ফেলল ও। চিমনির মধ্য দিয়ে আসছে পাখিগুলো, রান্নাঘরে ঢোকার চেষ্টা করছে।

লাকড়ি আর কাগজ আগুনের মধ্যে ফেলল ন্যাট। হাত বাড়াল প্যারাফিনের ক্যানে।

'পিছনে হঠো', চেঁচাল ন্যাট। তারপর প্যারাফিনের টিন ছুঁড়ে ফেলল আগুনে। পাইপ বেয়ে উপরে উঠে গেল লকলকে শিখা, ছোবল মারল ঝলসে, কালো হয়ে যাওয়া পাখিগুলোকে।

হৈ চৈ শুনে জেগে গেছে বাচ্চারা, জুড়ে দিয়েছে কান্না। 'কী হয়েছে ?' বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল জিল।

জবাব দেয়ার সময় নেই ন্যাটের। চিমনি থেকে টেনে নামাচ্ছে পাখির লাশ, ছুঁড়ে ফেলছে মেঝেতে। শোঁ শোঁ গর্জন ছাড়ছে আগুন, চিমনিতে আগুন ধরে যাওয়ার ঝুঁকি আছে জেনেও কাজটা করছে ন্যাট। শিখার উত্তাপে চিমনির মুখ থেকে সরে যাবে জ্যান্ত পাখিরা। ঈশ্বরকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল ন্যাট ওরা পুরানো আমলের বাড়িতে বাস করছে বলে। ওদের বাড়ির জানালাগুলো ছোট ছোট, দেয়াল নিরেট। নতুন কাউন্সিল হাউজগুলোর মতো নয়। ওইসব বাড়ির বাসিন্দারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া বাঁচতে পারবে কিনা ভেবে সন্দেহ হলো ওর।

'কেঁদো না', সন্তানদেরকে বলল ন্যাট। 'ভয়ের কিছু নেই। কান্না থামাও।'

আগুনের মধ্যে ঝলসানো পাখিগুলো ধুপধাপ পড়ছে, ওগুলো সরিয়ে ফেলতে লাগল ও।

জানালার তক্তায় পাখিদের নখের আঁচড়, ঠোঁটের ঠক ঠক ইত্যাদি শব্দ ছাপিয়ে ঢংঢং আওয়াজে বেজে উঠল রান্নাঘরের ঘড়ি। তিনটা বাজে। আরও চার ঘন্টা। জোয়ারের ঠিক নির্দিষ্ট সময়টা জানা নেই ন্যাটের। সাড়ে সাতটা কিংবা পোনে আটটার দিকেও জোয়ার আসতে পারে সাগরে।

'স্টোভটা জ্বালাও', বলল ন্যাট বউকে। 'আমাদের জন্য চা বানাও, বাচ্চাদেরকে কোকো দাও। খামোকা বসে থেকে লাভ নেই।'

বউকে ব্যস্ত রাখতে হবে, বাচ্চাদেরকেও। খাও, দাও, সময়টা তো কেটে যাবে।

আগুনের শিখা ম্লান হয়ে আসছে। তবে চিমনি থেকে আর কালো শরীর পড়ছে না। পোকারটাকে যত উঁচুতে পারে ঠেলে দিল ন্যাট। ওটার গায়ে ঠেকল না কিছুই। চিমনি পরিষ্কার। কপালের ঘাম মুছল ন্যাট।

'এসো, জিল', মেয়েকে ডাকলো ও। 'আমাকে কিছু লাকড়ি এনে দাও। আগুনটা ভাল করে জ্বেলে রাখতে হবে।' কিন্তু বাবার ডাক অগ্রাহ্য করল কন্যা। পাখিগুলোর পোড়া শরীরের দিকে তাকিয়ে আছে চোখ বড়বড় করে।

'ওগুলোকে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না', বলল ন্যাট। 'আগুনটা ভাল করে জ্বালিয়ে নিই তারপর ওগুলোর ব্যবস্থা করছি। প্যাসেজে রেখে আসব।'

চিমনি নিয়ে বিপদ কেটে গেছে। আগনুটা দিন রাত জ্বালিয়ে রাখতে পারলে আর ভয় নেই।

'কাল খামার থেকে আরও কিছু জ্বালানি নিয়ে আসতে হবে', ভাবছে ন্যাট। 'যেভাবে হোক ম্যানেজ করব। ভাটার সময়টাতে।' ওরা চা, কোকো আর রুটি খেল। শুধু আধখানা রুটি রয়ে গেছে, লক্ষ করেছে ন্যাট। ওরা পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে, আশা করছে সে।

‘থামো’, চামচটা জানালার দিকে তুলে ধরে ধমক দিল ছোট্ট জনি, ‘থামো, বুড়ো পাখির দল।’

‘ঠিক বলেছ’, হাসছে ন্যাট, ‘আমরা বুড়ো ভিখিরিদেরকে দেখতে চাই না, তাই না ?’

ওরা হাসি-ঠাট্টা করছে এমন সময় ধপ করে একটা শব্দ হলো। সেই আত্মহননকারী পাখিদের একটা।

‘আবার ওরা, বাবা’, চেঁচিয়ে উঠল জিন।’ ‘জানালার উপর লাফিয়ে পড়েছে।’

‘হুঁ’, বলল ন্যাট। ‘অক্কা পেয়েছে নিশ্চয়।’ স্ত্রীর দিকে ফিরল।

‘একটা সিগারেট দাও। ধোঁয়ার গন্ধে পালক পোড়া দুর্গন্ধটা দূর হবে।’

‘প্যাকেটে মাত্র দুটো আছে’, জানাল ওর স্ত্রী।

জানালায় খচখচ শব্দটা হয়েই চলেছে অনবরত বউকে এক হাতে, অন্যহাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকল ন্যাট। জনি তার মায়ের কোলে। কম্বলগুলো স্তূপ হয়ে আছে ম্যাট্রেসের উপর।

খচখচ শব্দ থেকে নতুন একটা শব্দ উদয় হলো-থরথর। ধারালো ঠোঁট দিয়ে কেউ ঠোকর দিচ্ছে তক্তার গায়ে। কান খাড়া করল ন্যাট। কাঠঠোকরা নয়। কাঠঠোকরা হালকা এবং ঘন ঘন ঠোকর দেয়। এটা আরও জোরে ঠোকরাচ্ছে। এভাবে চললে কাঁচের মতো তক্তারও বারোটা বেজে যাবে। বাজপাখি নয়তো ? বাজরা ঠোঁট এবং নখ একই সঙ্গে ব্যবহার করে। কত রকমের শিকারী পাখি আছে-বাজ, বাজার, চিল, ফ্যালকন-সবগুলোর নাম মনেও পড়ছে না। শিকারী পাখিগুলোর ভয়ঙ্কর শক্তির কথা ভুলেই গিয়েছিল ন্যাট। শঙ্খচিলদেরকে হঠিয়ে ওরাই হয়তো এখন দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে। সকাল হতে আরও তিনঘন্টা বাকি। বাইরে থেকে কাঠ ভাঙার শব্দ ভেসে আসছে। শক্ত ঠোঁটের আঘাতে ভেঙে যাচ্ছে কাঠ।

আসবাবপত্রগুলোর উপর চোখ বুলাল ন্যাট। চিন্তা করছে কোনটা ভেঙে দরজায় ঠেক্ দেয়া যায়। ড্রেসারের কারণে জানালা নিরাপদ। তবে দরজা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছে ন্যাট। উপরে উঠে এলো ও, ল্যান্ডিং-এ পা রেখেছে, থমকে গেল। বাচ্চাদের শোয়ার ঘরের মেঝেতে টুপটুপ শব্দ। ছোট ছোট পায়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। পাখিরা ঢুকে পড়েছে ভিতরে... দরজায় কান পাতল ন্যাট। কোনও সন্দেহ নেই। ডানা ঝাপটানোর শব্দ, মেঝের উপর হেঁটে বেড়াচ্ছে পাখির দল। অপর বেডরুমটাতে এখনও ঢুকতে পারেনি কেউ। ওটাতে ঢুকে পড়ল ন্যাট। আসবাব টেনে আনতে লাগল। সিঁড়ির মাথায় রাখবে। তবে দরজার সামনে রাখতে পারবে না। কারণ ভিতর থেকে খোলে ওটা।

‘ন্যাট, নীচে এসো।’ ডাকল ওর স্ত্রী। ‘ওখানে কী করছ ?’

‘আসছি এখুনি’, বলল ন্যাট। ও চায় না ওর স্ত্রী উপরে আসুক; চায় না বাচ্চাদের বেডরুমে ছোট ছোট পায়ের চলাফেরার শব্দ শুনে ফেলুক, কানে যাক দরজায় গায়ে ডান ঝাপটানোর আওয়াজ।

সাড়ে পাঁচটার দিকে স্ত্রীকে নাশতা বানাতে বলল ন্যাট। বেকন আর ফ্রাইড ব্রেড। কাজে ব্যস্ত থাকলে আতঙ্ক কমবে তার। উপরতলার পাখিদের কথা জানে না সে।

বেডরুমটা রান্নাঘরের উপরে নয়। হলে শব্দ শুনতে পেত। শুনত কাঠের গায়ে ঠোকরাচ্ছে ওরা, ধুপধাপ আছড়ে পড়ছে হেরিংগালরা। এদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা আছে, শুনেছে ন্যাট। এগুলোর মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধির বালাই নেই। আগাপাশতলা বিচার না করে ডাইভ দিয়ে পড়ছে বেডরুম লক্ষ্য করে, দেয়ালে বাড়ি খেয়ে পটল তুলছে। তবে ব্ল্যাক-ব্যাকগুলো অন্যরকম। তারা জানে তারা কী করছে। মাথায় ঘিলু আছে বাজার্ড এবং বাজপাখিগুলোরও...

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে ন্যাট। ওর থিওরী যদি ঠিক না হয়, জোয়ারের সময় থেমে না যায় হামলা, নিশ্চিত পরাজয় ঘটবে ওদের। বিশ্রাম, জ্বালানি, খাবার ছাড়া বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না। শহরে থাকলে এর চেয়ে নিরাপদে থাকা যেত। খামার-বাড়ির টেলিফোনে যদি খবর পাঠানো যেত ওর চাচাতো ভাইকে, সে শহরে থাকে। ট্রেনে যেতে অল্প সময় লাগে। একটা গাড়ি ভাড়া করতে পারলেও চলে। জোয়ারের সময় গাড়ি ভাড়া করা গেলে আরও দ্রুত যাওয়া যাবে শহরে।

ঝিমুনি এসে গিয়েছিল ন্যাটের এসব কথা ভাবতে ভাবতে, বৌ'র ডাকে ঘুমের চটকা কেটে গেল।

'কী হয়েছে ?' তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল ন্যাট।

'রেডিও', বলল ওর স্ত্রী। 'সাতটা প্রায় বাজে।'

'নব ঘুরিয়ো না', এই প্রথম অধৈর্য্য শোনাল ন্যাটের কণ্ঠ।

'যে স্টেশনে ধরা আছে থাক। ওরা হোম সার্ভিস থেকে কথা বলবে।'

অপেক্ষা করছে ওরা। ঘড়িতে সাতটা বাজল। রেডিওতে কোনও সাড়া শব্দ নেই। আরও পনেরো মিনিট অপেক্ষা করে আরেকটা স্টেশন ধরল। একই অবস্থা। খবরের কোনও খবর নেই।

'ভুল শুনেছি আমরা', মন্তব্য করল ন্যাট, 'আটটার আগে ওরা খবর প্রচার করবে না।'

'ফর্সা হয়ে আসছে', ফিসফিস করল ওর স্ত্রী। 'দেখা যাচ্ছে না তবে অনুভব করতে পারছি। পাখিগুলোও আগের মতো চেঁচামেচি করছে না।'

ঠিকই বলেছে সে। থরথর, ঠকঠক ইত্যাদি শব্দগুলো কমে আসছে প্রতি মুহূর্তে। জানালার ধাড়ি কিংবা সিঁড়িতেও পা ঘষে চলার শব্দ ম্লান হয়ে আসছে। জোয়ার শুরু হয়ে গেছে। আটটা নাগাদ কোনও শব্দই আর শোনা গেল না। শুধু বাতাসের শব্দ ছাড়া। নিশ্চুপ প্রকৃতি চোখে ঘুম এনে দিল বাচ্চাদের। সাড়ে আটটার সময় রেডিও বন্ধ করে দিল ন্যাট। 'ও কী করলে ?' বলল ওর স্ত্রী। 'খবরটা মিস করব তো ?'

কোনও খবর হবে না', বলল ন্যাট। 'নিজেদের উপর নিজেদের ভরসা করতে হবে।'

দরজার সামনে দিয়ে দাঁড়াল ন্যাট, আস্তে আস্তে সরিয়ে ফেলল ব্যারিকেড। খুলল ছিটকিনি। দরজার বাইরের সিঁড়িতে পড়ে থাকা পাখির লাশগুলো লাথি দিয়ে ফেলে দিল। বুক ভরে টানল ঠাণ্ডা বাতাস। ছ'ঘন্টা কাজ করার সময় পাবে ও, একটা মুহূর্ত

বেহুদা নষ্ট করা যাবে না। খাবার, আলো এবং জ্বালানি, এগুলো সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস। এগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে জোগাড় করা গেলে আরেকটা রাত টিকে থাকতে পারবে ওরা।

বাগানে নেমে এলো ন্যাট, দেখতে পেল জ্যান্ত পাখিগুলোকে। সামুদ্রিক শঙ্খচিল সাগরে ফিরে গেছে জোয়ারের টানে, আগের মতই খাবারের সন্ধানে। তবে জমিনের পাখিরা যায়নি। ওরা অপেক্ষা করছে, দেখছে। ঝোপ, মাটি, গাছের উপর, মাঠে শতশত পাখি। সবাই স্থির। কেউ কিছু করছে না।

ছোট বাগানটার শেষ মাথায় চলে এলো ন্যাট। নড়লো না পাখির দল। ওকে দেখছে।

'খাবার জোগাড় করতে হবে আমাকে', মনে মনে বলল ন্যাট, 'খামার-বাড়ি যাব আমি খাবারের খোঁজে।'

ঘরে ফিরে এলো ন্যাট। জানালা দরজায় নজর বুলিয়ে উঠে এলো দোতলায়। বাচ্চাদের বেডরুমের দরজা খুলল। খালি। শুধু মেঝের উপর পড়ে আছে মরা কতগুলো পাখি। জ্যান্তগুলো বাইরে, বাগানে এবং মাঠে। নীচে নেমে এলো ন্যাট।

'আমি খামারে যাচ্ছি', বলল ও।

ওর বউ জড়িয়ে ধরল স্বামীকে। খোলা জানালা দিয়ে দেখেছে সে জ্যান্ত পাখিদেরকে।

'আমাদেরকেও সঙ্গে নিয়ে চলো', অনুনয় করল সে, 'আমরা এখানে একা থাকতে পারব না। একা থাকার চেয়ে মরে যাব তাও ভাল।' এক মুহূর্ত চিন্তা করল ন্যাট তারপর মাথা দোলাল।

'ঠিক আছে', বলল সে। 'চলো তাহলে। ঝুড়িগুলো নিয়ো আর জনির প্রামটা। প্রাম ভরে জিনিসপত্র আনতে পারব।'

গায়ে ছুরি চালানোর মতো হিমেল বাতাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে ওরা গ্লাভ আর স্কার্ফ পরে নিল। জনিকে প্রামে বসাল তার মা, ন্যাট ধরে রাখল জিলের হাত।

'পাখিগুলো', কাঁদো কাঁদো গলা ন্যাটের স্ত্রীর, 'ওরা মাঠ ভর্তি।'

'ওরা আমাদের উপর হামলা চালাবে না', অভয় দিল ন্যাট, 'অন্তত দিনের আলোয় নয়।'

মাঠ ধরে হেঁটে চলল ওরা। পাখিগুলো নড়ল না। অপেক্ষা করছে ওরা বাতাসের দিকে মুখ ঘুরিয়ে।

খামারের সামনে চলে এসেছে ওরা, দাঁড়িয়ে পড়ল ন্যাট। বউকে বলল বাচ্চাদেরকে নিয়ে ফণিমনসার ঝোপের নীচে অপেক্ষা করতে।

'কিন্তু আমি মিসেস ট্রিগের সঙ্গে দেখা করব', প্রতিবাদ করল বউ।

'অনেক জিনিসপত্র নিতে হবে। আমি গেলে...'

'এখানেই থাকো', ধমক দিল ন্যাট। 'আমি আসছি এখুনি।'

উঠানে ঘুরে বেড়াচ্ছে গরুগুলো। বেড়ার গায়ে একটা ফাটল চোখে পড়ল ন্যাটের। একটা ভেড়া বেরিয়ে পড়েছে ফাটল দিয়ে। খামার-বাড়ির সামনের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না। মনের মধ্যে কুডাক ডাকছে ন্যাটের। স্ত্রী ও বাচ্চাদের নিয়ে খামারে ঢুকতে চায় না ও। ওর স্ত্রী এগিয়ে এসেছিল, কষে ধমক লাগাল তাকে। 'এদিকে নাক গলাতে নিষেধ করেছি না! যা বলেছি করো।'

প্রাম নিয়ে ঝোপের আড়ালে চলে গেল বাচ্চাদের মা। এদিকে বাতাসের ঝাপটা নেই বললেই চলে।

একা খামারের দিকে পা বাড়াল ন্যাট। গরুগুলোর মাঝ দিয়ে পথ করে চলল। দুধ দোয়ানো হয়নি। ফুলে আছে বাঁট। তাই হাম্বা হাম্বা ডাক ছেড়ে চলেছে জানোয়ারগুলো। গেটের কাছে দেখল গাড়িটাকে, গ্যারেজে ঢোকানো হয়নি। খামার-বাড়ির একটা জানালাও আস্ত নেই। উঠোন এবং বাড়ির চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য শঙ্খচিলের লাশ। জীবিত পাখিগুলো দল বেঁধে বসে আছে খামারের পিছনের গাছে এবং বাড়ির ছাদে। এখনও স্থির। দেখছে ওকে।

জিমের লাশ পড়ে আছে মাটিতে...লাশ না বলে মাংসের দলা বলাই ভাল। পাখিগুলো মাংস খুবলে খঅওয়ার পরে গরুর খুরের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে শরীর। বন্দুকটা ওর পাশে। বাড়ির দরজা বন্ধ, ছিটকিনি লাগানো। তবে কাঁচ নেই বলে ভাঙা জানালার টপকে ভিতরে ঢুকে পড়ল ন্যাট। ট্রিগ পড়ে আছেন টেলিফোনের পাশে। ফোন করার সময় বোধহয় পাখিগুলো হামলা করে বসে তাঁকে। রিসিভার ঝুলছে, মিসেস ট্রিগকে দেখা যাচ্ছে না। উনি বোধহয় দোতলায়। ওখানে গিয়ে লাভ আছে ?

অসুস্থ বোধ করল ন্যাট। জানে দোতলায় গেলে কী দেখবে।

'থ্যাঙ্ক গড', মনে মনে বলল ন্যাট। 'ওঁদের কোন সন্তান ছিল না।' জোর করে সিঁড়ি বাইতে লাগল ন্যাট, মাঝ পথে এসে আবার নেমে এলো মিসেস ট্রিগের পা দেখেছে ও, বেডরুমের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে। শরীরের পাশে কালো পিঠের শঙ্খচিলের লাশ আর ভাঙা একটা ছাতা।

বউ আর বাচ্চাদের কাছে ফিরে এলো ট্রিগ। বলল, 'আমি গাড়িতে মাল ভরছি। কয়লা আর প্যারাফিন নেব। বাড়িতে জিনিসপত্রগুলো রেখে আবার আসব নতুন মাল নিতে।

'ট্রিগদের কথা বললে না ?' জানতে চাইল ওর স্ত্রী।

'ওঁরা নেই। বোধহয় বন্ধুর বাড়ি গেছেন', বলল ন্যাট।

'তোমার সঙ্গে হাত লাগাই ?'

'দরকার নেই। ওখানে নোংরা আবর্জনা ভরতি। গরু আর ভেড়াগুলো পায়খানা করেছে। দাঁড়াও, গাড়িটা নিয়ে আসি। তোমরা বসতে পারবে।'

উঠান থেকে গাড়ি চালিয়ে লেনে নিয়ে এলো ন্যাট। এখান থেকে ওর বউ এবং ছেলেমেয়ে দেখতে পাবে না জিমের লাশ।

'এখানে থাকো', বলল ন্যাট। 'গ্রাম নিয়ে ভাবতে হবে না। গ্রামে পরে মাল নেব। আগে গাড়িটা ভরে ফেলি।'

ন্যাটের বউ সারাক্ষণ লক্ষ করছে স্বামীকে। ও নিশ্চয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। নইলে ভিতরে যাওয়ার জন্য জিদ ধরত।

মোট তিনবার আসতে হলো খামারে প্রয়োজনীয় সব জিনিস নেয়ার জন্য। মোম, প্যারাফিন, পেরেক, টিনের খাবার, তালিকার শেষ নেই। জানালায় আরও তক্তা লাগানোর জন্য কাঠও নিল ন্যাট। তিনটে গরুর দুধ দোয়াল। নইলে যন্ত্রণায় ওরা চিৎকার করতে থাকত।

শেষবারের বার গাড়ি নিয়ে বাসস্টপে চলে এলো ন্যাট। ঢুকলো টেলিফোন বুদে। লাইন কাজ করছে না। বুদ থেকে বেরিয়ে এলো ন্যাট। নজর বুলাল চারিদিকে। জীবনের চিহ্ন নেই কোথাও। মাঠ বোঝাই শুধু পাখি আর পাখি। কয়েকটা পাখি ঘুমিয়ে পড়েছে পালকের মধ্যে ঠোঁট গুঁজে। হঠাৎ কথাটা মনে হলো ন্যাটের। ওদের এখন পেট ভর্তি। কাল রাতে প্রচুর খেয়েছে। এ কারণেই আজ সকাল থেকে সবাই নট নড়ন চড়ন...'

কাউন্সিল হাউজগুলোর চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না। জিলের বন্ধুদের কথা মনে পড়ল। আফসোস হলো ন্যাটের। কেন যে বাচ্চাগুলোকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল না!

আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইল ন্যাট। বর্ণহীন, ধূসর। ল্যান্ডস্কেপের গাছগুলো নগ্ন, নুয়ে আছে বাতাসের চাপে। ঠাণ্ডা বাতাস কাবু করতে পারেনি মাঠের পাখিগুলোকে।

'ওদেরকে কব্জা করার এটাই মোক্ষম সময়', ভাবল ন্যাট। 'সারা দেশে নিশ্চয় একই কান্ড ঘটিয়েছে ওরা। এয়ারক্রাফটগুলো মাস্টার্ড গ্যাস ছড়িয়ে মেরে ফেলছে না কেন পাখিগুলোকে? গাড়িতে ফিরে এলো ন্যাট, বসল ড্রাইভারের আসনে।

'দ্বিতীয় গেটের সামনে দিয়ে দ্রুত যাবে', ফিসফিস করল ওর স্ত্রী। 'পোস্টম্যানের লাশ পড়ে আছে ওখানে। আমি চাই না জিল দৃশ্যটা দেখুক।'

অ্যাকসিলেটরে চাপ দিল ন্যাট। লাফিয়ে উঠল ছোট মরিস। ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটল। বাচ্চারা মজা পেয়ে হাসতে লাগল।

পোনে একটায় বাড়ি পৌঁছুল ওরা। আর মাত্র একঘন্টা বাকি আছে।

'বাচ্চাদেরকে খাইয়ে দাও', বলল ন্যাট ওর স্ত্রীকে। 'তুমিও খেয়ে নাও। আমার খাওয়ার সময় নেই। জিনিসপত্রগুলো নামাতে হবে।'

মালপত্রগুলো ভিতরে নিয়ে এলো ন্যাট। সাজিয়ে রাখা যাবে পরে। সেজন্য দীর্ঘ সময় পড়ে আছে সামনে। আগে জানালা-দরজা সাইজ করতে হবে।

প্রতিটি জানালা ও দরজা পরীক্ষা করে দেখল ন্যাট। ছাদেও উঠল। প্রতিটি চিমনিতে তক্তা লাগাল, শুধু রান্নাঘর বাদে। এতো ঠাণ্ডা, সহ্য করতে পারছে না ন্যাট।

কিন্তু কাজ তো শেষ করতেই হবে। মাঝে মাঝেই আকাশের দিকে তাকালো প্রত্যাশা নিয়ে। এয়ারক্রাফটের দেখা নেই। প্রশাসনকে প্রাণ খুলে গালিগালাজ করল ন্যাট।

'এরকমই হয়ে আসছে সব সময়', বিড়বিড় করছে ও। আমাদেরকে ওরা কখনোই পাত্তা দেয় না। সব সময় শহরের লোকেদের সবকিছুতে অগ্রাধিকার। নিশ্চয় শহরে এয়ারক্রাফট দিয়ে গ্যাস ছিটাচ্ছে ওরা। আর আমরা এখানে নিয়তির হাতে নিজেদেরকে সঁপে দিয়ে বসে আছি।'

বিরতি দিল ন্যাট। বেডরুমের চিমনির কাজ শেষ। তাকালো সাগরের দিকে। কিছু একটা নড়ছে ওখানে। ঢেউয়ের মাঝখানে সাদা ও ধূসর কী যেন।

'নৌবাহিনী', উৎসাহিত হয়ে উঠল ন্যাট, 'ওরা আমাদের কথা ভাবে। উপকূলের দিকেই আসছে।'

অপেক্ষা করল ন্যাট, চেয়ে থাকতে থাকতে ব্যথা হয়ে গেল চোখ। বাতাসের ঝাপটায় জল চলে এল। অবশেষে ভুলটা বুঝতে পারল ন্যাট। জাহাজ নয়। নৌবাহিনী আসছে না। আসছে শঙ্খচিলের দল। উঠে আসছে যেন সাগরের বুক থেকে। মাঠের পাখিগুলো কীসের ইঙ্গিত পেল কে জানে, উঠে পড়ল শূন্যে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে, এক সঙ্গে। আবার শুরু হয়েছে জোয়ার।

মই বেয়ে নীচে নেমে এলো ন্যাট, ঢাকল রান্নাঘরে। খেতে বসেছে ওর পরিবার। দুটোর বেশি বাজে। দরজার ছিটকিনি টেনে দিল ন্যাট, বসাল ব্যারিকেড, তারপর মোমবাতি জ্বালল।

'এখন রাত', ঘোষণা করল ছোট্ট জনি।

ন্যাটের বউ রেডিও খুলেছিল। কোনও সাড়া শব্দ নেই।

'সবগুলো স্টেশনে নব ঘুরিয়েছি', জানাল সে। 'কিন্তু কোথাও থেকে কিছু শুনতে পাইনি। এমনকী বিদেশী স্টেশনগুলোও নিশ্চুপ!'

'হয়তো সবাই একই সমস্যায় আছে', মন্তব্য করল ন্যাট। 'গোটা ইউরোপই হয়তো এখন পাখিদের দখলে।'

স্বামীকে সুপের বাটি এগিয়ে দিল ন্যাটের স্ত্রী রুটিসহ। নীরবে খেল ওরা। জনির থুতনি বেয়ে এক টুকরো রুটি পড়ে গেল টেবিলে।

'ভদ্রভাবে খেতে শেখো, জনি', ওকে শাসাল জিল। 'নিজেই নিজের মুখ মুছতে শেখো।'

জানালায় আবার শুরু হলো ঠক্‌ঠক্ সেই সাথে দরজায়, জানালার ধারিতে খচখচ, ধাক্কা। সিঁড়িতে ধপ করে কিছু আছড়ে পড়ার শব্দ। সেই বোকা পাখিদের একটা।

'আমেরিকা কি কিছু করতে পারে না ?' জিজ্ঞেস করল ন্যাটের স্ত্রী। 'ওরা তো সব সময়ই আমাদের মিত্র, তাই না ?'

জবাব দিল না ন্যাট। জানালা এবং চিমনির তক্তাগুলো বেশ শক্ত। বাড়িতে জ্বালানি আর খাবার যা আছে তা দিয়ে আগামী কয়েকটা দিন চালিয়ে নেয়া যাবে। জানালায়, তক্তার সাথে কাঁটা তারের বেড়া লাগিয়ে দেবে ন্যাট। খামার থেকে প্রচুর এনেছে জিনিস। তবে সমস্যা হলো কাজটা করতে হবে অন্ধকারে।

ছোট পাখিগুলো জানালায় সমানে ঠোকর মেরে চলেছে। তবে বাজের দল ব্যস্ত দরজা নিয়ে। ওদের ভয়ানক শক্ত ঠোঁটের আঘাতে তক্তার ছিলকা উঠে যাচ্ছে, শব্দ শুনতে পেল ন্যাট। খুদে মস্তিষ্কে কতটা বুদ্ধি ধরে ভেবে অবাক হলো ন্যাট। ওরা মানব সভ্যতা নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার প্রতিহিংসা নিয়ে নেমেছে। ন্যাট জানে না আর ক'দিন টিকে থাকতে পারবে হিংস্র পাখিগুলোর বিরুদ্ধে।

'শেষ সিগারেটটা দাও', ন্যাট বলল ওর বউকে। 'খামার-বাড়ি থেকে এ জিনিসটা আনতে ভুলে গেছি।'

হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল ন্যাট। অন করল নীরব রেডিওর সুইচ। সিগারেটের খালি প্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল আগুনে। দেখছে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে ওটা।

দ্য ফল অব দ্য হাউজ অব আশার
এডগার অ্যালান পো

শরতের এক বিশ্রী, স্যাঁতসেঁতে দিনে আমি যাত্রা শুরু করলাম আশারদের বাড়ির উদ্দেশে। বেশ কয়েকটা গ্রাম পার হবার পর, সন্ধ্যার দিকে ওদের প্রাসাদটা চোখে পড়ল।

আশার আমার ছেলেবেলার বন্ধু। ওর পুরো নাম রডরিক আশার। বহুদিন ওর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। অবশ্য আমি থাকিও অনেক দূরে। তাই এদিকটাতে অনেকদিন আসা হয় না। আজকেও আসতাম না। কিন্তু দিন কয়েক আগে আশারের একটা চিঠি পেয়েছি আমি। ভয়ানক অসুস্থ সে, মানসিক ভারসাম্য নাকি হারিয়ে ফেলছে। এই মুহূর্তে একজন বন্ধুর সাহচর্য ওর খুব দরকার। আর পুরনো বন্ধু বলতে আমি ছাড়া আশারের কেউ নেই। আশারের প্রত্যাশা আমার সান্নিধ্যে সে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে। বাল্যবন্ধুর কাতর অনুরোধ ফেলতে পারিনি। তাই চিঠি পেয়ে ছুটে এসেছি।

রডরিক আশার আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও ওর সম্পর্কে আমি তেমন কিছুই জানি না।

আসলে ও মুখ ফুটে নিজের সম্পর্কে কখনও কিছু বলেনি। শুধু জানি কয়েক পুরুষ ধরে ওদের এই গ্রামে বাস। ওর পূর্ব-পুরুষদের অনেকেই শিল্পকলার চর্চা করতেন, ঝোঁক ছিল গানবাজনার প্রতি। কেউ কেউ ছিলেন বিখ্যাত দানবীর। গ্রামের সবচেয়ে পুরনো পরিবার বলে পরিচিত। আশারদের প্রাসাদটা বিশাল। কিন্তু কেমন যেন অশুভ একটা ব্যাপার আছে বাড়িটাকে ঘিরে। বিরাট প্রাসাদের কাঠামোটার দিকে তাকিয়ে আমার ভয়ই করতে লাগল। দেয়ালগুলো ধূসর, ঠাণ্ডা। দেয়াল ঢাকা পড়েছে শ্যাওলা আর লতানো উদ্ভিদের আড়ালে। জানালার দিকে চাইতে শিরশির করে উঠল গা। কোটরাগত শূন্য চোখে যেন চেয়ে আছে সবকটা জানালা। আয়ু ফুরিয়ে আসা কয়েকটা গাছ সাদা, মরাটে। এখনও ধুঁকতে ধুঁকতে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন বাড়িটির স্যাঁতসেঁতে মাটিতে।

আশারদের প্রাসাদের দিকে ভাল করে তাকাতে মনে হলো কুয়াশার অদ্ভুত একটা মেঘ যেন ঘিরে আছে ওটাকে। কাছের জলা আর মরতে বসা গাছ থেকে বাষ্প যেন উঠে আসছে। পাথুরে দেয়ালগুলোকে ধীরে ধীরে ঢেকে ফেলছে কুয়াশার মেঘটা। শেওলাপড়া হলেও বেশিরভাগ দেয়াল এখনও পোক্ত। শুধু দু'এক জায়গায় ফাটল ধরেছে। ভাল মতো লক্ষ করে বুঝলাম ছাদ থেকে একটা সরু ফাটল আঁকাবাঁকা হয়ে নেমে গেছে নিচে। এসব দেখতে দেখতে সরু লন ধরে এগোলাম বাড়িটার দিকে। চাকর শ্রেণীর এক লোক আমাকে দেখে এগিয়ে এল। ঘোড়াটার দায়িত্ব তাকে বুঝিয়ে আমি ধনুকাকৃতির হলঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। আরেক লোক আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল রডরিক আশারের কাছে।

বেশ কিছু অন্ধকার এবং আঁকাবাঁকা প্যাসেজ পার হতে হলো। ঢেউ খেলনা সিলিং, দেয়াল ভাঁজ খাওয়া কিছু ট্যাপেস্তি, কাঁলো কাঠের মেঝে ইত্যাদি কোন কিছুই আমার নজর এড়ালো না। সিঁড়িগোড়ায় পরিচয় হলো পারিবারিক ডাক্তারের সঙ্গে। কেন জানি তিনি গা মোড়ামুড়ি করতে লাগলেন, এদিক ওদিক তাকালেন সভয়ে, তারপর তড়িঘড়ি চলে গেলেন নিজের কাজে।

এক সময় একটা ঘরের দরজা খুলে দিল চাকরটা। দেখলাম আমার বন্ধু চেয়ারে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। আমাকে দেখে হাসি ফুটল তার মুখে, উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল।

রডরিক আশারের ঘরটা বেশ বড়। উঁচু ছাদ, জানালাগুলো এতো লম্বা এবং সরু যে মই বেয়ে ওগুলো খুলতে এবং বন্ধ করতে হয়। দেয়াল কালো পর্দা ঝোলানো। আসবাবগুলো পুরানো আমলের। ভাঙাচোরা, বিদঘুটে। প্রচুর বই আর বাদ্য বাজনার কয়েকটা সরঞ্জাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সারা ঘরে। পুরো পরিবেশটাই আমার কাছে বিষন্ন আর নিস্প্রাণ মনে হলো।

মানুষের জীবনে শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি বহু পরিবর্তন দেখেছি আমি। কিন্তু তাদের কারও সাথে রডরিক আশারের তুলনা হতে পারে না। ও বরাবরই রোগা-পাতলা ছিল, মুখটা ছিল সরু, ম্লান আর চোখ দুটো বড় বড়। কিন্তু এতো দিন পর ওর চেহারা দেখে রীতিমত চমকে উঠলাম। ভূতের মতো লাগছে আশারকে, চোখ দুটো ভয়ঙ্কর উজ্জ্বল। চুল কাটে না কদ্দিন কে জানে। মাথায় চিরুনিও বোধহয় পড়ে না বহুদিন। মুখটাকে প্রায় ঢেকে আছে কোঁকড়া চুলের ঢেউ, চেহারাটা আরও শুকনো দেখাচ্ছে।

সৌজন্য বিনিময়ের পর রডরিক তার অসুখ সম্পর্কে বলতে লাগল। বলল, অসুখটা অদ্ভুত এবং বিচিত্র। তার বংশের মানুষ এর আগেও এই অসুখে আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু কেউ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেনি। ওর মতে এটা বংশগত একটা অভিশাপ। এই অভিশাপ থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় নেই। ওর অবস্থা এমন হয়েছে যে খুব নরম এবং পাতলা কাপড় ছাড়া পরতে পারে না, বিস্বাদ খাবারগুলো খেতে ভাল লাগে, ক্ষীণ আলোও সহ্য হয় না চোখে। ফুলের গন্ধ নাকে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসে আশারের, কিছু বিশেষ বাদ্যযন্ত্রের বাজনা ছাড়া অন্য যে কোন শব্দ ওকে আতঙ্কিত করে তোলে।

এক অদ্ভুত আতঙ্ক পেয়ে বসেছে রডরিক আশারকে। 'সামনের দিনগুলোর কথা ভাবলেই আমার ভয় করে', বলল সে। 'মনে হয় ভয়ঙ্কর কোন ঘটনায় প্রাণ হারাব।'

রডরিকের সাথে কথা বলে বুঝলাম এই বিশাল প্রাসাদ সম্পর্কে প্রচুর কুসংস্কারে ওর অন্তর পূর্ণ। মনে হয় ঘরের দেয়াল, আসবাবপত্র, জলাভূমি পর্যন্ত ওকে থাবা মেরে ধরতে আসছে। ব্যাখ্যা করতে পারল না রডরিক, শুধু বলল, অজানা এক কারণে বহুদিন ঘরের বার হয় না সে।

খানিক ইতস্তত করে রডরিক এক সময় বলল ওর এই ভয়, ভীতি এবং আশঙ্কার পিছনে অনেকাংশে ভূমিকা রাখছে ওর বোন ম্যাডেলিনের দুরারোগ্য এক ব্যাধি। এই

দুনিয়ার রক্তের বন্ধন বলতে ম্যাডেলিন ছাড়া কেউ নেই রডরিকের। 'ও মারা গেলে' করুণ গলায় বলল আশার। 'আশার বংশের দীপ জ্বালাতে আমি ছাড়া আর কেউ থাকবে না।'

রডরিক কথা বলছে, এই সময় দূর প্রান্তের একটা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলো ম্যাডেলিন, আশারের দিকে তাকালো না পর্যন্ত, বেরিয়ে গেল আরেক দরজা দিয়ে। আমি ওর দিকে বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলাম। সেই সাথে কেন জানি ভয় ভয় করতে লাগল। ম্যাডেলিন চলে যেতে রডরিকের দিকে ফিরলাম আমি। দু'হাতে মুখ ঢেকে আছে সে, কংকালসার আঙুলের ফাঁক দিয়ে নামছে অশ্রুধারা।

ম্যাডেলিনের অসুখ ডাক্তাররাও ধরতে পারছেন না, বলল রডরিক। কোন কিছুর প্রতি আগ্রহ নেই ম্যাডলিনের। ধীরে ধীরে একটা ছায়াতে যেন পরিণত হচ্ছে সে, ঘন্টার পর ঘন্টা নীরবে বসে থাকে কিংবা দাঁড়িয়ে থাকে ম্যাডালিন। এক চুল নড়ে না।

ওই দিন সন্ধ্যায় রডরিক আমাকে জানাল ম্যাডেলিন বিছানা নিয়েছে। জানতাম না কয়েক ঘন্টা আগে জীবিত অবস্থায় আমি তাকে শেষবারের মতো দেখেছি।

তারপর আর নিজের বোন সম্পর্কে একটা কথাও বলল না রডরিক। পরের কয়েকটা দিন ওর বিষন্নতা দূর করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা চালালাম। এক সাথে বই পড়লাম, গিটারে সুর তুলল ও। আসলে পাগলের মতো বাজাল সে বাদ্যযন্ত্রটা, যেন ভৌতিক একটা কণ্ঠ উঠে এলো তারের ফাঁক দিয়ে, প্রতিধ্বনি তুলল দেয়ালে।

রডরিকের আঁকার হাত ভাল। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এই গুণটাও পেয়েছে। প্রচুর ছবি আঁকল সে এই ক'দিনে। তবে একটা ছবি আমার নজর কাড়ল। ছবিটা একটা সুড়ঙ্গের, একটানা লম্বা। দেয়াল বেশ নিচু, মসৃণ এবং ধবধবে সাদা, পরিষ্কার বোঝা যায় সুড়ঙ্গটা মাটির অনেক নিচে। বেরোবার কোন পথ নেই, নেই কোন মশাল। অথচ আলোকিত হয়ে আছে ওটা। যেন লুকানো সূর্য আলো ছড়াচ্ছে। অদ্ভূত ব্যাপার।

বড়রিক সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গল্প করে কেটে যেতে লাগল দিন। একদিন আশার বলল ওর মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। আইডিয়াটা কি জানতে চাইলাম আমি। আশার বলল ওর ধারণা ইট পাথরেরও প্রাণ আছে। আর মানুষের মতই উদ্ভিদ এবং ইট পাথর বেঁচে থাকে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে। বুঝলাম অসুস্থ মস্তিষ্ক আবার প্রলাপ বকা শুরু করেছে।

'এর প্রমাণও আমি তোমাকে দেখাতে পারব, বন্ধু' বলে চলল সে। 'তুমি তো আমাদের জলাটা দেখেছ। গোটা বাড়িটাকে বেড় দিয়ে রেখেছে ওটা। জলা থেকে এক খন্ড মেঘ ভেসে উঠে ঘিরে রাখে বাড়িটাকে। দেয়ালগুলোর ওপর চাপও সৃষ্টি করে।'

আমি বিস্মিত হয়ে তাকালোম ওর দিকে। মনে পড়ল আশারদের বাড়িটা দেখার পরে ঠিক একই রকম অনুভূতি আমারও হয়েছিল।

'আর জলা থেকে ভেসে আসা বাতাসটা আমার দম বন্ধ করে দিতে চায়। ওটা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এভাবে হয়তো আমরা একদিন শেষ হয়ে যাব।'

রডরিকের কণ্ঠে এমন কিছু ছিল যে ভয় লাগল আমার। বিষয়টা বদলে বইয়ের মধ্যে একটু পরে ওকে ডুবে যেতে দেখে স্বস্তি পেলাম যাহোক।

এভাবে চলে যাচ্ছিল দিন। একদিন সন্ধ্যায় রডরিক ম্লান মুখে জানাল মারা গেছে তার বোন ম্যাডেলিন।

রডরিক, কথাটা শুনে সত্যি আমার খুব খারাপ লাগছে, বলতে গেলাম আমি। কিন্তু রডরিক মাঝ পথে থামিয়ে দিল আমাকে। যেন আমার সান্ত্বনা বাক্য শোনেইনি।

'আমি ঠিক করেছি' বলল সে– 'কবর দেয়ার আগে সপ্তাহ দুই ম্যাডেলিনের লাশ লুকিয়ে রাখব। ডাক্তাররা তার অদ্ভুত অসুখের ব্যাপারে এখনও যথেষ্ট কৌতূহলী। ওরা ম্যাডেলিনকে আরও পরীক্ষা করে দেখতে চায়। আমি যদি এখন ওকে কবর দেই তাহলে হয়তো কবর খুঁড়েই ওরা ম্যাডেলিনের লাশ পরীক্ষা করে দেখতে চাইবে। কিন্তু আমরা কয়েকটা দিন দেরি করলে ওরা জানতেও পারবে না কোথায় ম্যাডেলিনকে কবর দিয়েছি।'

'ওকে কোথায় লুকিয়ে রাখতে চাও, রডরিক ?' জানতে চাইলাম আমি।

'আমাদের পারিবারিক গোরস্থান এখান থেকে বেশ দূরে। কিন্তু এই বাড়িতে প্রচুর গোপন ঘর আছে যেখানে...।' কথাটা শেষ করার আগেই সে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ল। সিদ্ধান্তটা অস্বাভাবিক, ভাবলাম আমি। কিন্তু ডাক্তারের শয়তানী চাহনির কথা মনে পড়ে গেল আমার। মৃত ম্যাডেলিনের লাশ নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করবে ওই ব্যাটা ভাবতেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। তারচেয়ে রডরিক ওকে লুকিয়ে রাখবে তাও ভাল।

কফিনে শোয়ানো ম্যাডেলিনের লাশ আমি আর রডরিক একটা ভূগর্ভস্থ কক্ষে নিয়ে গেলাম। ঘরটাকে একটা ভল্ট বলাও চলে, বাড়ির ফাউন্ডেশন দেয়ালের সাথে। ঘরটা ছোট, স্যাঁতসেঁতে, আলো-টালো নেই। আমি যে ঘরে শুই সেটার ঠিক নিচে এই ঘরটা।

বহু আগে এই ঘরটা কারাগার হিসেবে ব্যবহার করা হত। তারপর এটার রূপান্তর ঘটে গোলাবারুদের স্টোর রুম হিসেবে। ঘরটার দেয়াল, মেঝে, ভারি লোহার দরজাটা পর্যন্ত তামা দিয়ে মোড়ানো। ড্যাম্পের হাত থেকে রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা। লক্ষ করলাম খোলার সময় তীক্ষ্ণ, ঘরঘর আওয়াজ করল দরজাটা।

ভল্টের ভিতরে, কাঠের কতগুলো স্ট্যান্ডের ওপর কফিনটা রাখলাম দু'জনে। কফিনের ঢাকনা খুলে শেষবারের মতো তাকালাম মৃত ম্যাডেলিন মুখের দিকে।

এই প্রথমবারের মতো ভাই আর বোনের মধ্যে চেহারায় গভীর একটা মিল নজর কাড়লো আমার। আমার মনোভাব বুঝতে পেরেই বোধ হয় বিড়বিড় করে রডরিক বলল ওরা যমজ ছিল। জানাল দু'জনের মধ্যে কিছু অদ্ভুত ব্যাপারে বোঝাপড়া ছিল যা সচরাচর ভাই-বোনদের মাঝে দেখা যায় না।

ম্যাডেলিনের মুখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা গেল না। ওর মুখটা লালচে হয়ে আছে, অদ্ভুত এক টুকরো হাসি ঠোঁটে। গা শিরশির করে উঠল হাসিটা দেখে। ঢাকনা নামিয়ে দিলাম। বন্ধ করলাম কফিন। তারপর চলে এলাম বাইরে।

দিন যত যাচ্ছে রডরিকের আচার-আচরণ ততই পাল্টে যেতে লাগল। সে এখন আর গিটার বাজায় না, তুলি ছুঁয়েও দেখে না। এমনকি বই নিয়ে বসে না পর্যন্ত। সারাক্ষণ দেখি এঘর ওঘর করছে, চেহারায় উদ্ভ্রান্ত ভাব। ঝকঝকে চোখের ঔজ্জ্বল্য নিষ্প্রভ হয়ে এলো ক্রমশ, বিমর্ষ মুখটা ভীতিকর হয়ে উঠল।

ও আমার সাথে যখন কথা বলে মনে হয় অজানা কোন ভয়ে কাঁপতে থাকে। মাঝে মাঝে মনে হয় রডরিক যেন একটা গোপন কথা বলার চেষ্টা করছে আমাকে কিন্তু সাহসে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। আবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওকে শূন্য চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মনে হয় পাগল হয়ে গেছে রডরিক। কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করে সে কখনও কখনও।

রডরিকের এরকম অবস্থা দেখে আমি ভীত হয়ে উঠলাম। ওর ভয় গ্রাস করল আমাকেও। মনে হলো আতঙ্কের অক্টোপাস যেন শূঁড় নেড়ে ধরতে আসছে আমাকে।

আতঙ্কটা ধীরে ধীরে আমাকে পেয়ে বসল। তারপর ম্যাডেলিনকে কবর দেয়ার এক সপ্তাহ পরে ঘটলো সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা যার কথা জীবনেও ভুলব না।

সেদিন বাইরে প্রচন্ড ঝড় হচ্ছিল। ঘুম আসছিল না। অন্ধকারে চুপচাপ শুয়ে ছিলাম। খুব নার্ভাস বোধ করছিলাম। চেষ্টা করছিলাম অস্বস্তিকর অনুভূতিগুলো ঝেড়ে ফেলতে। বারবার মনে হচ্ছিল আমার ঘরের আসবাবপত্র আর দেয়ালের ছবিগুলো যেন জ্যান্ত হয়ে উঠছে। মনকে প্রবোধ দিলাম ভয় পেয়েছি বলে এরকম ভাবছি আমি। আসলে সবই ভুয়া।

কিন্তু ভয় ভয় ভাবটা গেল না কিছুতেই। আরও যেন চেপে বসল মনের গভীরে। বিছানার ওপর উঠে বসলাম, একটা শব্দ কানে এসেছে। ঝড়ো বাতাসের গোঙানি ছাপিয়েও ওই শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি। নিচু, অস্পষ্ট একটা আওয়াজ। একটু পর মিলিয়ে গেল ওটা, আবার শুরু হলো। গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল অজানা ভয়ে।

এভাবে ঘুমানোর চেষ্টা বৃথা। তাই উঠে পড়লাম বিছানা ছেড়ে, জামাকাপড় পরতে শুরু করলাম। হঠাৎ মেঝেতে কার যেন পায়ের শব্দ! বারান্দা ধরে হাঁটছে। এমন ঝড়ের রাতে কে এলো ?

দড়াম করে খুলে গেল দরজা। ঝড়ের গতিতে ভেতরে ঢুকলো রডরিক আশার। বিস্ফারিত চোখ, হাঁ হয়ে আছে মুখ। কিছুক্ষণ চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকল রডরিক, যেন ভীষণ ভয় পেয়েছ। তারপর হঠাৎ কথা বলতে শুরু করল।

'তুমি দেখোনি ওটা ?' জিজ্ঞেস করল সে, 'না দেখলে এখুনি দেখতে পাবে!' বলে ক্ষিপ্র পায়ে রডরিক এগোল জানালার দিকে, ঝট্ করে খুলে ফেলল কবাট।

বাতাসের তীব্র একটা ঝাপটা ঢুকলো ভেতরে, আমাদের প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইল। বাইরে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম আমি। অদ্ভুত সুন্দর একটা রাত। বাড়িটার ছাদের ওপর যেন ঝুলে আছে ঘন মেঘের সারি। বাতাস শোঁ শোঁ গর্জন শুরু করেছে। মেঘগুলো সার বেঁধে উড়ছে, হঠাৎ দলছুট হয়ে গেল। উড়ন্ত মেঘের নিচের অংশ আর

গাছের গুঁড়িগুলোকে যেন ঘিরে আছে অস্বাভাবিক একটা আলোর ছটা। আকাশে চাঁদ নেই; তারাও জ্বলছে; ঝলসে উঠছে না সাপের জিভের মতো বিদ্যুৎ। তাহলে ওই অদ্ভুত আলোটা এলো কোত্থেকে ? মনে হলো পুরনো প্রাসাদটাকে যেন বৃত্ত করে ঘিরে রেখেছে ওটা।

'না, ঝড় দেখতে হবে না তোমাকে', গলার স্বর কেঁপে উঠল আমার কথা বলার সময়। বড়রিক জোর করে জানালার কাছ থেকে ঠেলে আনলাম, বসিয়ে দিলাম একটা চেয়ারে। 'তুমি যা দেখে অবাক হয়েছ', বললাম আমি। 'তার মধ্যে অস্বাভাবিক কোন ব্যাপার নেই। ঝড়ের সময় এরকম আলো প্রায়ই দেখা যায়। হতে পারে দীঘির বুকে যে বাষ্প জমেছে তার থেকে এই আলোর সৃষ্টি। যা-হোক, আমি এখুনি জানালাটা বন্ধ করে দিচ্ছি। ঠাণ্ডা বাতাসে তোমার ক্ষতি হতে পারে।'

জানালা বন্ধ করে দিলাম আমি। রডরিক কোন প্রতিবাদ করল না। হাতের কাছে টেবিলের ওপর যে বইটা পেলাম তুলে নিলাম। বললাম, 'এসো, বই পড়ে আজকের ঝড়ের রাতটা কাটিয়ে দেই।'

গল্পটা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী। গল্পের নায়ক ইথেলরেড, এক শয়তান সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়েছে। আমি পড়তে লাগলাম। সন্ন্যাসীর বাড়ির দরজার সামনে এসে ইথেলরেড হাতের তরবারি দিয়ে কাঠের তক্তার ওপর প্রচন্ড জোরে কয়েকটা বাড়ি মারল। দরজা ভেঙে টুকরো হয়ে গেল।

বাক্যটা মাত্র পড়া শেষ করেছি, দারুণ চমকে উঠলাম আমি। মনে হলো (নাকি স্রেফ আমার কল্পনা ?) বাড়ির কোন চোরা কুঠুরি থেকে একই রকম শব্দ ভেসে এলো যার বর্ণনা একটু আগে আমি দিয়েছি। তক্তা ভাঙার শব্দ!

ঝড়ের মধ্যে কত কি শব্দ হতে পারে, ব্যাপারটাকে আমল দিতে চাইলাম না। মনোনিবেশ করলাম পড়ায়- 'ঘরে ঢুকে সন্ন্যাসীর কোন চিহ্নও দেখল না ইথেলরেড। তার বদলে ওর নজর আটকে গেল একটি ড্রাগনের দিকে। ড্রাগনটার মুখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে, রুপোর মেঝে আর সোনার তৈরি একটা প্রাসাদ পাহারা দিচ্ছে ওটা। ইথেলরেড তরবারির এক কোপে ধড় থেকে মুণ্ডু নামিয়ে ফেলল ড্রাগনটার। সাথে সাথে বীভৎস এবং ভয়ঙ্কর একটা চিৎকার দিল ওটা...।'

এই লাইনটা পড়া মাত্র আমার কানে দূরাগত ক্ষীণ একটা চিৎকার ভেসে এল। মনে হলো গল্পের ড্রাগনের মতই গগনবিদারী আর্তনাদ করে উঠেছে কেউ অনেক দূর থেকে। এই অপার্থিব আর্তনাদ আমার কানের ভ্রম নয়, নয় কল্পনাও স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমি। ভয়ের শীতল একটা স্রোত যেন জমিয়ে দিল আমাকে। সত্যি সত্যি এবার চিৎকারটা শুনতে পেয়েছি। কিন্তু নিজের মনের অবস্থা টের পেতে দিলাম না রডরিককে। তাহলে উত্তেজিত হয়ে ও হয়তো কোন অঘটন ঘটিয়ে ফেলবে। হয়তো চিৎকারটা ও শুনতেই পায়নি। নাকি এবারও আমি ভুল শুনেছি ?

তবে রডরিকের মধ্যে হঠাৎ একটা পরিবর্তন লক্ষ করলাম। এতক্ষণ দু'জনে মুখোমুখি বসেছিলাম, এবার রডরিক চেয়ার ঘুরিয়ে দরজার দিকে মুখ করে বসল। ওর

ঠোঁট কাঁপতে লাগল; মাথাটা নিচু হতে হতে বুকে গিয়ে ঠেকল; চোখজোড়া বিস্ফারিত। এই অবস্থায় সে এদিক ওদিক দুলতে শুরু করল।

'এবার ইথেলরেড ড্রাগনের লাশটা ঠেলে সরিয়ে সাহসের সাথে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে গেল, ওর পায়ের শব্দ উঠল রূপালি মেঝেতে।'

'প্রাসাদের দরজায় একটা সুদৃশ্য, ঝকমকে ঢাল ঝুলছিল-ড্রাগনকে যে হত্যা করতে পারবে তার জন্য পুরস্কার। ইথেলরেড ঢালের দিকে এগোতেই ওটা খসে পড়ল পায়ের কাছে, মেঝের ওপর। বিরাট এবং ভয়ঙ্কর ঝনঝন শব্দ ছড়াল চারদিকে।'

বাক্যটা শেষ করতেও পারিনি, লাফিয়ে উঠলাম আরেকটা শব্দে। দূর থেকে ভারী, ধাতব শব্দটা ভেসে এসেছে। রডরিকের দিকে তাকিয়ে দেখি ওর কোন ভাবান্তর নেই। আগের মতই চেয়ারে দোল খাচ্ছে সে, চোখ দুটো ভাষাহীন।

ওর দিকে এগিয়ে গেলাম আমি, কাঁধ চেপে ধরে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম। গায়ে হাত রাখতেই সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল রডরিকের। কথা বলতে শুরু করল সে। নিচু গলায় বিড়বিড় করছে, আমি যে আছি তাও লক্ষ করল না।

'শোনোনি তুমি ? কিন্তু আমি শুনেছি!' কাঁপা গলায় বলল সে। 'বহু মিনিট, বহু ঘণ্টা আর বহুদিন ধরে আমি ওটা শুনে চলেছি। তবু সাহস পাইনি-ওহ্, বলতে সাহস করিনি আমরা ওকে জ্যান্ত কবর দিয়েছি! হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই। ওকে আমরা জ্যান্ত কফিনে পুরেছি। কিন্তু কথাটা বলার সাহস পাইনি-কিছুতেই পাইনি। আর এখন আজ রাতে ইথেলরেড হা!, হা!। সন্ন্যাসীর দরজা ভাঙল-মৃত্যুচিৎকার দিয়ে উঠল ড্রাগন। ঝন ঝন শব্দে পড়ে গেল ঢাল-বরং বলো কফিনের ডালা ভেঙে আর্তনাদ করে উঠল ম্যাডেলিন। তারপর তামায় মোড়া সরু বারান্দায় ছুটোছুটি শুরু করল ঝনঝন শব্দে। ওহ্! এখন আমি কোথায় পালাব ? ও এক্ষুণি এসে হাজির হবে এখানে! মৃত্যুর আগেই জ্যান্ত কবর দিয়েছি বলে আমাকে ভয়ঙ্কর শাস্তি দেবে। ওই যে, শুনতে পাচ্ছ না সিঁড়িতে ওর পায়ের আওয়াজ। শুনছ না ওর হৃৎপিন্ডের প্রচন্ড শব্দ!'

বলে বিরাট এক লাফ মারল রডরিক।

'পাগল!' গলা চিরে আর্তনাদ বেরিয়ে এলো তার। 'পাগল! ওই দেখো ও দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।'

রডরিকের কথা শেষ হবার সাথে সাথে খুলে গেল দরজা। বাতাসের আবার একটা ঝাপটা এলো ভিতরে। আর আমি দেখলাম...দেখলাম চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে সাদা কাপড়ে আপাদমস্তক ঢাকা লেডি ম্যাডেলিন। ওর কাপড়ে রক্তের ছোপ স্পষ্ট, যেন প্রচন্ড যুদ্ধ করে এসেছে।

এক মুহূর্ত ম্যাডেলিন দাঁড়িয়ে থাকল দোর গোড়ায়। তারপর অমানুষিক একটা চিৎকার করে যেন উড়ে এল, ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ভাইয়ের ওপর। গা হিম করা আরেকটা চিৎকার শুনলাম আমি। রডরিকের মৃত্যু চিৎকার। প্রতি মুহূর্তে যে আতঙ্কের অপেক্ষায় ছিল, সেই আতঙ্কের শিকার হয়ে ওকে নৃশংসভাবে মরতে হলো।

হঠাৎ তীব্র আলোর একটা ঝলক দেখলাম। পিছন ফিরে তাকালোাম। এদিকে শুধু আশারদের বাড়িটা বিরাট ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে।

এই সময় বুঝতে পালাম আলোর উৎস কোথায়। রক্তলাল একখানা চাঁদ উঠেছে আকাশে, আলোর ঝলকটা এসেছে ওখান থেকেই। প্রাসাদের বিরাট ফাটলটা আলোকিত হয়ে উঠেছে ঝলকানিতে।

ওদিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ দেখি ফাটলটা ক্রমে চওড়া হতে শুরু করেছে। এমনসময় দমকা একটা বাতাস ছুটে এল, সশব্দে আছড়ে পড়ল বাড়িটার ওপরে। হাঁ করে দেখলাম বাতাসের আঘাতে বিশাল খিলান আর দেয়ালগুলো ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গোটা প্রাসাদ ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। আর ঠিক তখন কানে ভেসে এলো উন্মত্ত জলরাশির গর্জন। জলার পানি যেন সাগরের ঢেউ হয়ে উঠে এলো ওপরে, বানের জলের মতো ভাসিয়ে নিয়ে গেল আশারদের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। আর হাঁটু পানিতে আতঙ্কিত এবং হতবুদ্ধি আমি স্থির দাঁড়িয়ে দেখলাম ভয়াল এই রাতের সর্বশেষ ধ্বংসযজ্ঞ।

দ্য উইন্ডো ওয়াচার

ডুলসি গ্রে

ম্যানহাটনের নতুন ফ্ল্যাট বাড়িটাতে আসার প্রায় বছরখানেক পর একটা আইডিয়া এসেছে জেনিফারের মাথায়। আজ রাতেও বাবা-মা বাড়িতে থাকবেন না, পার্টিতে যাবেন। কাজেই চমৎকার সময় পাওয়া যাবে ওদের ফ্ল্যাটের অপজিটে, মোনা টাওয়ারের ছ'তলার ওই দম্পতিকে পর্যবেক্ষণ করার।

জেনিফারকে সবাই বোকা ভাবে। সবার ধারণা ওর মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধির বালাই নেই, খালি গোবর পোরা। কিন্তু অতটা বোকা জেনিফার আদৌ নয়। বোকা হলে কি এমন চমৎকার একটা পিপ-শো দেখার বুদ্ধি বার করতে পারত? গোটা ব্যাপারটাই মজাদার একটা খেলা জেনিফারের কাছে। আর ওর খেলার অনুষঙ্গ হলো মানুষ। মানুষকে সার্কাসের পুতুল বানিয়ে, নিজেকে পাপেট মাস্টার ভেবে দারুণ পুলকিত হয় জেনিফার। নিজেকে প্রায় ঈশ্বরের সমকক্ষ মনে হয়।

জেনিফারের বাবা-মা বাইরে যাবার জন্যে রেডি হচ্ছেন। একমাত্র বড় ভাইটা রোজকার মতো টাংকি মারতে গেছে সেই মেয়েটার কাছে। মেয়েটা হোস্টেলে থাকে। জেনিফার ঠিক করেছে, আর আধা-ঘন্টার মধ্যে ঘরের বাতি নিভিয়ে পর্দাটা টেনে দিবে। তার পুতুলগুলো যদি বাড়িতে থাকে, তাহলে খেলা শুরু হতে বেশি সময় লাগবে না।

জেনিফাররা যখন প্রথম এ ফ্ল্যাটে এল, ফ্ল্যাটটির ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখায়নি। আসলে সে তার আঠারো বছরের জীবনে এতো বেশি বার বাসা বদল করেছে যে ব্যাপারটাতে তার ঘেন্না ধরে গেছে। একটা বাড়িও তার মনের মতো হয়নি। সবগুলোই নোংরা এবং অনাকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। এ বাড়িটাও আগেরগুলোর মতই। কিন্তু কিছুদিন যেতে জেনিফার টের পেল এখানে ব্যতিক্রমী কিছু জিনিস আছে। জেনিফারের বাবা একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির পারচেজ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার। ধাপে ধাপে তাঁর পদোন্নতি হয়েছে। আর সেই সাথে স্ট্যাটাস বজায় রাখার খাতিরে চলছে বাসা বদল। সব শেষে ঠাঁই নিয়েছেন আকাশ ছোঁয়া এই অট্টালিকাতে।

জেনিফারের নামটি সুন্দর হলেও দেখতে সে সুন্দরী নয় মোটেই। ভয়ানক মোটা ও। ভোঁতা চেহারাটা অভিব্যক্তিহীন। কোটর ছেড়ে চোখ জোড়া ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। মাথায় জট পাকানো চুল। শরীরের কোথাও কোন বাঁক নেই। জেনিফারের পা দুটো হাতির মত, হাত জোড়া থলথলে, মাংসল। লোকে বলে, জেনিফার অ্যাবনরমাল। শরীর বেড়েছে ঠিকই, মন মানসিকতা এখনও শিশুর মতই রয়ে গেছে। কিন্তু ওরা জেনিফারকে ঠিক মতো চিনতে পারেনি। ওর মস্তিষ্কে সামনের বিল্ডিং এর মানুষ দুটোকে নিয়ে যে খেলার পরিকল্পনা চলছে, জানতে পারলে ওরা নির্ঘাত চমকে যেত। জেনিফার নিজেকে অনেকের চেয়ে বুদ্ধিমতী ভাবে।

বেশ কিছুদিন আগে, এক সন্ধ্যাবেলার ঘটনা ছিল সেটা। সেদিনও জেনিফারকে তার বাবা-মা একা ঘরে তালা মেরে রেখে গেছেন। জেনিফারকে কখনোই বাবা-মা বাইরে নিয়ে যান না লোকের সামনে অপদস্থ হবার ভয়ে। জেনিফার যখন আরও ছোট ছিল তখন অবশ্য বাবা-মা ওকে একা রেখে কোথাও যেতেন না। একবার ওকে একা বাড়িতে রেখে যাওয়ায় জানালার পর্দায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল ও। টিভিতে কি একটা ছবিতে এরকম আগুনের দৃশ্য দেখার পর জেনিফারের খুব লোভ জাগে খেলাটা খেলতে। খেলাই তো! জেনিফরের কাছে স্রেফ নির্জলা আনন্দ ছাড়া কিছু নয়। ভাগ্যিস সেবার মিসেস প্যাকমান পাশের বাড়িতে ছিলেন। কাপড় পোড়া গন্ধ পেয়ে ঘরে ঢুকে তিনি দেখেন জানালায় আগুনের শিখা দাউদাউ করছে আর তাঁর হাবাগোবা মেয়েটা আনন্দে হাততালি দিচ্ছে। আগুন নেভাতে দমকল বাহিনী ডাকতে হয়েছিল। আর জেনিফার খেয়েছিল প্রচন্ড মার। সেই জেদে জেনিফার তাঁর মা'র শখের কয়েকটা কবুতরের বাচ্চা (তিনি ব্যালকনিতে কবুতর পুষতেন) ফেলে দিয়েছিল নিচে। মা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন কিনা কে জানে। তবে জেনিফারকে কিছু বলেননি। হিতে বিপরীত হবার ভয়েই হয়তো শাসন করেননি। আর তাতে জেনিফার মজা পেয়ে গেল আরও। বাবা একবার বাজার থেকে বেশ কতগুলো মুরগীর বাচ্চা এনেছিলেন। ভাইয়ার তখন অসুখ। গায়ে জোর হবে বলে মুরগীর সুপ খেতে বলেছিলেন ডাক্তার। মুরগীর বাচ্চাগুলোকে আদর করছিল জেনিফার। ওদের গা বেশ গরম ঠেকছিল ওর কাছে। জ্বর হয়েছে ভেবে সব ক'টা বাচ্চাকে ওদের ডীপ ফ্রিজে পুরে রেখেছিল জেনিফার। ভেবেছিল ঠাণ্ডায় জ্বর কমে যাবে। আয় হায়! সকালে ফ্রিজের মধ্যে মরে শক্ত হয়ে যাওয়া মুরগীর বাচ্চা দেখে সে কি কান্ড। ভাইয়া জ্বর শরীর নিয়ে বকতে বকতে প্রচন্ড এক চড় বসিয়ে দিয়েছিল জেনিফারের গালে। উঃ মা! হাত ছোঁয়ালে গালটা এখনও টনটন করে ওঠে ব্যাথায়। ভাইয়ার ওপর ঘেন্না ধরে যায় জেনিফারের তখন থেকে। তারপর সেবার যে ভয়ানক বন্যা হলো শহর ডোবে ডোবে অবস্থা, জেনিফাররা তখন যেখানে থাকে, সেখানে বন্যার্ত মানুষের সাহায্যে এসেছিল একজন লোক। জেনিফার তার ভাইয়ার সব জামা কাপড় দিয়ে দিয়েছিল ওই লোকগুলোকে। এমন কি নতুন কেনা জিন্স প্যান্টটা পর্যন্ত। ঘরে ফিরে ভাইয়া জেনিফারকে এই মারে তো সেই মারে! ছেলেমানুষ, না বুঝে কাজটা করে ফেলেছে; বলে মা অনেক কষ্টে সেদিন ফিরিয়েছেন ভাইয়াকে।

এসব অনেক আগের ঘটনা। এখন জেনিফার অনেক বড় হয়ে গেছে। আগের মতো আর দুষ্টুমি-ফাজলামি করতে গিয়ে কোন অঘটন ঘটায় না। কিন্তু তারপরও সারাক্ষণ ওকে একা বসে থাকতে হয় ঘরে। প্রতিবাদ করে লাভ হবে না জেনে জেনিফার এতদিন নীরব থেকেছে। কিন্তু ম্যানহাটনের এই বাড়িতে আসার পরে যেদিন বিপরীত দিকের অ্যাপার্টমেন্টের মানুষ দু'জনকে নিয়ে চমৎকার এক বুদ্ধি ফাঁদল সে, তারপর থেকে বেশ উত্তেজনার মাঝে কেটে যাচ্ছে সময়।

জেনিফারের শোবার ঘর থেকে মোনা টাওয়ারের দম্পতির ফ্ল্যাট স্পষ্ট দেখা যায়। বোঝাই যায় ওরা খুব ধনী। ওদের দুটো গাড়ি, লক্ষ করেছে জেনিফার। আর মাঝে

মাঝেই বাড়িতে কোন না কোন পার্টি থাকে। জেনিফার এটাও লক্ষ করেছে ওই দম্পতির শোবার ঘর কিংবা ড্রইং রুমের পর্দা কখনও টানা থাকে না। ওরা হয়তো জানেও না জেনিফার নামের একটা মেয়ে ওদেরকে গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। বিশেষ করে গা জ্বলা গরমের এই সময়টাতে দখিনা বাতাসের লোভেই হয়তো ওরা জানালাগুলো খুলে রাখে।

জেনিফারের ঘর থেকে মোনা টাওয়ারের বেশ ক'টা ফ্ল্যাট পরিষ্কার দেখা যায়। একবার চার তলায় দুই মহিলাকে বিকট মুখভঙ্গী করে ঝগড়া করতে দেখেছিল সে। পাঁচ তলায় এক গন্ডা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে এক রাশান তার বৌকে নিয়ে থাকে। পুতুল পুতুল বাচ্চাগুলোকে দেখলেই জেনিফারের খামচে দিতে ইচ্ছে করে।

ছয় তলার দম্পতিদের দিকে নজর আটকে যায় জেনিফারের। সেই রাতে ওই দম্পতির বাসায় জম্পেশ কোন পার্টির ব্যবস্থা ছিল। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই দেখতে আকর্ষণীয়। দু'জনেই বেশ লম্বা। মেয়েটি সবুজ রঙের একটি দামী ড্রেস পরেছিল। ফর্সা রঙের সাথে মানিয়ে গিয়েছিল বেশ। আর ছেলেটির পরনে ছিল কমপ্লিট স্যুট। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল দু'জনেই, হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছিল ধোপ দুরস্ত পোশাক পরা আমন্ত্রিত মেহমানদেরকে।

অতিথিরা চলে যাবার পর ওরা দু'জনে এসে ঝুল-বারান্দায় বসে। ছেলেটি একটি সিগারেট ধরায়। মেয়েটির হাতে ছিল কালচে রঙের তরল পদার্থ ভরা একটি গ্লাস, সম্ভবত কোক বা পেপসি। ওরা কি যেন বলছিল আর খুব হাসছিল। তারপর মেয়েটি প্রবলভাবে মাথা নেড়ে আপত্তি জানায়। কিন্তু ছেলেটি তার কথা না শুনে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে এবং চুমু খেতে শুরু করে। একটু পরে মেয়েটিও সাড়া দেয়।

প্রবল অস্বস্তি নিয়ে দৃশ্যটা দেখছিল জেনিফার। একই সাথে তার শরীরের ভেতর জাগছিল উত্তেজনা এবং রাগ। ওরা দু'জনেই অত্যন্ত আকর্ষণীয়, সন্দেহ নেই। তাই বলে খোলামেলা জায়গায় এতো বেশি খোলামেলা আচরণ বরদাশত করা যায় না। জেনিফারের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল যখন দেখল ছেলেটা প্রায় পাঁজাকোলা করে মেয়েটিকে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল। ওদের বেডরুমে আলো জ্বলছিল। ছেলেটি এবার মেয়েটির ইভনিং ড্রেসের শোল্ডার স্ট্র্যাপ খুলে ফেলে, বেরিয়ে পড়ে ফর্সা অনাবৃত কাঁধ। মেয়েটি ছেলেটিকে হেসে হেসে কি যেন বলে। ছেলেটি এগিয়ে যায় জানালার দিকে। ফেলে দেয় ভারি পর্দা।

তারপর থেকে জেনিফারকে পেয়ে বসে অদ্ভুত এক নেশায়-ওই দম্পতিকে প্রতিদিন দেখা চাই। এখন তো ব্যাপারটা রীতিমত অবসেশনে পরিণত হয়ে গেছে। জেনিফার এখন ওই দম্পতির আদ্যপান্ত সব জানে। ছেলেটির নাম ড্যানিস হুইটলি। সে একটি বিদেশী ব্যাংকের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। মেয়েটি মারিয়া শ্রিভার। এক সিনেটরের মেয়ে। মারিয়া জেনিফারের চেয়ে মাত্র বছর তিনেকের বড়। আর এ কারণেই মারিয়াকে ঘৃণা করতে শুরু করে জেনিফার। কারণ মারিয়া অনেক সুন্দরী, অনেক কম বয়স, অনেক ধনী এবং অনেক হ্যান্ডসাম এক স্বামীর স্ত্রী। সে তুলনায়

জেনিফার কি ? কি আছে তার ? ঈশ্বর তাকে কি দিয়েছেন ? কিছুই না। অথচ মারিয়া সব পেয়েছে বেশি বেশি। খুব বেশি। এতো বেশি পাওয়া উচিত হয়নি তার। মারিয়ার সুখ, তার সুখের সংসার জেনিফারের বুকে জ্বালা ধরায়। একই সাথে ঘৃণা হয় তার ড্যানিস হুইটলির প্রতি। কেন ড্যানিস হুইটলি তার জীবনে এলো না ? কেন মারিয়া তার জীবন সঙ্গিনী হলো ? অর্থহীন যুক্তি। অন্তত সাধারণ মানুষের কাছে। কিন্তু জেনিফারের কাছে নয়। জেনিফার তার ভাইয়ের প্রেমিকাকেও সহ্য করতে পারে না। জানে হোস্টেলের ওই মেয়েটাকেই ভাইয়া বিয়ে করবে। অথচ সে বিয়েতে তাকে যেতে দেয়া হবে না। যদি কোন অঘটন ঘটিয়ে ফেলে জেনিফার ? তখন ?

এত বৈষম্য মেনে নিতে পারে না জেনিফার। সবাই যেন তাকে নিয়ে খেলা করছে। সে যেন একটা পুতুল। কদর্য, বোকা একটা পুতুল। যাকে দেখলেই হাসি পায়। জেনিফার বুঝতে পারে সব। মনে মনে হাসে। সিদ্ধান্ত নেয় সেও ওদেরকে নিয়ে খেলবে।

জেনিফার হুইটলি দম্পতির কাছে প্রথম চিঠিটি পাঠাল ওদেরকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করার ছয় হপ্তা পর। চিঠিটি লেখার আগে বহুবার ভাবতে হয়েছে তাকে। কতবার যে কাগজ ছিঁড়েছে! তারপর গোটা গোটা অক্ষরে, যতটা পরিষ্কারভাবে পারা যায়, লিখল সে; 'মি. হুইটলি, আপনি যখন বাইরে থাকেন, জানেন আপনার স্ত্রী তখন কি করে ? ওকে নিয়ে পড়শীরা ননা কথা ছড়াতে শুরু করেছে।' জেনিফার ঠিকানা লিখল: মি. জানিস দুইটলি। ৬/বি মোনা টাওয়ার, ম্যানহাটন, নিউইয়র্ক। বাবা-মা বাইরে, এরকম সুযোগে নিচের লেটার বক্সে চিঠিটা ফেলে দিয়ে এলো জেনিফার।

ফলাফল হলো সন্তোষজনক। সেদিনও হুইটলি দম্পতি পার্টির আয়োজন করেছে, খাওয়া-দাওয়ার পর যথারীতি সবাই চলে গেলে ওরা দু'জন ঝুল-বারান্দায় এসে সেই আর্ম-চেয়ার দুটোতে বসল। একটু পরে হুইটলি জেনিফারের চিঠিটি পকেট থেকে বের করে স্ত্রীর হাতে দিল। হাসছে সে, তবে জেনিফার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, হাসিটা খুব একটা আন্তরিক নয়। মারিয়া চিঠি পড়ছে। হুইটলি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আছে, লক্ষ করছে প্রতিক্রিয়া। ভ্রূ কুঁচকে উঠল মারিয়ার। সুন্দর দুই টানা ভ্রূ'র মাঝখানে কপালের ভাঁজটাও নিখুঁত দেখতে পেল জেনিফার বিনকিউলারে চোখ লাগিয়ে। শক্তিশালী এই বিনকিউলারটা বাবা তার জন্মদিনে গিফট দিয়েছিলেন। এতদিন পরে যথার্থ কাজে ব্যবহার হচ্ছে যন্ত্রটা। এদিক ওদিক মাথা নাড়ল মারিয়া, তারপর হেসে ফেলল। হাসি ফুটল না হুইটলির মুখে। কি যেন বলল সে স্ত্রীকে। প্রথমে শান্তভাবে কথা বলল দু'জনেই, তারপরই উত্তপ্ত হয়ে উঠল পরিবেশ। উত্তেজিত হয়ে উঠছে মারিয়া এবং হুইটলি। মারিয়ার কি একটা কথায় হুইটলি এতো রেগে গেল যে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল স্ত্রীর গালে। মুখে হাত চাপা দিল মারিয়া, মুখ গুঁজল চেয়ারের হাতলে, থেকে থেকে কেঁপে উঠল পিঠ। হুইটলি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল স্ত্রীর পেছনে। এতো বেশি সময় যে জেনিফারের আর দেখার ধৈর্য থাকল না। চেয়ে থাকতে থাকতে ব্যথা হয়ে গেছে চোখ। তাছাড়া মা-বাবার ফেরার সময়ও হয়ে গেছে।

ওরা এসে যদি দেখেন জেনিফার জেগে আছে এখনও খুব রাগ করবেন। আজ অবশ্য তাড়াতাড়িই বিছানায় গেল জেনিফার। সন্তুষ্ট মন নিয়ে।

মাসখানেক পর জেনিফার ফোন করল হুইটলিকে। এমন কিছু কথা বলল যে মারিয়ার সাথে ঝগড়া বাঁধানোর জন্যে তা ছিল যথেষ্ট। জেনিফার প্রফুল্ল মন নিয়ে দেখল ফোনে কথা বলার পর হুইটলি মারিয়াকে রেগে রেগে কি যেন বলল। মারিয়া চোখে জল নিয়ে দৌড়ে বেরুল ড্রইংরুম থেকে, ঢুকলো বেডরুমে। পেছনে দরজা বন্ধ হলো সশব্দে। দরজা বন্ধের শব্দ এখান থেকে শোনা না গেলেও জেনিফার কল্পনায় ভেবে নিয়েছে তাই।

মাস দুই পর আবার কাজে লাগল জেনিফার। অপজিট ফ্ল্যাটের দম্পতিদের সাংসারিক অশান্তি উস্কে দেয়া যাচ্ছে ভালভাবেই। ওরা রুটিন মাফিক এখনও ঝুল-বারান্দায় বসে বটে কিন্তু দু'জনের মধ্যে কোনই কথা হয় না। হুইটলি খবরের কাগজ পড়তে থাকে। মাঝে মাঝে হাতের কাপে চুমুক দিয়ে চা বা কফি পান করে। আর মারিয়া নিজেকে ডুবিয়ে রাখে বইয়ের মাঝে।

একদিন, বেশ উত্তেজনাকর একটি ঘটনার সূত্রপাত হলো। অন্তত জেনিফারের কাছে ঘটনাটা উত্তেজনা বয়ে আনল। ওই দিন সন্ধ্যার পরে, মিসেস হুইটলির বাড়িতে নতুন এক লোকের আগমন ঘটলো। মারিয়ার মুখোমুখি ড্রইংরুমের সোফায় বসল লোকটি। দু'জনের মাঝে দূরত্ব যদিও খানিকটা ছিল, কিন্তু জেনিফার স্পষ্ট বুঝতে পারছিল লোকটি মারিয়াকে গদগদ কণ্ঠে কি যেন বলে ভজাতে চেষ্টা করছে। সম্ভবত তার গুণ কীর্তন করছে। মারিয়াও বেশ মজা পাচ্ছে, উপভোগ করছে অতিথির সান্নিধ্য। হুইটলির উপস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে না ধারে কাছে কোথাও। তারমানে এখনও সে ফেরেনি অফিস থেকে। তারপর থেকে প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যার পরে লোকটি নিয়মিত হাজিরা দিতে থাকল ওই বাসায়। বেশিরভাগ সময় ওদের মাঝে কোন কথা হয় না, শুধু চোখে চোখে চেয়ে থাকা। জেনিফার লক্ষ করেছে হুইটলিদের বাসায় কাজের লোকের বালাই নেই। মারিয়া একাই সব কাজ করে। অবশ্য এতে মেয়েটার সুবিধেও হয়েছে। পরকীয়া (শব্দটির সাথে জেনিফার পরিচিত) চালিয়ে যেতে পারছে স্বচ্ছন্দে।

একদিন লোকটা চলে যাবার জন্যে উঠেছে, মারিয়া তাকে 'খোদা হাফেজ' জাতীয় কিছু বলল। জেনিফার চাপা উল্লাস নিয়ে দেখল লোকটা মারিয়ার হাত চেপে ধরেছে এবং ওকে চুমু খাবার জন্যে মুখ নামাচ্ছে। মারিয়া সামান্য ধস্তাধস্তি করল নিজেকে ছাড়াতে। কিন্তু জেনিফার হলফ করে বলতে পারে তার মধ্যে শক্তি প্রয়োগের কোন ব্যাপার ছিল না। বরং লোকটিকে আরও উস্কে দেয়া হলো। দু'জনের মুখ অনেকক্ষণ এক হয়ে থাকল। যখন মারিয়া নিজেকে ছাড়িয়ে নিল তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছে সে।

ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে উঠল জেনিফারও। তার ভেবে অবাক লাগল মারিয়ার সাহস দেখে। মারিয়া কি জানে না ওদের বাসা থেকে মোনা টাওয়ারের সব কিছু পরিষ্কার দেখা যায়। হয়তো মারিয়ার কল্পনাতেও আসেনি একজন পিপিংটম তাদের সমস্ত নিষিদ্ধ কার্যকলাপ দেখে ফেলেছে। অবশ্য জেনিফার খুব সাবধানে কাজটা

করছে। তাদের ঘরের সমস্ত পর্দা ফেলা থাকে। যখন পিপ-শো দেখার জন্যে বিনিকিউলারটা হাতে নেয় জেনিফার, ঘরের আলো নিভিয়ে দিতে ভুল করে না কখনোই। কাজেই বিপরীত ফ্ল্যাট থেকে বোঝার উপায় নেই এখানে একজন পিপিংটম আছে।

মারিয়া যে পরকীয়ায় মেতে উঠেছে সে ব্যাপারে জেনিফারের মনে কোন সন্দেহ নেই। দু'জনের সম্পর্ক যত গাঢ় হচ্ছে, জেনিফারের আগুনে আরও ঘি ঢালার সময় হয়েছে।

জেনিফার পরদিন সকালে ড্যানিস হুইটলিকে দ্বিতীয় চিঠিটি লিখল: প্রিয় মি. হুইটলি, আপনি কি জানেন প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যার পরে আপনার ঘরে একজন পুরুষ অতিথির আগমন ঘটে এবং আপনার স্ত্রী তার সাথে পরকীয়ায় মেতে ওঠেন ? আমার কথা বিশ্বাস না করলে কোন এক মঙ্গলবার তাড়াতাড়ি এসে ওদের দু'জনকে হাতে নাতে ধরে ফেলেন না কেন ?'

এখন শুধু পরবর্তী মঙ্গলবারের প্রতীক্ষা। জেনিফার জানে না শুধু মঙ্গলবারই কেন লোকটি মারিয়ার কাছে আসে। অবশ্য কারণ উদঘাটনের তেমন চেষ্টা করেনি। এখন তার সামনে একটাই কাজ- মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর বাবা-মা যাতে বাড়িতে না থাকেন তার ব্যবস্থা করা।

জেনিফার তার পলি খালাকে ফোন করল। বানিয়ে বলল মা নাকি প্রায়ই পলি খালার কথা বলে। দূর সম্পর্কের বোন বলেই নাকি পলি খালা মা'র খোঁজ খবর নিচ্ছেন না। এজন্যে মা বেশ কষ্টে আছেন। শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন পলি খালা। বললেন, 'সেকি! আমিই তো এতদিন ভেবেছি তোর মা আমাদের ভুলে গেছে।'

জেনিফার বলল, 'তুমি তাহলে বাবা-মাকে একদিন দাওয়াত দাও। তোমাদের মাঝে সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির অবসান হোক।'

খুশি হলেন পলি খালা। বললেন, 'ঠিক বলেছিস, কেন যে লোকে তোকে বোকা বলে!'

হাসি চেপে জেনিফার বলল, 'শোনো, আগামী মঙ্গলবার বাবা'র অফিস ছুটি। ওইদিন তুমি ওদেরকে ডিনারের দাওয়াত দাও।'

'তুই সাথে আসছিস তো ?' জানতে চাইলেন পলি খালা।

'না-না। আমাকে যেতে বোলো না। আমার কোথাও যেতে ভাল লাগে না। একা থাকতেই ভাল লাগে।'

ব্যস, মঙ্গলবার রাতের পিপ-শো দেখার নির্বিঘ্ন আয়োজন হয়ে গেল। মা পলি খালার আকস্মিক দাওয়াত পেয়ে অবাক হলেন। তবে যেতে অরাজী হলেন না। ওরা রাত আটটার দিকে চলে গেলেন খালার বাসায়। তবে কিছুক্ষণ পরেই সেই লোকটি এলো মারিয়ার বাসায়। পোনে ন'টার দিকে ওরা হাতে হাত রাখল, ন'টার সময় মারিয়া বাহুলগ্ন হয়ে পড়ল তার প্রেমিকের। ঠিক তখন ড্রইংরুমের দরজা প্রচন্ড ধাক্কায় খুলে গেল, ভেতরে ঢুকলো ড্যানিস হুইটলি।

প্রচন্ড ঝড় বয়ে গেল ঘরে। হুইটলি এবং লোকটি, জেনিফারের মনে হলো, বুঝি হাতাহাতি শুরু করে দেবে। কিন্তু মারিয়া ঠেকিয়ে রাখল ওদেরকে। রাগে গনগনে মুখ দেখে অবশ্য বোঝা যাচ্ছিল দুই পুরুষই একে অপরকে গালি-গালাজে তুলোধুনো করে ছাড়ছে। শেষে ইটালি তার প্রেমিককে ঠেলতে ঠেলতে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। হুইটলি বোধহয় কিচেন বা অন্য কোথাও ঢুকলো। একটু পরেই ঢাউশ একটা বোতল হাতে তাকে ড্রইংরুমে ফিরে আসতে দেখল জেনিফার। বোতলটা দেখেই বুঝে ফেলল সে ওর মধ্যে কি আছে। বাবাও মাঝে মাঝে অমন সাইজের বোতল থেকে মদ ঢেলে খায়। পরপর দুই গ্লাস মদ খেয়ে ফেলল হুইটলি। অপেক্ষা করছে মারিয়ার জন্যে। মারিয়া ঘরে ঢুকতেই আবার ফেটে পড়ল হুইটলি। ভয়ানক ঝগড়া শুরু হলো দু'জনের। হুইটলির এমন রুদ্রমূর্তি আগে দেখেনি জেনিফার। সে মারিয়ার মুখে প্রচন্ড জোরে এক চড় বসাল। মারিয়া প্রত্যুত্তরে কি যেন বলতেই উন্মাদ হয়ে গেল হুইটলি। গলা টিপে ধরল সে মারিয়ার, ঝাঁকাতে শুরু করল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে প্রাণপণ চেষ্টা করল মারিয়া, লাথি মারতে লাগল। শেষে কোনমতে নিজেকে মুক্ত করে দৌড় দিল দরজার দিকে, পিছু ধাওয়া করল হুইটলি। মারিয়া হাতের কাছের বড়সড় টেবিল ল্যাম্পটা তুলে ধরল মাথার ওপর। হুইটলি ওকে থামাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সোফায় পা বেঁধে। তাকে ব্যাঙের মতো হাত-পা ছড়িয়ে পড়তে দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল জেনিফার। শুয়ে শুয়েই মারিয়ার পেটে লাথি মারল হুইটলি। ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠল মারিয়ার চেহারা। রাগে আর শারীরিক যন্ত্রণায় নিজের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল সে। চিৎকার করে ভারি টেবিল ল্যাম্পটা বিদ্যুৎবেগে নামিয়ে আনল স্বামীর মাথার ওপর।

উত্তেজনা আর আনন্দে এবার জোরে হেসে উঠল জেনিফার। চোখ চকচক করছে।

স্বামীর মাথায় টেবিল ল্যাম্প ভাঙার পর হাঁটু মুড়ে পাশে বসল মারিয়া। কিছুক্ষণ ফোঁপাল। হুইটলির নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে দেখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল মুখে। বুকে মাথা লাগিয়ে কি যেন শোনার চেষ্টা করল। তারপর ছুটে গেল টেলিফোনের দিকে।

বাহ্, চমৎকার একটা দৃশ্য দেখা গেল বটে। এখন কি? জেনিফার কব্জিতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকালো। সর্বনাশ-ঘুমাতে যাবার সময় হয়েছে। বাবা-মা এসে পড়বেন এখুনি। এখানে আর বসে থাকার মানে হয় না। কাল সকালে তো সব জানাই যাবে।

খবরটা বাতাসের গতিতে ছড়িয়ে পড়ল সবখানে। ম্যানহাটন এলাকায় খবর রটল ব্যাংক কর্মকর্তা মি. ড্যানিস হুইটলি মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু কাজ হয়নি কোন। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা গেছেন তিনি।

মারা গেছে! হুইটলি মারা গেছে! মৃত্যু হয়েছে সুদর্শন লোকটার!

উত্তেজনায় বুক ধড়ফড় শুরু হলো জেনিফারের। তার পরিকল্পনা এমন খাপে খাপ মিলে যাবে ভাবতে পারেনি সে। বেশ বেশ! এখন তাহলে মারিয়ার পালা। ধনী আর সুন্দরী হবার খেসারত এবার তাকে দিতে হবে।

জেনিফার থানায় ফোন করল। ওধার থেকে জবাব আসতে সে বলল, 'আমি একটা হত্যাকান্ডের ব্যাপারে রিপোর্ট করতে চাই। আমার নাম জেনিফার প্যাকমান, ঠিকানা- আট বাই এইচ, ডেফোডিল প্লাজা, ম্যানহাটন, আমি ওখান থেকেই ফোন করছি।' জেনিফারের রক্ত চলাচল বেড়ে গেছে, নিজেকে এতো সুখী আর মনে হয়নি কখনও।

'হত্যাকান্ড ?'

'জ্বী।',

'আচ্ছা, ধরুন একটু।'

'ধন্যবাদ।'

এক সেকেন্ড পর আরেকটি কণ্ঠ শোনা গেল ফোনে, 'ইন্সপেক্টর রথম্যান' ভরাট গলা পুরুষটির।

'আমি জেনিফার প্যাকমান, আট বাই এইচ ডেফোডিল প্লাজা, ম্যানহাটনে থাকি', দ্রুত বলল জেনিফার। ওর শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত এবং ঘন হয়ে উঠেছে। বেশি উত্তেজনা হলে এমন হয়। 'গত রাতে ছয় বাই বি, মোনা টাওয়ার, ম্যানহাটনের বাসিন্দা মি. ড্যানিস হুইটলি এবং মিসেস মারিয়া শ্রিভারের মধ্যে প্রবল ঝগড়া হতে দেখি আমি। তিনি হুইটলি সাহেবকে ভারি একটি টেবিল ল্যাম্প দিয়ে মাথায় আঘাত করেন। কাজটা স্পষ্ট তাকে আমি করতে দেখেছি। আমার বেডরুমের জানালা থেকে ওদের ড্রইংরুম, বেডরুম সব দেখা যায়। তাছাড়া কাল রাতে ওদের দরজা এবং জানালার সবগুলো পর্দাই ওঠানো ছিল। কাজেই যা ঘটেছে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি আমি। হুইটলি সাহেবকে পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, শুনেছি আমি, ভেবেছিলাম তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। তাই পুলিশে খবর দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করিনি। কিন্তু এখন শুনছি তিনি মারা গেছেন। তাই আসল ঘটনাটা আপনাদেরকে জানালাম নাগরিক কর্তব্য বোধ থেকে।'

'আচ্ছা', উদ্বিগ্ন শোনাল ইন্সপেক্টরের কণ্ঠ। 'আপনি এখানে এসে রিপোর্ট দিতে পারবেন, মিস জেনিফার ?'

'দুঃখিত, তা সম্ভব নয়', দুঃখি দুঃখি ভাব ফোটাল জেনিফার গলায়। 'বাবা-মা আমাকে কোথাও যেতে দেন না। বিশেষ করে থানার মতো জায়গায় তো কোনদিনই যেতে দিবেন না।'

'ঠিক আছে। আমিই তাহলে আপনাদের ওখানে যাচ্ছি। ধন্যবাদ, মিস জেনিফার।'

'ধন্যবাদ, মি. রথম্যান।'

জেনিফার রিসিভার রেখে দিল। রান্নাঘরে গিয়ে ফ্রিজ খুলে ডেসার্টের একটা বাটি বের করল। ওর যে স্বাস্থ্য, জানে জেনিফার, মিষ্টি খাওয়া উচিত নয়। কিন্তু একটা দিন মিষ্টি খেলেই তো আর সে আরও হস্তিনী হয়ে উঠবে না। তাছাড়া এমন মজা আর রোমাঞ্চ কি প্রতিদিন মেলে ? দিনটাকে মিষ্টি খেয়ে সেলিব্রেট করা উচিত।

লিভিংরুমে এসে বসল জেনিফার বাটি নিয়ে। সুস্বাদু মিষ্টিগুলো গিলতে লাগল টপাটপ। গোটা ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে সে। লোকে ওকে বোকা ভাবে! আবার হাসি পেল জেনিফারের। যেটাকে ও মজা আর খেলা মনে করে লোকের কাছে সেটাই অশ্লীল আর অপরাধ মনে হয়। তাতে কিছু যায় আসে না জেনিফারের। এবারের খেলাটাতে রোমাঞ্চ ছিল দারুণ। যারা ওকে পছন্দ করে না, ভালবাসে না, কুৎসিত বলে ঘৃণা করে তাদের সবাইকে নিয়ে এমন খেলা খেলবে জেনিফার। ওর ভাইয়ার ওপর শোধ নেবে। দেখে নেবে ভাইয়ার প্রেমিকাটাকেও। রূপের গরবে মাটিতে পা পড়ে না, না ? দাঁড়াও, এবার মজা দেখাব। মজা দেখাবে সে চার তলার মিসেস হিলারীকেও। মহিলার সাথে সেধে যতবার কথা বলতে গেছে জেনিফার, মিসেস হিলারী ততবার এড়িয়ে গেছেন তাকে। জেনিফার দেখে নেবে নিচের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ছোকরা কর্মচারী টনিকেও। হারামজাদাটা জেনিফারকে দেখলেই কেমন বিশ্রি মুখভঙ্গী করে। নিজের বাবা-মা'র ওপরও শোধ নেবে জেনিফার। তাকে একা গৃহবন্দী করে রেখে যাবার মজা টের পাইয়ে দেবে। প্রত্যেককে তার পাওনা বুঝিয়ে দেবার ভবিষ্যৎ সুখ কল্পনায় বিভোর হয় জেনিফার, রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে শরীর।

জেনিফারের সুখ কল্পনায় ব্যাঘাত ঘটাল কলিংবেলের শব্দ। এ সময়ে আবার কে এলো ? মিষ্টির বাটিটা টেবিলে রেখে গায়ের কাপড় ঠিকঠাক করল সে। তারপর দরজা খুলল।

'মিস জেনিফার?' দরজায় দাঁড়ানো দীর্ঘদেহী আগন্তুক ভরাট গলায় জানতে চাইল; পরনে মেট্রোপলিটান পুলিশের পোশাক।

'জ্বী', বলল জেনিফার। তার চোখ আটকে গেল আগন্তুকের পেছনে দাঁড়ানো মহিলার দিকে। মারিয়া। মারিয়ার হাতে দু'টুকরো কাগজ। দেখেই চিনতে পারল জেনিফার। তার লেখা সেই চিঠি দুটো!

ট্রাপড!
এইচ ভারনর ডিক্সন

জন অফিস থেকে বেরুচ্ছে, এই সময় টেবিলের ওপর কাগজটা চোখে পড়ল। 'সিলভারওয়্যার। ক্রেনের ওয়্যার হাউজ' এলেনের হাতের লেখা। জন যখন বাইরে ছিল তখন নিশ্চয়ই এলেন অফিসে এসেছিল, লিখে রেখে গেছে দুর্বোধ্য মেসেজটা। মনে মনে হাসলো সে তার স্ত্রীর কান্ড দেখে। এলেনের ধারণা, যত সংক্ষিপ্ত মেসেজই সে রেখে যাক না কেন জন তা অবশ্যই বুঝতে পারবে।

সিলভারওয়্যারের বাড়িটি জনের এক বৃদ্ধা খালা ওকে দান করে গেছেন। বাড়ির কিছু কিছু জিনিস জনের কাছে অমূল্য মনে হলেও এলেনের কাছে ওগুলো কোনও গুরুত্বই বহন করে না। তার মতে এসব পুরানো মাল যত তাড়াতাড়ি বিক্রি করে ঝামেলামুক্ত হওয়া যায় ততই ভাল।

ক্রেনের ওয়্যারহাউজের স্টোরেজ ভল্টে এলেন গিয়েছিল কিনা, নাকি মালগুলো বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছে, অথবা তাকে ওগুলোর ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে কিছুই বুঝতে পারল না জন চিরকুটটা পড়ে।

স্টোরেজ ভল্টের মাল খালাস করার চেয়েও বহুগুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে ওর হাতে। তিন মিলিয়ন ডলারের পয়ঃনিষ্কাশনের যে কন্ট্রাক্টটার আশায় এতদিন ছিল জন-সিটি কমিশনার আজ সকালে জানিয়েছেন ওটা সে পেয়ে গেছে। শহরে প্রতিটি আর্কিটেক্ট এবং কন্ট্রাক্টারের লোভ ছিল এই কাজটার ওপর। শেষ পর্যন্ত শিকে ছিঁড়েছে জনের ভাগ্যে। এলেনের বাপ ওকে ঠিকাদারীর কাজ শিখিয়েছেন। তিনি ছিলেন শহরের সবচে' মানী লোক। হঠাৎ করে তিনি মারা গেলে ব্যবসার পুরো দায়িত্ব এসে পড়ে জনের ওপরে। তাঁর ধারণা ছিল মৃত্যুর পরেও ব্যবসা গতানুগতিকভাবে চলবে। কিন্তু জন অন্য স্টাইলে কাজ শুরু করে। তার পরিকল্পনা যে সঠিক ছিল তার সবচে' বড় প্রমাণ বর্তমান কাজটা বাগিয়ে নেয়া। খবরটা শুনে এলেন কী রকম খুশি হয়ে উঠবে ভাবতে ভাল লাগল জনের।

জন বাইরে বেরিয়ে দেখল সন্ধ্যা নেমে গেছে। পার্কিং লনের দিকে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলল সে। উনচল্লিশ বছরের লম্বা, সুঠামদেহী জনের বাদামি চুলের দু'একটা কেশ মাত্র রূপালি রঙ ধারণ করতে শুরু করেছে, তবে ওর চোখের দৃষ্টি এই বয়সেও তীক্ষ্ণ এবং উজ্জ্বল। সপ্তাহে দুইবার অ্যাথলেটিক ক্লাবে যাতায়াত করে সে দেহটাকে সম্পূর্ণ সুস্থ রেখেছে। সে বিশ্বাস করে সুঠাম নিরোগ শরীর ছাড়া বেঁচে থাকার কোনও মানে নেই।

গাড়িতে উঠল জন। স্টার্ট দিল। অভ্যাস বশে বাড়ির দিকে যাত্রা শুরু করেছিল, কিন্তু ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়ে মন পরিবর্তন করে ফেলল। ওর ছেলে জিমির স্কুলে

আজ ফুটবল প্র্যাকটিস আছে। তার মানে জিমির আজ ফিরতে দেরি হবে। অর্থাৎ রাতের খাবার খেতেও দেরি হবে। সুতরাং সময় যখন হাতে আছে তখন স্ক্রেনের ওয়্যার হাউজে একবার ঢুঁ মেরে আসা যাক, ভাবল জন। দেখা যাবে এলেন জিনিসপত্রগুলোর কোনও ব্যবস্থা করেছে কিনা।

ক্রেন শহরের সবচে' বড় বাড়ি। ওটার বিশাল ওয়্যার হাউজ ইট, সিমেন্ট এবং কাঠ দিয়ে তৈরি, রাস্তার ধারে এক কোণায় পাহাড়ের মতো শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। জন বাড়িটার সামনে পৌঁছে দেখল জানালাগুলো সব বন্ধ। অন্ধকার। ওয়্যার হাউজের কোণা ঘুরে অফিস ঘরের দিকে গিয়ে দেখল ওটাও অন্ধকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে ভিজছে। কোথাও কারও সাড়াশব্দ না পেয়ে জন চলে যাচ্ছে, এমন সময় একটা লোককে দেখল সে। পা টেনে টেনে হাঁটছে লোকটা, রাস্তা পেরিয়ে ওয়্যার হাউজের সামনে চলে এল। একটা দরজা খুলল। জন দ্রুত গাড়ি পার্ক করে নেমে পড়ল। এগোল লোকটার দিকে। বুড়োকে চেনা চেনা লাগছে। নৈশপ্রহরী স্যাম মোরান হতে পারে। লোকটা আগে জনের অধীনে কাজ করত। কিন্তু কাজের সময় মদ্যপানের কারণে জন তাকে বরখাস্ত করলেও বুড়োকে মনে মনে আসলে সে এখনও পছন্দ করে।

লোকটা স্যাম মোরানই বটে। এখানে আসার কারণ ব্যাখ্যা করল জন স্যামের কাছে। বুড়ো জানাল ওয়্যার হাউজের জিনিসপত্র কেনার জন্য লোকজন তাকে প্রায়ই ফোন করে। আজকেও তার অফিসে লোক এসেছিল এই উদ্দেশ্যে।

জন স্যামের পিছু পিছু ঢুকলো ওয়্যার হাউজের ভেতরে। অন্ধকার করিডর ধরে এগোতে লাগল। করিডরটি মূল বিল্ডিংটিকে দ্বিখণ্ডিত করে রেখেছে। ভারি একটি দরজা পেরিয়ে ছোট একটি রুমে ঢুকলো ওরা। ঘরটিতে কাগজের বড় গীট, পত্রিকা, ভাঙাচোরা খানকয়েক চেয়ার, গোল একটা ডেস্ক আর আর্মিদের কম্বল দিয়ে ঢাকা একখানা ক্যাম্পকট চোখে পড়ল জনের। ঘরটি বেশ গরম। কেরোসিন স্টোভ জ্বলছে। ধোঁয়ার গন্ধ পেল জন।

মোরান তার ভারি কোটটা খুলে স্টোভের পাশে একটি হুকের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখল। বিপজ্জনক, ভাবলো জন, যে কোন মুহূর্তে ওটার গায়ে লাফিয়ে উঠতে পারে আগুন। সজোরে ড্রয়ার খোলার শব্দে চমকে মোরানের দিকে ফিরল সে। মোরান কয়েকটি কাগজপত্র বের করল ড্রয়ার খুলে। একটি কাগজের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকল, তারপর বলে উঠল, 'এইরে, উনি তো আজ এখানে এসেছিলেন। জিনিসপত্র কিছু নেননি। কিন্তু প্রত্যেকটার দাম ধরে চল্লিশ হাজার ডলারের বীমা করেছেন।'

জনের ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। এলেন এরকমই। সবকিছু গোছগাছ করে রাখা তার বিশেষ একটি গুণ। আসলে ওদের মধ্যে পরস্পরকে বোঝাবুঝির ব্যাপারটা এতো ভাল যে এলেনের ধারণা আকারে ইঙ্গিতে কথা বললেও জন সব বুঝতে পারবে। তাই সে ওরকম একটি চিরকুট লিখে রেখে এসেছে জনের অফিসে।

মোরান আড়চোখে তাকালো জনের দিকে, 'যা গেছে তা নিয়ে আর নতুন করে কিছু বলার নেই তাই না, মিঃ জন ?'

'মানে কি বলতে চাইছ ?'

'আপনিই কিন্তু মাঝে মধ্যে আমাকে মদ খাওয়ার জন্য টাকা দিতেন।'

'আচ্ছা।' হাসলো জন। 'তা অবশ্য দিতাম। কিন্তু কাজের মধ্যে মদ্যপানের ব্যাপারটা আমি পছন্দ করিনা, তুমি জানো! এছাড়া যে কোনও সময়ই তুমি মদ খেতে পার, আমি কিছু মনে করব না।'

'সে আপনার দয়া। এখন তাহলে হয়ে যাক এক রাউন্ড, কী বলেন ? নিচতলায় আমি একটা হুইস্কির বোতল লুকিয়ে রেখেছি। চলুন, ওটা মেরে দেয়া যাক।'

'ঠিক আছে', বলল জন। 'তুমি যখন ছাড়ছই না তাহলে চল যাই।'

সিঁড়ি বেয়ে মোরানের পিছু পিছু নামতে লাগল জন। নিচতলার দেয়া কংক্রিটের ড্যাম্প পড়ে গেছে। সাবমেরিনের দরজার মতো ছোট, ইস্পাতের একটি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো মোরান। আলো জ্বাললো। বন্ধ করল দরজা।

জন কৌতূহলী দৃষ্টিতে ছোট রুমটার চারদিকে চোখ বুলালো। আট ফুট উঁচু, বিশ ফুট চওড়া চারকোণা রুমটার দেয়াল, মেঝে এবং ছাদ নিরেট পাথরে তৈরি। রুমের এক কোণায় কয়েকটি স্টিলের ফাইলিং কেবিনেট, আর মধ্যখানে দুটো চেয়ার এবং একটা পুরনো কিচেন টেবিল চোখে পড়ল জনের। দুদিকের দেয়ালে গেঁথে আছে ছেঁড়া পাইপ, ভাঙা গজ, জংধরা ঘড়ি, বাল্ব, হ্যান্ডেল ইত্যাদি। সারা ঘরে একটাই মাত্র দরজা সেটা দিয়ে ওরা ঢুকেছে। ছাদে ঝোলান ব্যাটারি আকৃতির লণ্ঠন থেকে আলো আসছে। ওটা ছাড়া আলো বাতাস ঢোকার আর কোনও উৎস চোখে পড়ল না জনের।

ছেঁড়া একটা পাইপ সরিয়ে দেয়ালের ফোঁকড় থেকে দুটো গ্লাস আর এক বোতল মদ বের করল মোরান। টেবিলের ওপর ওগুলো রাখল। জনকে চারিদিকে চাইতে দেখে বলল, 'এই রুমটা বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। আগুন জ্বালাবার কন্ট্রোল রুম, ব্যাংক ভল্ট আর পানির ট্যাংকি হিসেবেও। এখন অবশ্য আর এটা ব্যবহৃত হয় না।'

গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে একটা পাত্র টেবিলের ওপর দিয়ে জনের দিকে ঠেলে দিল মোরান। হুইস্কিতে চুমুক দিয়েই চাঙা হয়ে উঠল সে। বকবক শুরু করল অতীত দিন নিয়ে।

জন চলে যাওয়ার তাড়া অনুভব করল। কেমন জানি ভয় ভয় লাগছে। কিন্তু স্থির হয়ে বসে থাকল সে, শুনতে লাগল মোরানের বকবকানি। মনের ভেতরটা খচখচ করলেও একসময় অনুভব করল বুড়োর গল্প শুনতে ভালই লাগছে তার। স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবার নিজেই সে যোগ দিল গল্পে, স্মৃতিচারণ করতে লাগল একসঙ্গে। আরেক গ্লাস মদ খেল ওরা, আরও কিছুক্ষণ কথা বলল, তারপর জন উঠে দাঁড়াল চলে যাওয়ার জন্য।

মোরান বোতল এবং গ্লাস দুটো আবার পাইপের পেছনে যথাস্থানে রেখে দিল। জনের কাঁধে চাপড় মেরে এগিয়ে গেল বন্ধ দরজার দিকে। হাতলে হাত দিতেই বুড়োর চোখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। ভ্রু কুঁচকে এক সেকেন্ডের জন্য হাতলটার দিকে

তাকালো সে, তারপর হাতটা রাখল দরজার গায়ে। কুঁচকে উঠল ঝোপের মতো ভ্রু জোড়া।

জন এগিয়ে এসে হাত রাখল দরজায়। 'দরজাটা গরম ঠেকছে বলে মনে হচ্ছে।'

'হুম্।'

পরস্পরের দিকে ওরা দ্রুত একবার তাকালো, পরক্ষণে সরিয়ে নিল চোখ। আশঙ্কা ফুটে উঠেছে চোখের তারায়। হঠাৎ নিজেকে খুব দুর্বল মনে হল জনের, কিন্তু বুড়োকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে দৃঢ় মুঠোয় চেপে ধরল ইস্পাতের হাতল, টান মারল জোরে। নির্জন ভল্টের নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল কান ফাটানো শব্দে, যেন প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটেছে। ভয়ংকর উত্তাপ ঝলসে দিল ওদেরকে।

করিডরের শেষ মাথার সিঁড়িটা দেখা যাচ্ছে না, দাউ দাউ আগুন জ্বলছে ওখানে। পুরো করিডরটাকেই জনের মনে হল আগুনের একটা সমুদ্র, সাপের জিভের মতো লকলক করছে শিখা, লাল টকটকে কয়লা লাফিয়ে উঠছে, ছাদ থেকে ভেঙেচুরে পড়ছে জ্বলন্ত কড়িকাঠ। জন লাফিয়ে সরে গেল পেছন দিকে, দড়াম করে বন্ধ করল দরজা, পরক্ষণে কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এলো ভেতরে।

একমুহূর্তের জন্য জনের মনে হল অজ্ঞান হয়ে যাবে সে। পাথরের দেয়ালে অসহায়ের মতো হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে, তাকালো মোরানের দিকে। বুড়ো লোকটা শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বন্ধ দরজার দিকে। ফিসফিস করে বলল জন, 'ঐ কেরোসিনের স্টোভটাই এজন্য দায়ী।'

মাথা ঝাঁকাল মোরান, ফিরলো জনের দিকে, আর্তনাদের সুর বেরুল গলা চিরে, 'পুরো ওয়্যার হাউজেই আগুন ধরে গেছে। আমরা ফাঁদে পড়েছি, মিঃ জন!'

জন চোখ বুজলো। মনে করার চেষ্টা করল বুড়োর অফিস ঘরের অবস্থান। আগুন নিশ্চয়ই ওখানে প্রথম ধরেছে, তারপর নিচতলা গ্রাস করে অন্যান্য ফ্লোরে ছোবল দিতে শুরু করেছে। চতুর্ভূজ আকৃতির আটতলা এই বিল্ডিং-এর প্রতিটি ফ্লোরই আসবাবপত্র এবং অন্যান্য সহজদাহ্য পদার্থে বোঝাই। কোনও কোনও ঘর পাথর এবং ইস্পাতে তৈরি হলেও বিল্ডিং-এর মূল কাঠামো সম্পূর্ণ কাঠের। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। রাস্তার পাশে দমকল বাহিনী নিশ্চয়ই এর মধ্যে এসে হাজির হয়েছে কিন্তু জন জানে এই বাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে ভেঙে না পড়া পর্যন্ত এ আগুন নেভানোর ক্ষমতা কারও নেই। পুরো বাড়িটাই ভেঙে আমাদের ওপর পড়বে, আতঙ্কিত হয়ে ভাবলো জন। টের পেল পাথরের দেয়াল ক্রমশঃ উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে। সরে দাঁড়াল ও, স্টিলের দরজায় হাত রেখেই তড়িৎগতিতে হাতটা সরালো। ভয়ানক ছ্যাকা খেয়েছে জন। আগুনের মতো গরম হয়ে উঠেছে দরজাটা। ঘরের চারদিকে উম্মাদের মতো তাকাতে লাগল সে, বেরোবার পথ খুঁজছে। লণ্ঠনটার দিকে দৃষ্টি আটকে গেল জনের। বাল্বের সঙ্গে ওটা দুলছে। পাথুরে সিলিং এর কড়িবর্গায় ইতোমধ্যে ফাটল ধরেছে। ওটা কতখানি পুরু জানা নেই ওর। জানেনা কতক্ষণ ভার সহ্য করতে পারবে।

পাহারাদার বুড়ো জনের চোখ অনুসরণ করে সিলিং-এর দিকে তাকালো। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'সিলিংটা সলিড। পুরোটাই পাথর আর ইস্পাতে তৈরি। সম্ভবতঃ চারফুটের মতো পুরু। ওটা ভাঙা যাবে বলে মনে হয় না।'

'আর দেয়ালগুলো ?'

'একই রকম পুরু।'

গা গুলিয়ে উঠল জনের, মনে হল শরীরের সমস্ত শক্তি এক ফুয়ে উড়িয়ে দিয়েছে কে যেন। চার দেয়ালের মধ্যে আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করল জন, ভাঙা পাইপগুলো পরীক্ষা করে দেখল। দেয়াল ভেদ করার কোনও আলামত খুঁজে পেলনা। সম্ভবতঃ পাথর দিয়ে পাইপগুলোকে দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে দেয়া হয়েছে। এই নিশ্ছিদ্র দেয়ালের বাধা পেরিয়ে আগুন কিংবা ধোঁয়া ঢুকতে পারবে না ভেতরে। কিন্তু, অবাক হয়ে ভাবলো জন, বাতাস ঢুকছে কোন পথ দিয়ে? ছাদে কিংবা দেয়ালের কোথাও ভেন্টিলেটার তো চোখে পড়ছে না।

ঘরটা সার্চ করতে শুরু করল জন। টেবিলটার নিচে, মেঝেতে বড় একটা ম্যানহোল আবিষ্কার করল ও। হাঁটু গেড়ে বসে ম্যানহোলের লোহার ঢাকনির ফুটোয় নাক ঢোকাল। ঠাণ্ডা, বাসি হাওয়া ধাক্কা মারল নাকে। ম্যানহোলটা নিশ্চই কোনও পরিত্যক্ত পাইপের সঙ্গে যুক্ত। যার কারণে বাইরের মুক্ত বাতাস চলাচল করতে পারছে ওটা দিয়ে। নয়তো আগুনের তাপ বেরুত ঢাকনার ফুটো দিয়ে। বাঁচা গেল, ভাবলো জন, নইলে এতক্ষণে দম বন্ধ হয়েই মারা যেত ওরা। সোজা হয়ে দাঁড়াল সে।

মোরান হুইস্কির বোতল আর গ্লাস নিয়ে ইতোমধ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ভয় কাটানোর জন্য। গলা খাঁকারি দিল সে, কর্কশ গলায় বলল। 'আমাদের কি কিছুই করার নেই ?'

'আমার মাথায় কিছু আসছে না', বলল জন।

'আমাদের এখান থেকে বেরোবার একটাই মাত্র রাস্তা আছে। কিন্তু ওটা আমরা ব্যবহার করতে পারব না।' মোরানের চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠতে দেখে তাড়াতাড়ি বলল, 'ওরা সম্ভবতঃ দু'একদিনের মধ্যে আমাদের এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবে।'

'যদি কেউ খুঁজতে আসে।'

চিৎকার করে উঠল মোরান, 'যেভাবেই হোক, আমাদের এখান থেকে বেরুতেই হবে।'

জন কিছু বলল না। টেবিলের ওপর হাত রেখেছিল ও। লক্ষ্য করল হাত দুটো কাঁপছে। মুঠো করল হাত। এখন দিশেহারা হলে চলবে না, মাথা ঠিক রাখতে হবে, এভাবে অসহায়ের মতো আমি মরতে রাজি নই, মনে মনে বলল জন।

ঘরের বাতাস ভয়ানক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ওদের হাত আর মুখ ভিজে উঠেছে ঘামে। মোরান অস্বস্তিতে ছটফট করে উঠল, বোতলটা এগিয়ে দিল জনের দিকে। মাথা নাড়ল জন। বুড়ো পুরো বোতলটা শেষ করল ঢকঢক করে। পাগলের মতো মাথা নাড়ছে।

তাপ ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে। জন ওর কোট আর বেল্ট খুলে ফেলল। কিছুক্ষণ পর টাই আর জুতোও খুললো। দরদর করে শরীর বেয়ে ঘাম পড়ছে। বাইরের তান্ডব দেখতে না পেলেও জন বুঝতে পারল নরক ভেঙে পড়েছে ওখানে। কল্পনার চোখে দেখল শতফুট ওপরে লাফিয়ে উঠছে আগুন, আগুনের গর্জন, কড়িবর্গা বিস্ফোরিত হওয়ার শব্দ ভয়ঙ্কর করে তুলেছে রাতটিকে। সবগুলো ফ্লোর গ্রাস করেছে আগুনের লেলিহান শিখা। দমকল বাহিনীর লোক বৃথাই চেষ্টা করছে নরকের আগুন থামাতে। যে স্তম্ভের ওপর বাড়িটি খাড়া হয়ে আছে, জন আতঙ্কিত হয়ে ভাবলো, ওটাতেও নিশ্চয়ই এতক্ষণে আগুন ধরে গেছে। এই প্রথমবারের মতো সে যেন উপলব্ধি করতে পারল ওরা দুজন বিরাট এক জ্বলন্ত কড়াইয়ের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়েছে। দেয়াল যদি ধ্বসে নাও পড়ে এই ভয়াবহ উত্তাপেই তারা বেগুন পোড়া হয়ে যাবে। কিন্তু প্রচন্ড তাপে এই পাথরের দেয়াল কতক্ষণ খাড়া হয়ে থাকতে পারবে, সন্দেহ হল জনের। ওটা নিশ্চয়ই একসময় বিস্ফোরিত হবে। কিন্তু তার আগেই সে এবং মোরান পুড়ে রোস্ট হবে।

জন লাফিয়ে উঠল, ফাঁদে পড়া প্রাণীর মতো চার দেয়ালের মাঝখানে ছোটাছুটি শুরু করল। দেয়াল স্পর্শ করার জো নেই। এমনকি ওর হাতঘড়ির ধাতব স্ট্যাম্প পর্যন্ত গরম হতে শুরু করেছে। ঘড়িটা খুলে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলল সে। টেবিলের ওপর উঠে বসল, চোখ পিটপিট করে তাকালো মোরানের দিকে। বুড়োর মাথা ধীরে ধীরে বুকের দিকে নামছে। উত্তাপের চোটে লাল টকটকে হয়ে উঠেছে চামড়া। ওর নিজের চামড়ার অবস্থাও খুব একটা ভাল নয় বুঝতে পারল জন।

মৃত্যুর গন্ধ পেল জন। সাগরের নিচে সাবমেরিনে কেউ আটকা পড়লে তারও যে কোনওভাবে হোক বাঁচার আশা থাকে। কিন্তু এই চার দেয়ালের মৃত্যুকূপ থেকে বাঁচার কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছে না সে। মৃত্যুই এর একমাত্র নিয়তি; উপলব্ধি করে শান্ত হয়ে গেল জন। জোর করে দূর করে দিল চিন্তাটা। ভাবতে লাগল ওর পরিবার নিয়ে। ও মরে গেলেও ইনস্যুরেন্স আর ট্রাস্ট ফান্ড থেকে যে টাকা পাওয়া যাবে তা দিয়ে জিমির লেখাপড়ার খরচ চলে যাবে। আর ব্যবসাটা বিক্রি করেও প্রচুর টাকা পাবে এলেন। সুতরাং ওদের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।

অতীত নিয়ে ভাবছে জন। এলেনের সঙ্গে প্রেম, তারপর বিয়ে, টুকরো টুকরো সব স্মৃতি ভিড় করে মনে। দীর্ঘ ষোলোটা বছর সুখী দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছে ও। এজন্য বেশিরভাগ কৃতিত্বই ওর প্রেমময়ী স্ত্রীর। এলেন ভাগ্যে খুব বিশ্বাস করে। প্রায়ই বলে, 'আমাদের দুজনের নিয়তি একসূত্রে গাঁথা, ডার্লিং। আমাদের জীবনে নিয়তি সবসময়ই বড় একটা ভূমিকা রাখবে, তুমি দেখো।' তারপর সে জিজ্ঞেস করত 'তুমি ভাগ্যে বিশ্বাস কর না ?' জন স্বীকার করত সেও ভাগ্যে বিশ্বাসী।

সেই ঘনিষ্ঠতা, দুটি মন এক হওয়ার গভীর অনুভূতি সমস্ত বস্তুগত চাওয়া পাওয়াকে ছাড়িয়ে যেত। সে বড় সুখের দিন ছিল, বড় আনন্দের সময় ছিল। মৃত্যুর

মুখোমুখি হয়েও জীবন নিয়ে কোনও আফসোস নেই জনের। জীবন তাকে প্রচুর সুখ দিয়েছে।

টেলিফোনের আওয়াজে ভাবনার সুতো ছিঁড়ে গেল। প্রথমে ভাবলো কানে ভুল শুনেছে। দ্বিতীয়বার রিং হতেই কান খাড়া করল ও। ফাইলিং কেবিনেটগুলো থেকে শব্দটা আসছে মনে হলো। তার মানে এই রুমে সত্যি সত্যি ফোন বাজছে।

স্খলিত পায়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জন। ধাক্কা দিল মোরানকে। একদিকে হেলে গেল বুড়োর শরীর, তারপর আস্তে ঢলে পড়ল মেঝের ওপর। তার ফোলা মুখ হাঁ করা, চোখের মনি স্থির, শূন্যের দিকে তাকিয়ে আছে। মারা গেছে স্যাম মোরান।

টলমল পায়ে টেবিলটা ঘুরলো জন ধাক্কা খেল, একটা ফাইলিং কেবিনেটের সঙ্গে, হাতের চামড়ায় ফোস্কা পড়ে গেল সাথে সাথে। কেবিনেটটা ঠেলে একপাশে সরালো সে। পেছনের দেয়ালের তাকে ফোনটাকে দেখতে পেল জন। হা করে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল সে, যেন ওটার অস্তিত্ব বিশ্বাস করতে পারছে না। ফোনটা ক্রাডল থেকে নামাতে গিয়ে হাত পুড়ে গেল জনের। কিন্তু ওটা হাতে ধরেই থাকল সে। কথা বলার শক্তি ফিরে পেতে পুরো এক মিনিট সময় লাগল, তারপর বলল, 'হ্যালো ?'

পুরুষ কণ্ঠটা বিস্ফোরণের মতো বাজলো কানে, 'মাইগড, এখনও ওখানে কেউ আছেন নাকি ?'

জন অনুভূতিহীন গলায় আবার বলল, 'হ্যালো ?'

ওধারের লোকটার গলা উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল, 'হেই, এক মিনিট ধরেন। এ হতেই পারে না। আমি স্রেফ খবর নিতে যাচ্ছিলাম ওখানে কতজন আগুনে দগ্ধ হয়েছে।' এক সেকেন্ড নিরবতা, তারপর কণ্ঠটা আবার বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছেন না। আমি জানি এই ফোন লাইন কিসের সঙ্গে সংযুক্ত। ওয়্যার হাউজের নিচের ভল্ট থেকে আপনি নিশ্চয়ই ফোন ধরেছেন ?'

'ঐ নরকের আগুনের নিচে ?'

'হ্যাঁ। আটকা পড়েছি। আপনি কে বলছেন, ভাই ?'

'ডেভলিন। ক্রেনের ম্যানেজার। মূল অফিস থেকে বলছি। যে ফোনে আমরা কথা বলছি ওটার লাইন ঐ ভল্টের নিচ থেকে সোজা রাস্তায় এসে উঠেছে। এজন্যই এটা এখনও কিছু হয়নি। কিন্তু আমি কল্পনাও করিনি, যাকগে, আপনার পরিচয় কি, স্যার ?'

'জন মিড'

'নিশ্চয়ই সে কন্ট্রাক্টর জন মিড নন।'

'হ্যাঁ, আমি সেই লোকই। আমরা ফাঁদে পড়েছি। পুড়ে রোস্ট হচ্ছি। আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন তো ?'

'আ-হ্যাঁ, একটু ধরুন, স্যার' কিছুক্ষণ ওদিক থেকে কোনও সাড়া এলো না, তারপর ডেভলিন বললেন, আপনি কারো সঙ্গে কথা বলতে চান, মিঃ মিড ? আমি লাইনটা সিটি সুইচ বোর্ডে জোড়া লাগিয়ে দিতে পারি।'

তার মানে ডেভলিনও বুঝে গেছে জনের মুক্তির কোনও আশা নেই। ফাঁকা গলায় ও বলল, 'আমাকে ২৯৩১ এর নাম্বারটা দিন।'

জন চোখ বন্ধ করল। অপেক্ষা করছে। প্রাণপণে চেষ্টা করছে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে। প্রতিটি সেকেন্ড মনে হল একেকটি বছর, তারপর ক্যাজুয়াল টোনের সাড়া পেল ও, বলল, 'হ্যালো, জিমি।'

'ওহ্, বাবা, বাবা। তুমি কোথায়? মা তোমার জন্য এদিকে চিন্তায় অস্থির।'

'আ-আমি এখন ডাউন টাউনে আছি, জিমি। আমার কথা সব শুনতে পাচ্ছিস?'

'তোর মা কোথায় ?'

'মা মিসেস ওভারব্রাইটের ওখানে গেছে। তুমি তো জানো ওদের কী জানি বইয়ের মিটিং আছে। ওসব নিয়ে কথা-'

'আমি জানি', জিমিকে বাধা দিল জন। এলেনের সঙ্গে কথা বলার এখন আর সময় নেই। জিমিকে দিয়ে তাকে খবর দেয়ারও সময় নেই। তাছাড়া জিমির সঙ্গে কথা বলা যা এলেনের সঙ্গেও তাই। জন জিভ্ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল। 'শোন জিমি, আমার হাতে সময় খুব কম।'

'তোমার কিছু লাগবে, বাবা ? ও ভাল কথা আগুনটা কিভাবে লাগল, বলোতো ? খুব সুন্দর দেখাচ্ছে না ?'

জন নিস্প্রভ গলায় বলল, 'ক্রেনের ?'

'অবশ্যই। দেখছ না সারা আকাশ কি রকম আলোকিত হয়ে উঠেছে। আহ্, কি অসাধারণ একটা দৃশ্য। আমি নিচে গিয়ে কাছ থেকে ওটা দেখতে চাই। কিন্তু মা-'

আর্তনাদ বেরুলো জনের গলা চিরে, 'না, জিমি, না। খবরদার, বাড়ি থেকে এক পাও বেরুবি না। তুই আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস তো ?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু-'

'শোন, জিমি। আমি মানে ইয়ে তোর মা এলে বলিস-' চুপ করে গেল জন। কি বলবে ভেবে পাচ্ছেনা।

'কি বলব বাবা ?'

'কিছু না জিমি।'

'তুমি কিন্তু খুব রহস্যময় ব্যবহার করছ, বাবা।'

আর কথা বলতে পারছে না জন। কান্না ঠেলে আসছে বুক থেকে। 'বিদায় জিমি', কোনও মতে বলল ও, 'প-পরে আবার কথা হবে।'

'ঠিক আছে, রাখলাম, বাবা। বিদায়।'

ফোনটা ক্রাডলে রাখতেই হাজার কথা মনে পড়ল জনের; সেগুলো বলা খুব জরুরী ছিল। সে ফাইলিং কেবিনেটের কাছ থেকে টলতে টলতে এগিয়ে এলো মোরানের দিকে, তার পাশে বসল হাঁটু গেড়ে। ঘরটা এখন আক্ষরিক অর্থেই একটা জ্বলন্ত কড়াইয়ে রূপ নিয়েছে। শ্বাস নেবার সময় খচ্ করে বাঁধছে ফুসফুসে। মোরানের

বুকে হাত রাখল জন। প্রাণ স্পন্দনের কোনও চিহ্ন নেই। নিজের হাতের পালস পরীক্ষা করে দেখল। খুব শিগগির মোরানের মতই ওর অবস্থা হতে যাচ্ছে। ওকে চমকে দিয়ে আবার ফোন বেজে উঠল। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল জন, রীতিমত যুদ্ধ করে সোজা হয়ে দাঁড়াল, হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ফোন।

'বলুন ?'

'মিঃ মিড, আমি ডেভলিন', ম্যানেজার হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন, মিঃ মিড ?'

'জ্বী।'

'বাঁচার একটা চান্স হতে পারে। তবে আমরা আপনাকে বাঁচাতে যেতে পারব না। ফায়ার চিফের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। তিনি কোনও আশা দিতে পারেননি। আগুনের তাপ এতো বেশি যে আমরা এই অফিসেও দাঁড়াতে পারছি না। কিন্তু তারপরও একটা চান্স বোধহয় আছে। ভল্টের মাঝখানে একটা ম্যানহোল আছে না ?'

'হ্যাঁ।'

'থ্যাংক গড। ম্যানহোলটার পথ এখনও বন্ধ হয়নি। ম্যানহোলের বিশ ইঞ্চি সাইজের পাইপ ঐ ভল্টের নিচ দিয়ে শুরু হয়ে রাস্তার নিচ থেকে চলে গিয়ে শেষ হয়েছে আমাদের অফিসের পেছন দিকে। ঐ পাইপটা কয়েক বছর আগে পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এখন আর ওটা ব্যবহার করা হয় না। এখন শুনুন, দমকল বাহিনীর লোকরা এদিকের ম্যানহোলের ঢাকনি তুলে ফেলেছে। আপনি যদি ওদিক থেকে নেমে হামাগুড়ি দিয়ে এই পর্যন্ত আসতে পারেন তাহলে আমরা দড়ি ফেলে আপনাকে সহজেই তুলে নিতে পারব। তবে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা ঘটবে কিনা আমরা কেউ জানি না। কারণ পাইপের কোথাও যদি কোনও কারণে জ্যাম হয়ে যায় তাহলেই সর্বনাশ। তবুও চেষ্টা করে দেখুন একবার, আপনি এবং স্যাম মোরান-'

'স্যাম মারা গেছে।'

'তাহলে শুরু করুন, স্যার। হাতে একদম সময় নেই। সময় নষ্ট করবেন না।'

জন ফোন রেখে আবার হাঁটু গেড়ে বসল। হামাগুড়ি দিয়ে চলে এলো রুমের মাঝখানে, সাবধানে হাত রাখল ম্যানহোলের ঢাকনিতে। সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে সরিয়ে ফেলল হাত। প্রচন্ড ছ্যাঁকা খেয়েছে। আগুনের মতো গরম হয়ে আছে ওটা।

এভাবে কাজ হবে না বুঝে একটা চেয়ার টেনে আনলো জন। বাড়ি মেরে ভেঙে ফেলল চেয়ারের একটা ঠ্যাং। ওটা ঢাকনির হাতলের নিচে ঢুকিয়ে চাড় দিতে লাগল। ধীরে ধীরে ঢাকনিটা উঠে আসতে লাগল জয়েন্ট খুলে। শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে প্রচন্ড জোরে এবার চাড়া দিতেই ঢাকনিটা ছিটকে এল। ওটা একপাশে সরিয়ে রেখে নিচের দিকে ঝুঁকলো জন। তাকালো প্রেতের মতো অন্ধকারের দিকে।

নিচে নামার আগে কয়েক মুহূর্ত দ্বিধায় ভুগল জন প্রথমে ওকে মাথা গলিয়ে দিতে হবে ঐ সীমাহীন অন্ধকারে, তারপর শুরু হবে অনিশ্চিত যাত্রা। জানে না আদৌ সে ওই

পাইপলাইন পার হতে পারবে কিনা। যদিও ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে, কিন্তু কে জানে কোথাও পাইপটা কাদামাটি দিয়ে ভরাট হয়ে আছে কিনা।

জিমির কথা মনে পড়ল জনের। পুত্রকে কথা দিয়েছে সে আবার কথা হবে বলে। জিমির জন্য হলেও তাকে বাঁচতে হবে, তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে। এই ভাবনা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে সাহায্য করল জনকে। সিদ্ধান্ত নিল যত বিপদই আসুক এই নরক থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করবে না সে।

হাত দুটো বাড়িয়ে দিল জন পাইপের দিকে, মাথা নিচু করে ভিতরে ঢুকতে শুরু করল। ঠাণ্ডা লোহার স্পর্শ পেল কাঁধে, হাঁটু জোড়া ভাঁজ করে ফেলল, তারপর নিজেকে ছেড়ে দিল শূন্যে। সাত ফুট উচ্চতা থেকে ধপাস করে পাইপের তলায় গিয়ে পড়ল জন। হাতের চামড়া ছিলে গেল খানিকটা।

কালো গর্তটাকে ওর কাছে বিশাল এবং ভয়ংকর মনে হল। আতঙ্কে শিউরে উঠল সে। ইচ্ছে করল চিৎকার দিয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ দলা পাকানো অবস্থায় পড়ে থাকার পর শরীরে কিছুটা শক্তি ফিরে পেল জন। হাত বাড়াল সামনের দিকে, পাইপের কার্ভগুলোর স্পর্শ পেল। কার্ভগুলো ধরে ধরে পেটটা পাইপের সঙ্গে মিশিয়ে নিজেকে টেনে নিয়ে চলল জন।

কিছুদূর এগোবার পর হাতে ঠাণ্ডা মাটির ছোঁয়া লাগল জনের। হাত দিয়ে স্পর্শ করে বুঝল বড় জোর পাঁচ কি ছয় ইঞ্চি এই মাটির ঢেলার ঘনত্ব। ভেজা, পিচ্ছিল মাটির ওপর দিয়ে সাপের মতো শরীর মোচড়াতে মোচড়াতে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোতে শুরু করল জন।

জন জানে ওকে আর শ'দুয়েক গজ পথ যেতে হবে। এক ইঞ্চি, দুই ইঞ্চি করে হিসাব রাখল জন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর খেই হারিয়ে ফেলল হিসাবের। মনে হল যেন বছর ধরে একইভাবে এগোচ্ছে। একসময় টের পেল পাইপের ওপরের কার্ভের কাছে চলে এসেছে। এখানে কাদামাটি আরও ঘন। কিন্তু মাটির ওপর পিঠ দিয়ে কষ্টে সৃষ্টে চলতে লাগল জন।

হঠাৎ ও লোকজনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। পরক্ষণে একটি দড়ি এসে আছড়ে পড়ল গায়ে। রক্তমাখা হাতে দড়িটা টেনে ধরল জন, কোমরে শক্ত করে বাঁধল, তারপর অনুভব করল ওকে কারা যেন টেনে ওপরে তুলছে।

পাইপ থেকে টেনে ওকে ওপরে ওঠান হল, লোকজনের চিৎকার চেঁচামেচি, অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনের শব্দ ইত্যাদি সবই অর্ধসচেতন অবস্থায় টের পেল জন। ওকে স্ট্রেচারে করে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হচ্ছে বুঝতে পারল। অ্যাম্বুলেন্স ছুটছে রাস্তা দিয়ে। কিন্তু অপরিচিত মানুষদের মধ্যে অতি পরিচিত একজন মানুষের উপস্থিতি টের পেল জন। এলেন।

জোর করে চোখ খুলল জন। এলেন অ্যাম্বুলেন্সের মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। একটা হাত ওর মাথার ওপর রাখা, তাকিয়ে আছে চোখের দিকে। মুখটা পান্ডুর, চোখ দুটো বিস্ফারিত।

'বল।'

'আমি সবসময়েই বলি-আমাদের-'

'আমি জানি। বিশ্বাসও করি।'

'যে পাইপটা থেকে তুমি বেরিয়ে এসেছ ওটা আমার বাবা অনেক আগে তৈরি করেছিলেন।'

জন কোনও কথা বলল না। ওটার কথা আমার জানা উচিত ছিল, ভাবল সে। এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল জনের মুখে, তারপর বুজে এলো চোখ; দারুণ এক মমতায়।

হবি
থিওডর ম্যাহিলন

ঝন্ ঝন্ ঠন ঠনাৎ। নীচের রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা বাসন কোসনের শব্দে মিঃ পিবডির ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। তিনি এখনো পুরো চোখ মেলেননি, মনে হলো স্ত্রী এলি বুঝি নাস্তার যোগাড়যন্ত্র করছে। কিন্তু পরক্ষণে মনে পড়লো এলি তো বেঁচে নেই। অ্যাপেন্ডিসাইটিস ফেটে ছয় বছর আগে প্রেমময়ী স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছেন। আর তখন থেকে এই শূন্য বাড়ীতে তিনি একা। স্ত্রীকে মনে পড়তেই বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে মিশে গেল ভোরের বাতাসে। বিছানা থেকে নামলেন তিনি, জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। ঝন্ ঝন্ শব্দটা এখনো শোনা যাচ্ছে। রান্নাঘরে নিশ্চয়ই ওয়েসলি রয়েছে, নাস্তা তৈরিতে ব্যস্ত। কথাটা ভাবতেই মৃদু হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'মিঃ হারবার্ট পিবডি, খেলায় তুমি তাহলে জিতে গেছো!' মনে মনে বললেন তিনি।

ধীরে সুস্থে বাথরুম সারলেন মিঃ পিবডি। শেভ করলেন। মৃদু হাসির রেখাটি ফুটেই আছে ঠোঁটে। উনি নীচে না নামা পর্যন্ত ছোকরা ভাগবে না, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। আয়নায় নিজেকে দেখছেন মিঃ পিবডি। দৃষ্টিতে নতুন চাঞ্চল্য। প্রতিমাসেই তিনি যেন নতুন করে আরো নবীন হচ্ছেন। আসলে বেঁচে থাকার প্রেরণা খুঁজে পেয়েছেন তিনি ইদানীং, জীবন নতুনরূপে ধরা দিয়েছে তাঁর কাছে।

কিন্তু একটা সময় এমনটি ছিলো না। নিজেকে বড় নিঃস্ব মনে হতো তাঁর।

এলি, যিনি ছিলেন তাঁর কাছে স্ত্রীর চেয়েও বেশী, মায়ের মতো, তাঁর মৃত্যুর পর জীবনটা আক্ষরিক অর্থেই শূন্য মনে হয়েছিলো। সবকিছুর ওপর বীতশ্রদ্ধ, হতাশ হয়ে একবার বাথরুমে ঢুকেছিলেন ভয়ংকর একটি পরিকল্পনা নিয়ে। এ জীবন আর রাখবেন না। বেঁচে থেকে কি হবে ? করবেনটা কি তিনি ? তাঁর আছে কে ? ত্রিশটা বছর একটা জীবন বীমা কোম্পানিতে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে গেছেন, অবসরও নিয়েছেন সময়মত, কিন্তু স্ত্রী যেদিন মারা গেলেন, বুঝতে পারলেন এ পৃথিবীতে তিনি বড়ই একা। বন্ধুবান্ধব, সন্তান-সন্ততি কেউ নেই তাঁর। থাকার মধ্যে আছে শুধু ব্যাংকে কিছু টাকা আর হাতে অনন্ত সময়, যে সময় এক বিশাল শূন্যতা নিয়ে গ্রাস করে আছে তাঁকে। এই অসহ্য শূন্যতা থেকে মুক্তি পেতে চান তিনি, দুনিয়ায় বেঁচে থাকার আর কোন সাধ নেই তাঁর। রেজারটা কব্জিতে বসিয়েও দিয়েছিলেন, কিন্তু সামান্য একটা আঁচড় কাটা ছাড়া আর কোন ক্ষতিই হয়নি তাঁর। আসলে ঐ সময় তাঁর দৃষ্টি চলে গিয়েছিলো খোলা মেডিসিন কেবিনেটের দিকে। এক প্যাকেট ফুলের বীজ রাখা ছিল ওখানটায়। এলিই

কোন এক সময় হয়তো রেখেছিলেন। ভেবেছিলেন পরে বাগানে লাগাবেন। বাগান করার বড় শখ ছিল তাঁর। কিন্তু ঐ বীজ আর অঙ্কুরিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। যেমনটি এলি রেখে গিয়েছিলেন, তেমনই আছে এখনো। খোলা প্যাকেটটার দিকে তাকিয়ে বুক হু হু করে উঠেছিল মিঃ পিবডির। চোখ ছাপিয়ে জল এসেছিল। পরম মমতায় প্যাকেটের গায়ে হাত বুলিয়েছেন তিনি। রেজারটা একপাশে সরিয়ে রেখে কাঁপা হাতে তুলে নিয়েছেন প্যাকেট। তখন যদি কেউ তাকে দেখতো, তবে দেখতে পেতো ঝরঝর করে গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে মিঃ পিবডির, নিঃশব্দে কাঁদছেন তিনি। কাঁদতে কাঁদতেই পরিষ্কার করছেন এলির রেখে যাওয়া টব, বাড়ীর পেছন থেকে নতুন মাটি এনে ভরছেন তাতে, বৃত্তাকারে পুঁতে দিচ্ছেন।

এক সপ্তাহের মধ্যে মিঃ পিবডির দু'ডজন বীজ লাগালেন। এক মাসের মধ্যে এলির প্রাক্তন বাগানের সব জায়গায় ফুলের গাছ লাগানো হয়ে গেলো। বসন্তে হেসে উঠলো বাগান। সেই হাসি ছুঁয়ে গেলো মিঃ পিবডির অন্তর। তিনি নতুন করে উপলব্ধি করতে পারলেন জীবনে পরিবর্তন এসেছে, এই সুন্দর ভুবন ত্যাগ করতে ইচ্ছে করছে না আর। জীবন মনে হচ্ছে না অর্থহীন। এলির ফুলবাগান করার সেই শখ নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে তাঁর মধ্যে, সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে এই উদ্দীপনাটুকু উপভোগ করছেন তিনি।

তারপর একদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরেই তিনি সম্পূর্ণ নতুন একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। আর তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে তাঁর কাছে আসে এই ছেলেটি-ওয়েসলি।

'আমি আমার বাকী জীবন শিশু কিশোর অপরাধীদের গাইড হিসেবে কাজ করে যেতে চাই' কথাটি তিনি বলেছিলেন স্থানীয় কিশোর পুনর্বাসন সংস্থার পরিচালককে। ঐদিন সকালেই চলে এসেছিলেন তিনি এখানে। 'একটি বিশেষ শখ যদি আমার জীবনটাকে নতুন করে অর্থবহ করে তুলতে পারে, তাহলে আমার বিশ্বাস এই সব শিশু কিশোরদের কোনো বিশেষ শখে আগ্রহী করে তুলতে পারলে ওদেরও জীবনটা বদলে যেতে পারে।'

'অনেকক্ষেত্রে উল্টোটাও তো ঘটতে পারে,' সতর্ক করে দেয়ার সুরে বলেছিলেন পরিচালক।

'কিন্তু আমি অনন্তঃ একটু চেষ্টা করে দেখতে চাই। শখের বশেই আমি এখন একজন আ-হটিকালচারিষ্ট। আমাকে না হয় একটু চেষ্টা করতে দিন। সুযোগ দিন কয়েকটি বাচ্চার সাথে কাজ করার। আমি ওদের শেখাবো কিভাবে ফুল গাছ লাগাতে হয়, ভালোবাসতে হয় ফুলকে। আমার বিশ্বাস ফুলের মতো পবিত্র জিনিসের সাথে থাকলে ওদের মনও সুন্দর হয়ে উঠবে, নতুন আশার আলো দেখতে পাবে।'

'ঠিক আছে, মিঃ পিবডি', পরিচালক তাঁর কণ্ঠে একাগ্রতা লক্ষ্য করে রাজী হলেন।

'আপনি তাহলে আমাদের একজন ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ শুরু করে দিন। আশা করছি সফল হবেন।'

সেই থেকে শুরু। পাঁচ থেকে নয় বছরের বাচ্চাদের নিয়ে কাজ শুরু করলেন মিঃ পিবডি। সারাক্ষণ ওদের নিয়েই পড়ে থাকেন। খুব যত্ন করে শেখান কিভাবে ফুল গাছ লাগাতে হয়, বীজ পুঁততে হয়, দিতে হয় পানি। শুধু ফুল গাছ লাগানোই নয়, তিনি ওদেরকে মহা উৎসাহে দাবা খেলা শেখালেন, কাপড়ের পুতুল তৈরি করে দিলেন, শেখালেন যাদু, এমনকি রান্না করাও।

খুব দ্রুত সাফল্য এলো তাঁর। অনেক ছেলেই তাঁর উৎসাহে সাড়া দিয়েছে। ওরা এরপরেও কোনো অপরাধমূলক কাজ করতো কিনা তা অবশ্য মিঃ পিবডি জানেন না, কিন্তু ওদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটি করে শখের জন্ম দিতে সমর্থ হয়েছেন ভেবে সন্তুষ্ট বোধ করলেন। আর সেটুকুই তাঁর সবচেয়ে বড় পাওয়া।

'আপনার কাজের জন্যে আমরা আপনাকে অভিনন্দিত করতে চাই, মিঃ পিবডি', পরিচালক অবশেষে একদিন বললেন তাঁকে। 'ছেলেগুলোর মধ্যে আপনি সত্যিই বেশ পরিবর্তন আনতে পেরেছেন।'

'প্রত্যেকেরই আসলে একটি শখ থাকা দরকার।' বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললেন মিঃ পিবডি, যেন সোনার মেডেল দিয়ে এইমাত্র তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়েছে।

তারপর একদিন সোনালী চুলের ওয়েসলি ডেভিসের আগমন ঘটলো ওখানে। মুখটা গোমড়া করে রেখেছিল সে, অথচ দেখতে দেবদূতের মতো। আর ওর চোখ দুটো বরফের মতো ঠাণ্ডা যা ষোল বছর বয়সী একটি ছেলের জন্যে নিতান্তই বেমানান।

'আপনার জায়গায় আমি হলে ওয়েসলি ডেভিসের ব্যাপারে খুব সাবধানে থাকতাম', সুপারিটেন্ডেন্ট সতর্ক করে দিলেন মিঃ পিবডিকে। 'শিক্ষানবিস হিসেবে ওকে 'রিফর্ম স্কুল' থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। ও আসলে অন্য ছেলেদের চেয়ে একটু আলাদা। ওকে নিয়ে কাজ করার আগে আপনার বোধহয় উচিত হবে ওর ডোশিয়ারটা পড়ে দেখা।'

মিঃ পিবডি ওয়েসলির ডোশিয়ার পড়লেন। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি সবটা পড়ে। আট বছর বয়সে এই ছেলে প্রথম গ্রেফতার হয় চার্চের জানালা ভাঙার অপরাধে। দশ বছর বয়সে আবারো ওকে গ্রেফতার করা হয়। অপরাধ-এক ইহুদী ব্যবসায়ীর বাড়ীতে স্বস্তিকা এঁকেছিল সে। এরপরেও বহুবার হাতকড়া পরতে হয়েছে ওকে। বেশীর ভাগ অপরাধ ছিল ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড এবং মদ্যপান সংক্রান্ত। আর ষোল বছর বয়সে সে তার সর্বশেষ অপকর্মটি করে- পার্কে এক লোককে গলাটিপে প্রায় মেরে ফেলার যোগাড় করেছিলো। এরপরই ওকে কিশোর সংশোধনীতে পাঠানো হয়। ছয় মাস প্রবেশন পিরিয়ডের পর রিলিজ করা হয়েছে ওয়েসলিকে।'

'যাকগে, ছোড়া অন্তত: ড্রাগ নেয় না।' মনে মনে ভেবেছেন মিঃ পিবডি। তারপর মনোযোগ দিয়েছেন তাঁর নতুন এসাইনমেন্টের দিকে।

'অবসর সময় তুমি কি করো, ওয়েসলি ?' পরিচয় পর্ব সেরে নেয়ার পর জিজ্ঞেস করলেন তিনি। ছেলেটি হাতের বইটা নামিয়ে রেখে নিষ্পাপ চোখে তাকালো তাঁর দিকে।

'জিনিসপত্র ভাঙি।' শান্ত সুরে বললো সে। যেন জিনিসপত্র ভাঙাটা স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজেরই একটা অংশ।

'তাই বুঝি ? কিন্তু জিনিসপত্র ভাঙাটা আসলে খুব একটা গঠনমূলক কাজ নয়, কি বলো ?'

'অবশ্যই। আমি তো অগঠনমূলক কাজ করতেই বেশি ভালোবাসি।'

'অগঠনমূলক ?'

'হ্যাঁ। এই পুরনো বিল্ডিংয়ের দরজা জানালা ভেঙে ফেলা আর কি।'

'কিন্তু এতো অল্প বয়সে বোধহয় তোমার এসব কাজকাম করা ঠিক না, বাছা। যাকগে, তোমার বিশেষ কোনো শখটখ আছে ?'

'শখ দিয়ে কি হবে ?'

'সবারই নির্দিষ্ট শখ থাকা দরকার।'

'আমার শখ কি, সত্যিই আপনি জানতে চান বুঝি ?' চোখে শয়তানী ফুটে উঠলো ওয়েসলির। সেই দৃষ্টির সামনে ভারী অস্বস্তিবোধ করলেন মিঃ পিবডি। আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলেন না।

তারপর আরেকদিন। ওয়েসলি লাঞ্চ করছিল। তার পাশে বসে আলাপ শুরু করলেন মিঃ পিবডি।

'কি খাচ্ছো, ওয়েসলি ? পটেটো প্যানকেক নাকি ?'

'হ্যাঁ। আমি নিজেই বানিয়েছি।'

'তুমি রান্নাও করতে পার দেখছি। বেশ বেশ। তা প্রতিদিনই কর নাকি ?'

'মাঝে মাঝে। যখন রাঁধুনি বুড়োটা রান্না করতে আসে না, তখন। আলু দিয়ে বিভিন্ন পদ তৈরি করি। কখনো কখনো আলুর মধ্যে বিভিন্ন জিনিস ফেলে দেই।'

'যেমন ?'

'পেঁয়াজ, পনির, আপেল- ইত্যাদি ইত্যাদি।'

'বাহ্ চমৎকার। তা তুমি কখনো 'পটেটো ক্যান্ডিস' খেয়েছো ? খাওনি ? ইস, তাহলে তো বিরাট মিস করেছ দেখছি। ফ্রান্সের রাজাদের খুব প্রিয় খাবার ছিল এটা, জানো ?'

'ওটার মধ্যে কি কি জিনিস দিতে হয় ?'

'চিকেনস্টক, লেমনজুস, পার্সলে- এমনি আরো অনেক কিছু।'

'ঐসব জিনিস আমাদের বাড়ীতে যে নেই!'

'তাতে কি হয়েছে!' সুযোগ বুঝে মোক্ষম চালটা চাললেন মিঃ পিবডি। 'তুমি আমার রান্নাঘরটাই তো স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারো। আমি নিজেই জিনিসগুলো এনে দেবো তোমাকে। কোনো অসুবিধেই হবে না, দেখো।'

ওয়েসলি রান্নার ব্যাপারে আগ্রহী, এই সত্যটা আবিষ্কার করতে পেরে মিঃ পিবডি ভারী উল্লসিত হয়ে উঠলেন। মনে হলো প্রথম রাউন্ডে তিনি জয়লাভ করেছেন। আর যখন ওয়েসলি সত্যি সত্যি তাঁর বাড়িতে রান্না করতে এলো, তখন তো খুশিতে তিনি বগল বাজাতে শুরু করলেন। ওয়েসলি রান্না করে। বিশ্রী রকম পোড়া আর অতিশয় কুখাদ্য সেই রান্না শেষ করে আবর্জনা না ফেলেই চলে যায় সে, পরিস্কার করার প্রয়োজনও বোধ করে না। অবশ্য মিঃ পিবডি ধৈর্য ধরে সব সয়ে যাচ্ছেন। নিজ হাতে রান্নাঘরের ময়লা পরিস্কার করতে করতে তিনি ভাবেন গঠনমূলক কিছু সৃষ্টির জন্যে সামান্য ঝামেলা আসলে কোন ব্যাপারই নয়।

দুই সপ্তায় বার পাঁচেক এলো ওয়েসলি রান্না করতে। নিত্য– নতুন অখাদ্যের মধ্যে একদিন হঠাৎ করেই তার রান্না করা কর্নড বীফ ভালো লেগে যায় মিঃ পিবডির। জিনিসটা চাখতে চাখতে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন তিনি। ওয়েসলির প্রতি বিশ্বাস জন্মে যাচ্ছে তাঁর- এ ছোকরা পারবে।

'কখনো সকাল বেলা যদি তোমার ইচ্ছে করে এখানে আসতে, ঝট্ করে চলো এসো', উদারভাবে ওকে অনুমতি দিলেন তিনি। 'পেছনের দরজাটা খোলাই থাকবে। আমার জন্যে না হয় নাস্তা তৈরি করো একদিন ভোরে। কি বলো, অ্যাঁ ?'

এবং আজ ভোরে রান্নাঘরে ঝন্ ঝন্ ঠন্ ঠন্ আওয়াজ শুনে নতুন করে আবারো বিজয় উল্লাস অনুভব করলেন মিঃ পিবডি। যে ছোকরার অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিলো সবাই, সেই কিনা এই সাতসকালে এসে তাঁর জন্যে নাস্তা তৈরি করছে। ভাবতেই হাসি আর ধরে রাখতে পারছেন না তিনি। ব্যাপারটা যেন বনের বাঘকে জঞ্জাল সাফ করতে বাধ্য করার মতো।

আত্মবিশ্বাসে ভরপুর মিঃ পিবডি দুলকি চালে নেমে এলেন সিঁড়ি বেয়ে নিচে; হলরুম পেরিয়ে রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন, হাসিমুখে খুলে ফেললেন দরজা।

চোখের সামনের দৃশ্যটা দেখে হাসি নিমেষে উধাও হয়ে গেলো মুখ থেকে, চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে। রান্নাঘরের অবস্থা ভয়াবহ। মেঝে আর আসবাবপত্রগুলো ময়দা মেখে ভূত হয়ে আছে। টেবিলক্লথ আর পর্দা চটচটে সস আর তরল চাটনিতে মাখামাখি। কৌটাগুলো গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেতে। আর ওয়েসলি ছোকরা স্টোভটার সামনে দাঁড়িয়ে দিব্যি দাঁত বের করে হাসছে। লোহার ফ্রাইপ্যানটা ওর হাতে।

'ওয়েসলি, এর মানে কি!' প্রচন্ড রাগে গলা বুজে এলো মিঃ পিবডির।

'আমি ঠিক করেছি, কারো জন্যে নাস্তা বানাতে পারবো না', বললো ওয়েসলি। 'আর রান্না করাটা মোটেও ভালো শখ না। নিকুচি করি আমি এসব শখের।'

'তুমি আমার রান্নাঘরটাকে শেষ করেছ।'

'এখনো তো শুরুই করিনি', বলেই ছোকরা হাতের ফ্রাইপ্যান দিয়ে জোরে বাড়ি মারলো চিনামাটির তৈরী অপূর্ব তৈজসপত্রগুলোর ওপর। মিঃ পিবডির বড় শখের জিনিস। বাসনগুলো ভাঙার শব্দ বিস্ফোরণের মতো কানে এসে বাজলো। রাগে আগুন হয়ে উঠলেন তিনি, দৌড়ে গেলেন ওর দিকে। কব্জি চেপে ধরলেন গায়ের শক্তি দিয়ে।

কয়েক সেকেন্ড নিঃশব্দ যুদ্ধ হলো দু'জনের মধ্যে। ফ্রাইপ্যানটা কেড়ে নিতে চাইছেন মিঃ পিবডি, ওয়েসলি কিছুতেই ছাড়ছে না। হঠাৎ ভীষণ এক চিৎকার বেরিয়ে এলো ওয়েসলির গলা থেকে। টান মেরে এক ঝাপটায় হাতটা মুক্ত করলো সে, ভয়ংকর গতিতে ওটা নামিয়ে আনলো বুড়ো লোকটির খুলির ওপর।

আশ্চর্য নীরব হয়ে গেছে রান্নাঘরটা। মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন মিঃ পিবডি। নিথর, প্রাণহীন। ওয়েসলি হাতের ফ্রাইপ্যানটার দিকে তাকালো। ওর বরফের মতো ঠাণ্ডা চোখে নিষ্ঠুর এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেছে। ও এখন জানে মিঃ পিবডি অবশেষে সফল হয়েছেন। তার জন্যে একটি নতুন শখ সৃষ্টি করে দিয়ে গেছেন তিনি- একটি সত্যিকারের শখ।

রুম টু লেট

হ্যাল এলসন

জানালার কাঁচে বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগছে। মিসেস ফ্লিন দাঁড়িয়ে আছেন জানালার সামনে, দৃষ্টি বাইরের দিকে। তাঁর চোখে প্রবল রাগ, উঁচু করে আছেন থুতনি। বৃষ্টির শব্দ শুনছেন না তিনি, বৃষ্টির পানি রাস্তার ঢালে মোটা নালা সৃষ্টি করে গড়িয়ে চলেছে নদীর দিকে, ওদিকেও তাঁর নজর নেই।

হারামজাদাটা আমাকে যাচ্ছেতাইভাবে ঠকিয়েছে, ভাবছেন মিসেস ফ্লিন। একটা কানাকড়িও ছিল না ব্যাটার ঘরে। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন তিনি। দেখছেন লাশ-বহন করা গাড়িতে স্ট্রেচারটা বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওদের কোন বেগ পেতে হলো না। কারণ মৃত লোকটার গায়ে তো ওজনই ছিল না বলতে গেলে। স্ট্রেচারটা মর্গ-ওয়াগনে ঢোকানো হলো, এইবার বন্ধ হলো দরজা। কালো, চকচকে রেইনকোট পরা ড্রাইভার আর অ্যাটেনডেন্ট রাস্তায় দাঁড়ানো পুলিশের লোকটির উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে গাড়িতে ঢুকলো। ওয়াগনটা যাত্রা শুরু করতেই পুলিশটা বাড়িটার দিকে একবার মুখ তুলে চাইলো, তারপর হাঁটা দিল ফিরতি পথে।

'যাক, ঝামেলা গেল', জোরে কথাটা বললেন মিসেস ফ্লিন, ঘুরে দাঁড়ালেন জানালার সামনে থেকে, ছোট, মোটা পা ফেলে এগোলেন হল ঘরের দরজার দিকে। তাঁর মাথার উপরের ঘরটা এখন খালি। কিন্তু ওখানে পৌঁছে নাসিকা কুঞ্চিত করলেন তিনি। ঘরের দরজা এখনও ভেজানো, অন্ধকার এবং নীরব। গা ছমছমে এ রকম ভুতুড়ে একটা ঘরে, বিশেষ করে এই মুহূর্তে ঢোকার কথা অন্যরা চিন্তাও করতে পারত না। কিন্তু মিসেস ফ্লিন গট গট করে ভেতরে ঢুকলেন, দ্রুত হাতে সেরে ফেললেন করণীয় কাজগুলো। প্রথমেই ঘরটা ঝাট দিলেন তিনি, বিছানার চাদর পাল্টালেন কয়েক মিনিট পর। বোঝার জো থাকলো না এখানে কিছুক্ষণ আগেও কেউ ছিল।

কাজ শেষ করতে করতে বাতাসের বেগ আরও বাড়লো, ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে কাঁচে। এমনকি আবহাওয়াও আজ আমার বিরুদ্ধে, তিক্ত মনে ভাবলেন তিনি। এসব গ্রাহ্যেই আনলেন না। অপেক্ষা করতে সায় দিলো না মন।

ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন মিসেস ফ্লিন। সদর দালানে সাইনবোর্ডটা পড়ে আছে। ওটাকে এখুনি যথাস্থানে ঝোলাতে হবে। ঝট করে সাইনবোর্ডটা হাতে তুলে নিলেন মিসেস ফ্লিন, খুললেন বাইরের দরজা। তীব্র ঝড়ো বাতাস আর বরফ ঠাণ্ডা বৃষ্টির ছাঁচ এসে ধাক্কা দিল গায়ে। শ্বাস প্রায় বন্ধ হওয়ার দশা। কিন্তু পাত্তা দিলেন না মিসেস ফ্লিন। ক্ষয়ে যাওয়া বেলে পাথরের উঁচু বারান্দার আংটার সঙ্গে লটকে দিলেন সাইনবোর্ড। ভেজা মুরগীর মতো কাঁপতে কাঁপতে সদর দালানে ফিরে এলেন মিসেস ফ্লিন। কাজ হয়েছে। শিকারের জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছে। কিন্তু এখন সমস্যা শুধু একটাই- মার্চের এই বিশ্রী বৃষ্টি।

সামনের একটা জানালা দিয়ে, বাদামী পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরের জনশূন্য রাস্তায় উঁকি দিলেন মিসেস ফ্লিন, বৃষ্টির মোটা পর্দাটার জন্য রাস্তা ভাল করে দেখাও যাচ্ছে না। এক সময় পর্দাটা ছিঁড়ে যেন বেরিয়ে এলো এক লোক। সোজা বাড়িটার দিকে হেঁটে এসে সে থামলো, চোখ তুলে চাইল ওপর দিকে। বাতাসে দোদুল্যমান সাইনবোর্ডটা নজরে এলো তার, শব্দটাও কানে গেল। সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে এলো সে, বেল বাজালো। দড়াম করে তার মুখের সামনে খুলে গেল দরজা, মিসেস ফ্লিন, থুতনি উঁচু করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগলেন।

'আপনার বিজ্ঞাপনটা দেখেই এসেছি'- শুরু করলো লোকটা।

'একটা ঘর ভাড়া দেব আমি', চটজলদি জবাব দিলেন মিসেস ফ্লিন। দ্রুত চোখ বোলালেন আগন্তুকের ওপর। জামাকাপড় বেশ পরিস্কার তবে তেমন দামী মনে হলো না। 'আপনি দেখবেন একবার ?'

'দেখতে তো চাই। কিন্তু....'

'সপ্তাহে দশ ডলার যদি ঘরটা আপনার পছন্দ হয়। আর টাকাটা নগদ দিতে হবে।'

এ কথায় মুচকি হাসলো লোকটা। বললো 'দয়া করে একবার যদি আমাকে একটু দেখতে দিতেন!'

মিসেস ফ্লিন ওকে নিয়ে ওপরে চলে এলেন, ঘর, বিছানা, বারান্দা, আলমিরা, বাতিদান ইত্যাদি সবই ভাল করে ঘুরিয়ে দেখালেন। তবে ফাটা ছাদ আর পুরানো ওয়ালপেপার সম্বন্ধে তিনি কোন মন্তব্য করলেন না, ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজনও অনুভব করলেন না।

'বেশ সুন্দর ঘর। আমার পছন্দ হয়েছে।' বলল লোকটা।

'নেবেন আপনি ঘরটা ?'

'নেব বলেন কি ? এখুনি নিয়ে নিচ্ছি।' বলতে বলতে ওয়ালেট বের করলো সে পেছনের পকেট থেকে। ওয়ালেটটা দামী চামড়ার কিন্তু পুরানো। তবে মালপানিতে বেশ ঠাসা। অবহেলা ভরে একতাড়া নোট বের করে মিসেস ফ্লিনের হাতে দিল সে।

'দশ সপ্তাহ'র ভাড়া একসঙ্গে দিলাম', হাসলো সে বাড়িওয়ালির চোখ জ্বলে উঠতে দেখে। 'তবে এর মধ্যে আপনি যদি ভাড়া না বাড়ান।'

'দশ ডলার ভাড়াই থাকবে', চট করে বললেন মিসেস ফ্লিন। এই ভাড়াটেকে তিনি সহজে হারাতে চান না। 'আমি মিসেস ফ্লিন। আপনার নামটা প্লীজ ? রসিদে লিখতে হবে।'

'জন ওয়াকার। আর রসিদ টসিদ আমার লাগবে না।'

'আপনি মানুষকে খুব বিশ্বাস করেন মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু ঘর ভাড়ার রসিদ আমাকে দিতেই হবে। নইলে আমি স্বস্তি পাব না।'

'ঠিক আছে, তাহলে দেবেন।' বললো আগন্তুক এগোল দরজার দিকে। 'আমার ব্যাগ নিয়ে আসি।'

মিসেস ফ্লিন ওয়াকারের সঙ্গে নিচে নেমে এলেন, সামনের দরজায় শিউরে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। 'আজ খুব ঠাণ্ডা পড়েছে' বললেন তিনি। 'বেরুবার আগে এক কাপ চা চলবে নাকি ?'

'ধন্যবাদ। চা-টা আমি এসে খাবো।' জবাব দিল নতুন ভাড়াটে। বেরিয়ে পড়লো।

দৌড়ে নিজের ঘরে চলে এলেন মিসেস ফ্লিন। দাঁড়ালেন জানালার সামনে। লোকটাকে দেখার চেষ্টা করলেন। বরফ পড়তে শুরু করেছে। ওয়াকার দেখতে দেখতে বরফের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। মার্চের এই বাজে আবহাওয়া এখন তাঁর বিরক্তি উদ্রেক করছে না। কারণ অবশেষে শিকার মিলেছে। পয়সাওয়ালা এক ভাড়াটে পেয়েছেন মিসেস ফ্লিন।

আধ ঘন্টার মধ্যে ফিরে এলো জন ওয়াকার। বরফে সারা গা ঢেকে আছে। মিসেস ফ্লিন তার জন্য পট, কাপ ইত্যাদি নিয়ে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। 'ব্যাগ রেখে ভেতরে আসুন', ওয়াকারের হাত ধরে বললেন তিনি।

ওয়াকার হাসলো। নিজেকে ছেড়ে দিল মিসেস ফ্লিনের হাতে। ফোল্ডিং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকলো দু'জনে। 'সুন্দর', মিসেস ফ্লিন চা ঢালছেন কাপে, চারপাশ দেখতে দেখতে মন্তব্য করল ওয়াকার। 'বেশ পরিপাটি।'

'একটু পুরানো আমলের। কিন্তু পুরানো ফ্যাশনই আমার পছন্দ', বললেন মিসেস ফ্লিন। ওয়াকারের হাতে কাপ আর প্লেট ধরিয়ে দিলেন।

চা-টা গরম, ধোঁয়া উঠছে। বেশ স্বাদ লাগলো। চায়ে দুধ-চিনি বেশি খায় ওয়াকার। দুধ আর চিনি মেশালো দু'চামচ, নাড়তে লাগলো। চোখ তুলে চাইতেই দেখলো বৃদ্ধা মহিলা ওর দিকে তাকিয়ে হাসছেন।

'এমন বাদলার দিনে এককাপ গরম চায়ের বিকল্প নেই, তাই না ?' বললেন তিনি। 'আমার চিন্তা হচ্ছিল চা-টা যদি আপনার পছন্দ না হয়।'

'আরে না, বেশ সুন্দর চা করেছেন আপনি। ধন্যবাদ।'

'গরম জলে স্রেফ একটা টি-ব্যাগ ছেড়ে দিয়েছি।' হাসতে হাসতে বললেন তিনি, উরুতে স্বভাববশতঃ চাপড় দিলেন। 'দেখুন, কথা বলতে গিয়ে ওটা আবার ঠাণ্ডা করে ফেলবেন না যেন। তাহলে আর মজাই পাবেন না। হা হা!'

শুরুটা মিসেস ফ্লিনের মনের মতোই হয়েছে। বাইরের হাওয়ার দাপাদাপিকে এখন তিনি ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। তুষারপাত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু গা হিম করা বৃষ্টি আবার শুরু হয়েছে।

চায়ের মতো সুরা আর নেই, ভাবলেন মিসেস ফ্লিন। মনে পড়লো তিনি যখন ওয়াকারের ঘরে মাঝে মাঝে চা নিয়ে যাবেন বলেছেন তখন সে কেমন লজ্জারাঙা হয়ে উঠেছিল। লোকটাকে আরাম আয়েশ দেয়ার পেছনে তাঁর বিরাট স্বার্থ রয়েছে। এটা তাঁর পরিকল্পনার একটা অংশ। এভাবে পটিয়ে পটিয়ে শিকারের কাছ থেকে তিনি খবর আদায় করেন।

কিন্তু মিঃ ওয়াকার বেশ আমুদে স্বভাবের হলেও নিজের সম্পর্কে কিছুই বলতে চায় না। তার ঘরের মধ্যে তো রহস্যময় কোন কিছুর সন্ধান মেলেনি। অবশ্য ইতোমধ্যে বেশ কয়েকবার তিনি চিরুনী অভিযান চালিয়েছেন নতুন ভাড়াটের ঘরে। আসল কাজ শুরুর আগে তিনি এসব করেই থাকেন।

মিসেস ফ্লিনের আসল উদ্দেশ্য মিঃ ওয়াকারের টাকাগুলো হাতানো। লোকটা যেন টাকার গাছ। প্রতিদিনই তো গাদা গাদা নোট আনছে। কিন্তু টাকাগুলো রাখছে কোথায় ? ব্যাংকে অবশ্যই নয়। এ ধরনের লোকও সে নয়। এতে কোন সন্দেহ নেই মিসেস ফ্লিনের।

চার সপ্তাহ একভাবে নিজের রুটিন মাফিক কাজ করে গেলেন মিসেস ফ্লিন, ওয়াকার ভোরে বেরিয়ে গেলেই তিনি দৌড়ে দোতলায় চলে আসেন ঝাড়ু আর ডাস্টার নিয়ে, কিন্তু লাভ হয় না কোন। ধরে নেন লোকটা কোনই টাকা রাখে না।

পঞ্চম সপ্তাহে মিসেস ফ্লিন খোঁজাখুঁজি বাদ দিলেন। ষষ্ঠ সপ্তাহের শেষের দিকে যখন তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওয়াকারকে ঘর ছেড়ে দিতে বলবেন এই সময় তিনি আসল জিনিসের খোঁজ পেয়ে গেলেন। ওয়াকার তার বাড়তি জুতোর ময়লা মোজা মধ্যে টাকা লুকিয়ে রাখে। কাঁপা হাতে দশটা কড়কড়ে একশো ডলারের নোট দ্বিতীয়বার গোনার সময় গুঙিয়ে উঠলেন মিসেস ফ্লিন। 'ওহ, আমি তাহলে ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম।' টাকাগুলো বার বার গোনার আনন্দে গুনে চললেন তিনি। তারপর নিচে গিয়ে এককাপ চা খেলেন। এখন এপ্রিল মাস। আকাশ বেশ পরিষ্কার। কিন্তু বিকেলেই মার্চের মতো রঙ ধারণ করলো মেঘ, ঘন হয়ে এল, জোরে হাওয়া বইতে লাগলো।

মিসেস ফ্লিন জানালার ধারে বসে থাকলেন জন ওয়াকারের জন্য। কিন্তু নির্ধারিত সময়েও সে পৌঁছুল না। রাত দশটার সময় বাড়ি ফিরলো সে।

'ইস, মিঃ ওয়াকার, আজ এতো দেরী করলেন যে! ঠাণ্ডায় জমে গেছেন দেখছি।' মিসেস ফ্লিন তার ভাড়াটেকে পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে এলেন। 'আপনার জন্য গরম গরম চা ফ্লাস্কে রেডি করে রেখেছি আমি।'

কিন্তু চা খেল না ওয়াকার। তাকে ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। 'খুব খারাপ দিন।' বিড় বিড় করে বলতে বলতে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো সে।

এই প্রথম মিসেস ফ্লিনের চায়ের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেছে ওয়াকার। এটা খুব খারাপ লক্ষণ। একটু পরে তিনি শুনলেন ওয়াকার নিচে নামলো এবং বেরিয়ে গেল। দড়াম শব্দে বন্ধ হলো দরজা, দশ সেকেন্ড পর আবার খুলে গেল।

যেন উড়ে এলেন মিসেস ফ্লিন, ফোল্ডিং ডোর এক পাশে মেলে ধরে উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইলেন, 'কোন সমস্যা, মিঃ ওয়াকার ?'

'আমি কাল চলে যাচ্ছি।' বললো সে, 'শিকাগো।'

'আপনি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন।' চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে মিসেস ফ্লিনের।

'ঠাট্টা হলে তো ভালোই হতো। কিন্তু আমি ঠাট্টা করছি না, মিসেস ফ্লিন। সত্যি কাল চলে যাব। তবে এখানে বেশ সুন্দর সময় কেটেছে আমার।'

'আঃ, তাহলে কি আর করা। শেষবারের মতো এক কাপ চা খেয়ে যান।' হতাশ গলায় বললেন তিনি।

'ধন্যবাদ। কিন্তু চা খেলে রাতে ঘুম আসবে না আমার। কাল আবার সকালেই ট্রেন ধরতে হবে।' আবার সিঁড়ি বাইতে শুরু করলো ওয়াকার।

'আমার খাতিরে অন্তত: এক কাপ খেয়ে যান। পেছন থেকে ডাকলেন মিসেস ফ্লিন। 'তবে আপনি জেগে থাকবেন না। কথা দিচ্ছি, শিশুর মতো ঘুমাবেন।'

থেমে দাঁড়ালো ওয়াকার, মৃদু হাসলো। বলল, 'ঠিক আছে'। নেমে এলো সে নিচে।

দু'জনে মিলে চা খেল বারান্দায় বসে, কিছুক্ষণ গল্প করলো। তারপর ওয়াকার চলে গেল তার ঘরে। তার চায়ে মিসেস ফ্লিনের মেশানো বিষ ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে।

পরদিন সকালে মারা গেল জন ওয়াকার। 'খুব চমৎকার মানুষ ছিলেন', পুলিশ ওয়াকারের লাশটা ধূসর কম্বলে মুড়ে নিচে নিয়ে যাচ্ছে এই সময় মন্তব্য করলেন মিসেস ফ্লিন। পুলিশের কাছে তিনি ওয়াকারের কোট, ব্যাগ, এক প্যাকেট সিগারেট ইত্যাদি হস্তান্তর করলেন। 'বেশি কিছু সঙ্গে ছিল তার, বললেন তিনি। 'কিন্তু এখন যেখানে সে যাচ্ছে সেখানে তো অতকিছুর দরকারও নেই।'

'তা বটে', জবাব দিল পুলিশ অফিসার, বেরিয়ে এলো বাইরে। স্ট্রেচারটা ওয়াগণের মধ্যে ঢোকানো হয়েছে। পুলিশ অফিসার কোট আর ব্যাগ ওয়াগনে রাখলো। ওয়াকারের লাশ নিয়ে চলে গেল ওয়াগন। পুলিশ অফিসারও বাড়ির পথ ধরলো।

মিসেস ফ্লিন ঝট করে দরজা বন্ধ করেই ছুটলেন তার প্রাক্তন ভাড়াটের ঘরে। সন্তর্পণে তিনি ভেতরে ঢুকলেন, এগোলেন আলমিরার দিকে। জুতো জোড়া যথাস্থানেই আছে, ময়লা মোজাসহ। ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে তিনি মোজা জোড়া বের করে আনলেন, কিন্তু টাকা নেই!

টাকাগুলো নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে ছিল। ও আগেই টাকা পকেটে রেখে দিয়েছে। পুলিশে খবর দেয়া আগে আমি কেন ওর পকেটগুলো একবার খুঁজে দেখলাম না? গুঙিয়ে উঠলেন মিসেস ফ্লিন, মারাত্মক ভুলটার জন্য কপাল চাপড়াতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস ফ্লিন, নিচে এসে এককাপ চা বানালেন। বারান্দায় বসে চা-টা শেষ করলেন। তারপর সদর দালান থেকে সেই ভয়ঙ্কর সাইনবোর্ডটা এনে বারান্দায় ঝোলালেন–*'ঘর ভাড়া দেয়া হইবে।'*

ডাবল ট্রাবল
রবার্ট এডমন্ড অল্টার

মি. ডার্বি তাঁর .২২ বোরের পিস্তলটা নামিয়ে ড্রেসার ক্লকের দিকে তাকালেন। সকাল ৭:১৭। বিছানা ছাড়ার নিত্য রুটিনের তেরো মিনিট আগে আজ তিনি ঘুম থেকে উঠেছেন। এই তেরোটা মিনিট তাঁকে খুব সাবধানে এবং সতর্কভাবে ব্যবহার করতে হবে। কারণ এই সময়টুকু তাঁর রুটিন বহির্ভূত। রুটিনের বাইরে হলেও সময়টা মি. ডার্বির ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা রক্ষার জন্য খুবই জরুরি। মুচকি হাসি ফুটল ঠোঁটে, হাতের কাজটা নিখুঁতভাবে সারার জন্য গর্বিত তিনি। দশ সেকেন্ড এজন্য নিজেকে বাহবা দিলেন মি. ডার্বি।

.২২ পিস্তলে এমনিতেই শব্দ হয় কম, তারপর মোটা বালিশের মধ্যে দিয়ে বুলেট ঢোকার সময় সামান্য 'পপ' আওয়াজ করে। আর বুলেটের ছিদ্রটাও বেশ ছোট। কোন বিশৃঙ্খলা নেই। তাই মি. ডার্বি মনে মনে বেশ খুশি। কারণ সবকিছু নিখুঁত এবং সময় মেনে সম্পাদন করা তাঁর নেশা।

পিস্তলটা একপাশে রেখে স্ত্রীর বিছানার কাছে চলে এলেন মি. ডার্বি। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে এলোমেলো কম্বলটা ভাঁজ করে পায়ের কাছে রেখে দিলেন। তারপর তোষকের একদিকের কভার খুলে ফেললেন। তাঁর স্ত্রী কভারের মধ্যে টাকা রাখেন, এ ব্যাপারটা আবিষ্কার করতেই মি. ডার্বির অনেকদিন লেগেছে। সংসার জীবনে খুবই অসুখী একজন মানুষ তিনি। তাঁর স্ত্রী নিজেকে পঙ্গু বলে দাবি করতেন– আর সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকতেন (অবশ্য স্ত্রীর পঙ্গুত্বের ব্যাপারটা মি. ডার্বির কখনোই বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু সকাল সাড়ে আটটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত প্রতিদিন অফিসে ব্যস্ত থাকতে হয় তাঁকে। তাই সন্দেহটা প্রমাণ করার সুযোগ হয়নি তাঁর। যদিও মি. ডার্বির ঘোর সন্দেহ তিনি বাড়ি থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্ত্রী বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠতেন আর পাড়া ঘুরে বেড়াতেন। আর যে-ই তাঁর অফিসে ফেরার সময় হত সঙ্গে সঙ্গে আবার তিনি বিছানায় শুয়ে পড়তেন। যেন শরীর লেগে গেছে বিছানার সাথে।) এই দুটো বছর মি. ডার্বির হাড়-মাংস জ্বালিয়ে খেয়েছেন ভদ্রমহিলা। সারাক্ষণ খালি প্যানপ্যানানি আর অভিযোগ লেগেই থাকত। যতক্ষণ বাড়িতে থাকতেন মি. ডার্বি, স্ত্রীর ফাইফরমাশ খেটে তাঁর জান বেরিয়ে যেত। এটা আনো, ওটা আনো, এই ছিল ভদ্রমহিলার মুখের একমাত্র বুলি। ইয়া মোটকা শরীর নিয়ে তিনি টাকা ভর্তি তোষকটার ওপর গড়াতেন আর মি. ডার্বি শুধু অপেক্ষায় থাকতেন কবে মুটকির নড়াচড়া চিরতরে বন্ধ করে দেবেন, এই আশায়।

ভদ্রমহিলাকে মি. ডার্বি বিয়ে করেছিলেন টাকার লোভেই। নইলে কে পঞ্চাশোর্ধ মাংসের একটা তালকে খামোকা জীবন সঙ্গিনী করতে যায় ? বেশ ধনবতী ছিলেন তাঁর

স্ত্রী। কিন্তু ব্যাংকে একটা টাকাও রাখতেন না। তোষকের কভারই মহিলার ব্যাংক। যেদিন জানতে পারলেন মি. ডার্বি, খুশিতে বাগবাগ হয়ে উঠেছিলেন। তারপর থেকে সুযোগ খুঁজছিলেন কিভাবে টাকাটা হাতানো যায়। অনেক কষ্টে খুন করার সাহস যুগিয়েছেন বুকে। তারপর আজ সকালে...। তাঁর স্ত্রী একটা শব্দ উচ্চারণ করারও সুযোগ পায়নি। দুই বছরের অনবরত ভ্যানভানানির পর এই একটা সকালে মহিলার নীরবতা সুমধুর সঙ্গীতের মতো লাগছে মি. ডার্বির কাছে।

কভারের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন মি. ডার্বি। ছোট বড় অনেকগুলো প্যাকেট স্পর্শ পেল আঙুল। খসখসে। একটার পর একটা বের করতে লাগলেন তিনি। পাঁচটা, দশটা, বিশটা, পঞ্চাশটা...

আলমিরা খুলে একটা ব্রিফকেস বের করলেন মি. ডার্বি। টাকার প্যাকেটগুলো সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখলেন। তারপর, কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটায় ঢুকলেন বাথরুমে। টুথব্রাশ আর রেজার নিয়ে ফিরে এলেন বেডরুমে, ঢোকালেন ব্রিফকেসে। কয়েকটা শর্টস এবং মোজাও রাখলেন। ব্যস, আর কিছু নেয়ার দরকার নেই। প্যারিসে পৌঁছেই তিনি নতুন পোশাক কিনে ফেলবেন।

পোশাক পরে ব্রিফকেসটা হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগোচ্ছেন মি. ডার্বি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন। 'শান্তিতে বিশ্রাম নাও, প্রিয়তমা', নরম গলায় বললেন তিনি।

নিচে নেমে এলেন মি. ডার্বি। হলঘরের ঘড়িতে সাতটা চল্লিশ বাজে। মাথা ঝাঁকালেন সন্তুষ্টির ভঙ্গিতে। অন্যান্য দিনগুলোর মতো আজও তিনি সময়ানুবর্তিতা রক্ষা করে চলেছেন। আটটা পঞ্চাশে তাঁর বাস স্টেশনে পৌঁছার কথা। সেভাবে হিসেব করে তাঁকে প্রতিটি কাজ করতে হবে। গত দু'বছর হিসেবের বাইরে পা ফেলেছেন এমন অপবাদ তাঁর শত্রুও দিতে পারবে না। 'ডার্বিকে দেখলে আর ঘড়ির সময় জানার প্রয়োজন হয় না', প্রতিবেশীরা প্রায়ই তাঁর সম্পর্কে এই কথাটি বলে। আর আজকের বিশেষ এই সকালে কোনভাবেই কোন ভুল পদক্ষেপ নেয়া যাবে না, চলবে না সময়ের হিসেবে কোন গরমিল, প্রতিটি সেকেন্ড আজ তাঁকে গুণে গুণে চলতে হবে। আগে গরম করা কড়াইতে তিনটে বেকন ছেড়ে দিয়ে রান্নাঘরের ঘড়ির দিকে তাকালেন মি. ডার্বি। সাতটা তেতাল্লিশ। দ্রুত মাংসটা ভেজে দুই পিস তিনি খেয়ে নিলেন। বাকি টুকরো অভ্যাস মতো স্ত্রীর জন্য থাকল। খেয়াল হতেই জিভে কামড় দিলেন তিনি। 'উহুঁ।' এদিক-ওদিক মাথা নাড়ালেন মি. ডার্বি। 'এরকম ভুল হলে তো চলবে না।' বাকি বেকনও খেয়ে ফেললেন তিনি। এরপর ফ্রিজ খুলে তাঁর জন্য নির্ধারিত দুটো ডিম বের করলেন। ডিম ভাজা, আধা গ্লাস খেজুরের রস দিয়ে ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে যথারীতি ঘড়ি দেখলেন মি. ডার্বি। সাতটা আটচল্লিশ। খবরের কাগজ পড়া এবং ট্যাবিকে ডেকে আনার সময় হয়েছে। হলঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। মুখে হাসিটা ধরাই আছে।

ট্যাবিকে প্রতিদিন সকালে ঘরে এনে এক ধরনের বিকৃত আনন্দ পান মি. ডার্বি। মিসেস ডার্বি ক্রেগের বউর' মতই–নিজের ঘর আর আসবাবপত্রের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

রক্ষার ব্যাপারে ভীষণ খুঁতখুঁতে। ট্যাবিকে সহ্যই করতে পারতেন না তিনি। বেড়ালটাকে দেখলেই নাকমুখ কুঁচকে যেত তাঁর প্রবল বিতৃষ্ণায়, 'শয়তানের বাচ্চা' নাম দিয়েছিলেন তিনি ট্যাবির। আর স্ত্রীকে মানসিক যন্ত্রণা দিতেই মি. ডার্বির প্রধান কাজ ছিল প্রতিদিন সকালে ট্যাবিকে খাবারের লোভ দেখিয়ে ভেতরে ডেকে আনা।

মি. ডার্বি ওই দিনের ভাঁজ করা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে সামনের বারান্দায় এলেন। নরম গলায় ডাকতে লাগলেন, 'ট্যাবি-ট্যাবি-ট্যাবি।'

তাঁর পাশের ফ্ল্যাটের দোতলার জানালা দিয়ে উঁকি দিলেন বিধবা প্রতিবেশী মিসেস রিজ। মি. ডার্বিকে দেখে হাসলেন তিনি। কথা বলার আগে ঘড়ির দিকে একবার তাকাতে ভুললেন না। 'কি ব্যাপার মি. ডার্বি', বললেন তিনি। 'আজ আপনি দু'মিনিট আগে এসেছেন নাকি আমার দু'মিনিট দেরি হয়েছে?'

'আপনি বোধ হয় ভুল বলেছেন মিসেস রিজ', বললেন মি. ডার্বি। 'আমি কাল রাতে টেলিফোন অপারেটরের ঘড়ির সঙ্গে সময় মিলিয়ে দেখেছি। আমার ঘড়ি ঠিকই আছে।'

মাথা দোলালেন মিসেস রিজ। 'সেটা হওয়াই স্বাভাবিক, মি. ডার্বি। আপনার ঘড়ি কখনও ভুল সময় দেয় না। নিখুঁত সময় জ্ঞানের ব্যাপারে আমরা আপনার ওপর এজন্যই ভরসা রাখতে পারি।'

পাতাবাহারের একটা ঝাড়ের আড়াল থেকে মিউমিউ করে এই সময় বেরিয়ে এলো ট্যাবি। দ্রুত এগোল মি. ডার্বির দিকে। বেড়ালটার তাড়া দেখে আবার হাসলেন মিসেস রিজ। 'ট্যাবি আপনার খুব পোষা হয়ে গেছে, মি. ডার্বি।'

চট করে একবার রিস্টওয়াচে চোখ বোলালেন মি. ডার্বি। সাতটা একান্ন। ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বললেন, 'মাফ করবেন, মিসেস রিজ...আমার ডিম সিদ্ধ বোধ হয় হয়ে এল।'

তড়িঘড়ি রান্নাঘরে ঢুকলেন তিনি। একটা প্লেটে সেদ্ধ ডিম সাজিয়ে খেতে দিলেন ট্যাবিকে। নিজের নাস্তা নিয়ে এগোলেন ডাইনিং রুমের দিকে। গলায় যখন ন্যাপকিন বাঁধছেন মি. ডার্বি, ডাইনিং রুমের ঘড়ি ঢং ঢং করে জানান দিল সকাল সাতটা পঞ্চান্ন বেজে গেছে।

আটটা দশে নাস্তা খাওয়া হয়ে গেল মি. ডার্বির। মাত্র খবরের কাগজের ভাঁজ খুলতে শুরু করেছেন, এই সময় হলঘরে ফোন বেজে উঠল। কপাল কুঁচকে গেল মি. ডার্বির। পা বাড়ালেন ওদিকে।

ফোনটা আসার কারণ এখন বুঝতে পারছেন তিনি। তাঁদের অফিস ক্লার্ক স্মিটি প্রায়ই সকাল বেলা তাঁকে এভাবে ফোন করে জ্বালাতন করে। তাঁর সময় জ্ঞান নিয়ে দু'একটা মশকরা না করলে পেটের ভাত যেন হজম হয় না ব্যাটার।

'ঠিক আছে, স্মিটি', বললেন মি. ডার্বি। 'আমি মাত্র নাস্তা করলাম।'

আবারও হাসলো লোকটা। 'আমি একটু আগে ওদেরকে তাই বলছিলাম, ডার্বি। বলছিলাম: এমনকি বেড়াতে গেলেও আমাদের বুড়ো ডার্ব তার হিসেব করা সময়ের সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকবে। ঠিক বলিনি ?'

কষ্টার্জিত হাসি হাসলেন মি. ডার্বি। 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। আমি সব সময় সেকেন্ড গুণে কাজ করি।'

'ঠিক আছে ডার্ব, তো দুই সপ্তাহের ছুটি নিয়েছ তুমি, তাই না ? বাড়ির কাজ সারার প্রচুর সময় পাবে। ধোয়া, মোছা, সাফ সুতরো সবই বোধ হয় করে ফেলবে, তাই তো ? হো! হো! যাকগে, ডার্ব। দু'সপ্তাহ পর আবার দেখা হবে।'

ফোন রেখে দিলেন মি. ডার্বি। নির্জন বাড়িটার চারদিকে একবার চোখ বোলালেন তিনি। 'শেষ বারের মতো এই বাড়ি সাফ সুতরো করে যাচ্ছি আমি।'

খবরের কাগজটা টেনে নিলেন মি. ডার্বি, নিশ্চিত মনে পড়া শুরু করলেন। প্রতিবেশীদের কোন ধারণাই নেই তাঁর আজ সকালের যাত্রা সম্পর্কে। সকাল সাড়ে আটটায় তিনি যখন বাড়ি ছেড়ে বেরুবেন, তারা ভাববে মি. ডার্বি নিত্যদিনের মতো অফিসে যাচ্ছেন। সাড়ে ছটার মধ্যে তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত তারা ব্যাপারটা লক্ষই করবে না। সাড়ে সাতটাতেও যখন দেখবে তিনি বাড়ি ফেরেননি ওরা হয়তো একটু অবাক হবে। কিন্তু সাড়ে আটটা নাগাদ ওরা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়বে বলে মনে হয়। কারণ গত দুই বছরে কোনদিন দুই ঘণ্টা দেরি করে অফিস থেকে ফেরেননি মি. ডার্বি। আর সাড়ে ন'টার সময়ও যখন ওরা দেখবে তাঁর কোন খবর নেই, সম্ভবত বাড়িতে আসবে খোঁজ নিতে-পুলিশে ফোন করতেও পারে।

কিন্তু তাতে মি. ডার্বির কিছুই আসবে যাবে না। কারণ ন'টা বিশে তিনি নিউইয়র্কের ফ্লাইট ধরবেন। আর রাত সাড়ে দশটায় ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে প্যারিসগামী প্লেনে চড়ে বসবেন। পুলিশ যত তাড়াতাড়িই তাঁর মৃতা স্ত্রীকে আবিষ্কার করুক না কেন, ততক্ষণে তিনি ইউরোপের মাটিতে পা রেখেছেন। তারপর নতুন নাম, ভুয়া পাসপোর্ট নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে কতক্ষণ ?

মি. ডার্বিকে ভয়ানক চমকে দিয়ে বেজে উঠল ডোরবেল। কাগজটা ফেলে দিয়ে ভীত চোখে চাইলেন ঘড়ির দিকে। আটটা একুশ। এতো সকালে কোন গর্দভ বাড়িতে এলো ? কেন ?

চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে দ্রুত তিনি দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

একটা লোক হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়, এক হাতে একটা খোলা বাক্স, ভেতরে কয়েকটা ব্রাশ সুন্দরভাবে সাজানো, সঙ্গে কয়েকটা যন্ত্রপাতি; অন্য হাতে একটা ভারি ব্যাগ, সোনার জলে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম লেখা।

'মি. ডার্বি ? আমি আপনার জিনিস নিয়ে এসেছি, স্যার।'

চোখ পিটপিট করলেন মি. ডার্বি। 'আমার জিনিস ?'

'জ্বী, আপনার ব্রাশ...কিংবা বলতে পারেন আপনার স্ত্রীর, হে-হে।'

কপালে ভাঁজ পড়ল মি. ডার্বির। 'আমার স্ত্রী ?'

হাসিটা আড়ষ্ট হয়ে গেল ফেরিওয়ালার মুখে। 'জ্বী স্যার। আপনার স্ত্রী গত সপ্তাহে এই ব্রাশগুলো আমাকে নিয়ে আসতে বলেছিলেন।'

ঘড়ির ডায়ালে ঘুরে এলো মি. ডার্বির চোখ। আটটা বাইশ। 'তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।' অন্যমনস্ক সুর তাঁর কণ্ঠে। 'ব্রাশ দিয়ে উনি কি করবেন ? তিনি তো ইনভ্যালিড। বিছানা ছেড়েই উঠতে পারে না।'

ব্রাশওয়ালার চোখে এবার সন্দেহ ফুটলো। চিঠির বাক্সে ছাপ মারা বাড়ির নাম্বার দেখল সে এক পলক, তারপর কোটের পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করল।

'কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই মি. ডার্বি, তাই না ? আমি অর্ডারগুলো তাঁর কাছে এই বাড়ি থেকেই পেয়েছি- একটা সিঙ্ক ব্রাশ-নাইলন; একটা হেয়ার ব্রাশ-নাইলন; একটা হ্যান্ড লোশন-ব্লু মেমোরি; একটা কীটনাশক-পাইন সেন্ট...সবই অর্ডার দিয়েছেন একজন মিসেস এলমো ডার্ব। গত সপ্তাহে এখানে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে আমার কথা হয়...আহ্, দিনটা ছিল সোমবার। জ্বী, সোমবারই ছিল। মনে পড়েছে।'

তাহলে ব্যাপার এই। মি. ডার্বি যা সন্দেহ করেছিলেন সব সত্যি। আদপেই তাঁর স্ত্রী পঙ্গু নয়। ক্রোধের ঢেউ উঠল শরীরে। দুটো বছর এই মহিলা কি নির্যাতনটাই না চালিয়েছে তাঁর ওপর; তাঁকে স্রেফ ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছিল, প্রতি রোববার মি. ডার্বিকে তার স্ত্রীর সমস্ত নোংরা জামাকাপড় ধুয়ে দিতে হয়েছে, খাবার রান্না করেছেন তিনি, খাইয়ে দিয়েছেন, বারবার ওপর-নিচ করে করে তাঁর শরীর ব্যথা হয়ে যেত...। এখন মি. ডার্বির রীতিমত আফসোস হতে লাগল কেন কাজটা করার আগে তাঁর মিসেসকে ঘুম থেকে আগে জাগাননি...

আটটা তেইশ।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। উনিই আমার স্ত্রী', ঘেউ ঘেউ করে উঠলেন মি. ডার্বি। দরজা বন্ধ করার তাড়া দেখালেন। 'কিন্তু এসব জিনিস আমাদের এখন কোন দরকার নেই।'

মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল ব্রাশওয়ালার। 'দরকার নেই, স্যার ? কিন্তু আপনার স্ত্রী তো সেদিন বললেন, এগুলো তাঁর খুব দরকার। মি. ডার্বি, স্যার, দয়া করে আমাকে যদি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একটু কথা বলতে দিতেন...'

ধমক দিলেন মি. ডার্বি। 'না, না ওঁর সঙ্গে এখন কথা বলা যাবে না। উনি এখন ঘুমাচ্ছেন...মানে নাস্তা খাচ্ছেন...বিছানা ছেড়ে ওঠেননি এখনও।' আবার ঘড়ির দিকে দৃষ্টি চলে গেল তাঁর। উদ্ভট আচরণ করছেন তিনি, বুঝতে পারছেন মি. ডার্বি। ব্রাশওয়ালা তাঁর সম্পর্কে উল্টোপাল্টা কিছু ভেবে বসতে পারে। কিন্তু সে রকম কিছু ভাবার সুযোগ ওকে দেয়া যাবে না। সব কিছু স্বাভাবিকভাবে না চললে কোথাও মস্ত ভজকট হয়ে যেতে পারে। এই লোকটাকে এখন ভালোয় ভালোয় বিদায় করতে পারলে তিনি বাঁচেন। তাহলে তাঁর হিসেব করা সময় এবং কাজে কোন গরমিল হবে না।

'তোমার জিনিসের দাম কত?' জিজ্ঞেস করলেন মি. ডার্বি।

আবার তেলতেলে হাসিটা মুখে ফিরে এলো ব্রাশওয়ালার। বিলের দিকে তাকালো সে, 'এই তো, এখানে লেখা আছে...মোট চারশো একুশ ডলার। ট্যাক্সসহ, জানেনই তো।'

হ্যাঁ। হ্যাঁ, জানি।' আটটা চব্বিশ। মি. ডার্বি ওয়ালেটের জন্য পকেটে হাত ঢোকালেন...পরক্ষণে মনে পড়ল পকেটে টাকা নেই। 'এক মিনিট', বলে তাড়াতাড়ি চলে এলেন ডাইনিং রুমে। ব্রিফকেস খুলে ত্রস্ত হাতে টাকার একটা প্যাকেট তুলে নিলেন।

নোটটার দিকে চেয়ে ব্রাশওয়ালার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। 'মাত্র পঞ্চাশ ডলার ? কিন্তু বিল হয়েছে...'

লজ্জা পেলেন মি. ডার্বি। ওকে আর কথা শেষ করতে দিলেন না, আবার ফিরে এলেন ডাইনিং রুমে। পাঁচশো ডলারের বদলে ভুলে পঞ্চাশ ডলার নিয়েছেন।

প্যাকেট খুলে কাঁপা হাতে পাঁচশো ডলারের নোট খুঁজছেন মি. ডার্বি, ডাইনিং রুমের ঘড়ি জানান দিল আটটা চব্বিশ বাজে। ঠোঁট কামড়ালেন তিনি। নিজেকে তিরস্কার করছেন। 'শান্ত হও, ব্যাটা। নইলে ব্রাশওয়ালা কিছু সন্দেহ করে বসবে।' প্রায় দৌড়ে তিনি সামনের দরজায় চলে এলেন।

লোকটা ভাংতি ফেরৎ দিচ্ছে, কিন্তু এমন ভাবে টাকা গুণতে শুরু করল যে মি. ডার্বির মনে হলো সে অনন্তকাল ধরে গুণেই চলেছে।

'পাঁচশ থেকে চারশো একুশ বাদ দিলে থাকে ঊনআশি। এই নিন, স্যার সত্তর ডলার। আর এই নিন আরও পাঁচ ডলার। এই যে নিন আরও তিন...মোট দিলাম আটাত্তর ডলার। কিন্তু খুচরা আরেক টাকা যে কই গেল...', আঁতিপাঁতি করে ফেরিওয়ালা নিজের পকেট হাতড়াতে লাগল।

অধৈর্য হয়ে উঠলেন মি. ডার্বি। আটটা আটাশ বেজে গেছে। 'ঠিক আছে, তোমাকে আর এক ডলার দিতে হবে না। ওটা তোমার কাছেই রেখে দাও।'

'না, না। তা কেন ? ছিল তো আমার কাছে! এই তো পেয়েছি! নিন স্যার- এই যা। আরেকটু হলেই হাত ফস্কে পড়ে যাচ্ছিল', বলল ব্রাশওয়ালা। ভাংতি টাকা বুঝিয়ে দিতে পেরে সন্তুষ্ট।

'ঠিক আছে। এবার তাহলে তুমি এসো, কেমন ?' মি. ডার্বি দড়াম করে দরজা বন্ধ করলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কড়া নাড়ল ফেরিওয়ালা।

কপালে হতাশায় চাপড় মারলেন মি. ডার্বি নিজেকে একটা গাল দিয়ে, আবার দরজা খুললেন। হাতে মোটা একটা প্যাকেট নিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাসছে ব্রাশওয়ালা।

'আপনার জিনিস, স্যার। না নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।'

প্যাকেটটা প্রায় ছিনিয়ে নিলেন মি. ডার্বি ঝট করে ব্রিফকেসটা নিয়ে চট করে মাথায় হ্যাটটা চাপালেন। গলা খাঁকারি দিয়ে ঠিক করলেন টাইয়ের নট, তারপর সামনের দরজাটা খুললেন। বারান্দায় নেমে শেষবারের মতো দরজা বন্ধ করলেন তিনি।

সব কিছুই এখন পর্যন্ত ঘড়ির কাঁটা ধরে চলছে। একটু উত্তেজনা বোধ হচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটাকে পাত্তা দিলেন না মি. ডার্বি। তাঁর চিরাচরিত 'সময় চলে যাচ্ছে নষ্ট কোরো না' ভাব নিয়ে হুড়মুড়িয়ে ড্রাইভওয়েের দিকে এগোলেন।

মিসেস রিজের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। 'আমার ঘড়িটা এখন নিশ্চই ঠিক সময় দিচ্ছে, মি. ডার্বি। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটা। আপনাকে দেখে আমি সবসময় এই সময় ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে নিই।'

মৃদু হাসলেন শুধু মি. ডার্বি। কোন মন্তব্য করলেন না।

'আপনার স্ত্রী কি নাস্তা খাচ্ছেন, মি. ডার্বি ?' পেছন থেকে ডাকলেন মিসেস রিজ। 'তার গায়ে আবার ব্যথা ওঠেনি তো ?'

রসিকতা করার সুযোগটা হারালেন না মি. ডার্বি। যদিও এজন্য তাঁকে চারটে মূল্যবান সেকেন্ড নষ্ট করতে হলো। থেমে দাঁড়ালেন তিনি, ঘুরলেন, 'আমি ওর জন্য আজ সকালে বিশেষ নাস্তার ব্যবস্থা করেছি।' বললেন তিনি। 'আর ব্যথা ট্যাথা তাঁর এখন একদম নেই।'

সকাল সোয়া দশটায় প্যারিস ফ্লাইটের যাত্রীরা এয়ারপোর্টের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং-এর গেট দিয়ে ভেতর ঢুকতে শুরু করল। এদের মধ্যে মি. ডার্বিও আছেন। বেশ প্রফুল্ল চিত্তে রয়েছেন তিনি। মনে হচ্ছে সারা পৃথিবীর সময় এখন তাঁর হাতের মুঠোয়। তাঁর সমস্ত সমস্যা, ভয় এখন তাঁর কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। নিজের ভাবনায় তিনি এতো মশগুল যে লক্ষই করলেন না ওভারকোট আর টুপি পরা এক দীর্ঘদেহী লোক যাত্রীদের কাগজপত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করছে।

মি. ডার্বি তাঁর টিকেট আর পাসপোর্ট মাত্র দেখিয়েছেন, ওভারকোট তার প্যান্টের পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে উল্টো একটা ঝকঝকে ধাতব ব্যাজ দেখাল তাঁকে।

'আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে, মি. ডার্বি। আমি আপনাকে হত্যা করার সন্দেহে গ্রেফতার করছি।' আরও কিছু কথা হয়তো বলত সে, কিন্তু মি. ডার্বির রক্তশূন্য চেহারা দেখে থেমে গেল।

'কি-কিভাবে ? মাথা বনবন করে ঘুরছে মি. ডার্বির। গোয়েন্দা অফিসার তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো তিনি তার সঙ্গে চলেছেন। আবার প্রশ্নটা করলেন তিনি। 'কি-কিভাবে এতো তাড়াতাড়ি আপনারা খোঁজ পেলেন।

গোয়েন্দা অফিসার তার হাসি গোপন করতে পারল না। 'আপনার স্ত্রী আপনার মতই ঘড়ির কাঁটা ধরে চলতেন, মি. ডার্বি। আপনাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মের রুটিনে কোন হেরফের হত না।'

'আমাদের রুটিন ? আমার স্ত্রীর আবার কি রুটিন ছিল ?'

'কেন, আপনি জানতেন না ?' গোয়েন্দাকে খুবই বিস্মিত দেখাল। 'ঠিক আছে। তাহলে খুলেই বলছি। প্রতিদিন সকাল সাতটা ঊনত্রিশ মিনিটে আপনি বেড়াল ট্যাবি আর খবরের কাগজ নিয়ে বসতেন, আপনার প্রতিবেশী মিসেস রিজ আমাকে

জানিয়েছেন। তারপর সকাল সাড়ে আটটায় আপনি বেরিয়ে যেতেন কাজে। আর তার ঠিক দশ মিনিট পরে, অর্থাৎ আটটা চল্লিশে আপনার স্ত্রী সামনের দরজা খুলে বেড়ালটাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলতেন।'

'কিন্তু আজ সকালে মিসেস ডার্বি ওই সময় ট্যাবিকে রুটিন মতো বাইরে তাড়িয়ে না দেয়ায় মিসেস রিজ চিন্তায় পড়ে যান-কারণ তিনি জানতেন আপনার স্ত্রী অসুস্থ-তাঁর অসুখটা আরও বাড়লো কি না দেখার জন্য তিনি আপনাদের বাড়িতে আসেন, আর তারপর...'

মার্ডার ডিলেড
হেনরী স্লেসার

'বড্ড গরম পড়েছে আজ', কপালের ঘাম মুছে বলল 'ডেইলি মিরর'-এর রিপোর্টার বব মিলান।

'জানালাটা আরেকটু খুলে দিলে আপনার কি খুব অসুবিধে হবে ?'

'না, না', বলল জো হারপার। চেয়ার ছেড়ে ধীর গতিতে উঠে দাঁড়াল সে, আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল লিকার ক্যাবিনেটের দিকে। দুটো গ্লাসে ড্রিংক ঢাললো; কেঁপে উঠল হাত। বব মিলান তার দিকে সহানুভূতির চোখে তাকালো।

'ঠিক আছে, আপনাকে এতো ব্যস্ত হতে হবে না।' বলল সে।

'না, এ আর এমন কি কাজ।' জবাব দিল হারপার। 'কষ্ট এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। কষ্ট ভাবলেই শুধু কষ্ট।' মিলানের দিকে একটা গ্লাস এগিয়ে দিল সে। মুখে আড়ষ্ট হাসি। চেয়ারে বসতেই হারপারের পাতলা মুখ থেকে হালকা হাসির রেখাটা মুছে গেল। চল্লিশের কোঠায় বয়স তার। কিন্তু ঘন চুল আর বেঁটেখাটো শরীরের জন্য অনেক তরুণ দেখায়।

'গল্পটা আপনি হয়তো আরো অনেককেই বলেছেন', শুরু করল বব মিলান। 'কিন্তু আমাকে তারপরও সময় দেয়ার জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করছি।'

'অনেকবার নয়। প্রথমবার গল্পটা আমি বলি যখন ডাকাতির ঘটনাটা সংঘটিত হলো, সেবার। আর একবার মামলা চলার সময় বলেছিলাম। অনেক পত্রিকাই ব্যাপারটাতে প্রথমদিকে খুব আগ্রহী ছিল। কিন্তু নেলীর বিচারের রায় বেরুবার পর সবাই এ সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।'

'কিন্তু আমি নতুন করে আবার সবকিছু শুনতে চাইছি।' বলল মিলান।

'লেখাটা তো সামনের রোববার ছাপা হবে, তাই না ?'

'জ্বী, আমি গল্পের মানবিক দিকটাকেই তুলে ধরার চেষ্টা করব।'

'ঠিক আছে।' বলল হারপার।

'মিঃ প্যাচম্যানের দোকানে কাজ করতে গিয়ে এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে কল্পনাও করিনি আমি।' গল্প শুরু করল জো হারপার। 'বুড়ো লোকটা নেহায়েত সাদামাটা স্বভাবের ছিল। আর ব্যবসাটাও এমন কিছু আহামরি ছিল না। যে বিল্ডিং-এ প্যাচম্যানের জুয়েলারী দোকান সেখানে তার চেয়ে অনেক বড় বড় ব্যবসায়ীর কমপক্ষে পঞ্চাশটা দোকান ছিল। অথচ ঘটনাটা ঘটলো কিনা বুড়োর দোকানেই। হয়তো নেলী ভেবেছিল বুড়ো প্যাচম্যানকে কব্জা করতে তার সমস্যা হবে না।

'যাহোক, আমি প্যাচম্যানের দোকানে মাস কয়েক কাজ করি। ওর বেশিরভাগ খদ্দেরকে আমার নিজেকেই সামলাতে হয়েছে। সত্তর বছরের বুড়ো মানুষ একা আর

কত পরিশ্রম করতে পারে ? খুব কমই সে অফিসে আসত। মাসে দু'তিন দিন। নেলী যেদিন ঘটনাটা ঘটায় সেদিন প্যাচম্যান আসেনি অফিসে।

'ওই দিন ছিল মঙ্গলবার, সকাল। অফিস সেক্রেটারী রুথকে কফি আনতে বাইরে পাঠিয়েছিলাম। তারপর নেলী এসে ঢোকে দোকানে। স্পোর্টস জ্যাকেট পরা তরুণ নেলীকে ভদ্র এবং অভিজাত ঘরের সন্তান বলেই মনে হচ্ছিল। অবশ্য পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে খদ্দের বোঝা মুশকিল। অনেক ফকিরনী চেহারার কাষ্টমারকে হাজার টাকার মাল কিনতেও দেখেছি। তো যা বলছিলাম। নেলীর প্রতি আমার সন্দেহ শুরু হয় যখন ও কি কিনবে তা বলতে না পেরে তোতলাতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত পরিষ্কার হলো সে এনগেজমেন্ট রিং-এর জন্য কিছু এমারেল্ড কাট ষ্টোন কিনতে চায়। তাই ওগুলো একটু দেখবে। আমি একটা ট্রেতে করে কিছু পাথর রাখলাম কাউন্টারের ওপর, ফুট অ্যালার্মের কাছেই থাকল ট্রেটা। নেলী নিশ্চয়ই আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিল। তাই সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে পিস্তল বের করল সে।'

'সত্যি বলতে কি পিস্তল দেখেই আমার পা কাঁপা শুরু হয়ে গিয়েছিল। নেলীর সঙ্গে তর্ক করার প্রশ্নই ছিল না। তাছাড়া আমি জানতাম দোকানটা প্যাচম্যানের ইনসিওরেন্স করা। ডাকাতি হলেও ক্ষতিপূরণ সে পাবে। আর বাধা দিয়ে নিজে খুন হতেই বা যাব কোন দুঃখে। কারণ হাতাহাতির অভ্যাস আমার কোনোকালেই ছিল না। তাই নীরবে চেয়ে দেখলাম নেলী সবুজ পান্নাগুলো কি দ্রুত পকেটে পুরে ফেলল। তারপর সে আমাকে ড্রয়ার খুলে আরো কিছু স্টোন বের করতে বলল। কথা বলার সময় নেলীর পিস্তল ধরা হাতটা কাঁপছিল খুব, আমিও কাঁপুনির চোটে দাঁড়াতে পারছিলাম না ঠিকমতো। ওর নির্দেশমতো ড্রয়ার খুলে দ্বিতীয় ট্রে বোঝাই স্টোন কাউন্টারের ওপর রাখতে গেলাম। কিন্তু হাত ফস্কে ট্রেটা পড়ে গেল মাটিতে। ছড়িয়ে পড়া সবুজ পাথরগুলো তুলতে গেছি, আমার হাত অ্যালার্ম বেলের খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল, নেলী নিশ্চয়ই ভেবেছিল আমি বেল টিপতে যাচ্ছি, তাই গুলি করে বসলো ও।'

'তারপরের কথা আমার বিশেষ মনে নেই। জ্ঞান হারাবার পূর্ব মুহূর্তে দরজায় ছুটন্ত পদশব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। তারপর অ্যাম্বুলেন্সে আমার জ্ঞান ফিরে আসে। আমাকে হাসপাতালে, অপারেশন টেবিলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, অস্পষ্ট মনে আছে। তারপর আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। জ্ঞান ফেরার পরে পুলিশ জানায় নেলী ডাকাতি করে পালাতে পারেনি, হাতেনাতে ধরা পড়েছে চোরাই মাল সহ। অবশ্য ফোরটি সেভেনথ স্ট্রিটের ওই বিল্ডিং-এর প্রবেশ এবং বেরুবার পথ একটাই বলে তার শেষ রক্ষা হয়নি। পরদিন জানতে পারলাম অপারেশন করেও কাজ হয়নি ডাক্তাররা আমার বুকে বিদ্ধ বুলেট বের করতে পারেননি।

'তারপর আমার জীবনের দুঃস্বপ্নের সময় শুরু হলো। শয়তানটা আমার বুক লক্ষ্য করে গুলি করেছিল। একটুর জন্য গুলিটা হার্ট আর লাংস ছোঁয়নি। কিন্তু বুকের এমন এক জায়গায় ওটা আটকে গেছে, শরীরের প্রধান কোনো অঙ্গের ক্ষতি না করে বুলেট

অপসারণ অসম্ভব। ডাক্তাররা আমাকে বুকের এক্সরে রিপোর্ট দেখালেন, শরীর বিদ্যা সম্পর্কে অনেক বড় বড় লেকচারও দিলেন। আমি বুঝলাম, বুকের খাঁচায় বিঁধে থাকা বুলেট যেদিন কোন কারণে আলগা হয়ে পড়বে সেদিনই আমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবি।'

'ডাকাতি এবং গুলি করার অভিযোগে নেলীকে যখন আদালতে সোপর্দ করা হয় তখন আমি হাসপাতালে। বিশেষজ্ঞরা প্রায় নিয়মিত আসতেন আমার কাছে আর এক্সরে রিপোর্ট দেখে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে চলে যেতেন। সাংবাদিকরা এসে প্রশ্ন করতেন বুকের মধ্যে জ্যান্ত মৃত্যু পুষে রাখতে আমার কেমন লাগছে। তারপর একদিন নেলীকে পুলিশ আমার কাছে নিয়ে এলো আইডেন্টিফাই করতে। নেলীকে দেখামাত্র চিনে ফেললাম। এই ছোঁড়াই আমাকে গুলি করেছিল।'

'তারপর আদালতে ওর বিচার শুরু হলো। এদিকে ডাক্তাররা দেখলেন আমার আর কোনো আশা নেই। হাল ছেড়ে দিয়ে ওঁরা হাসপাতাল থেকে আমাকে রিলিজ করে দিলেন। আমাকে সাবধানে চলাফেরা করতে বলা হলো; ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পরামর্শ দিলেন ওঁরা, আর পইপই করে বললেন যেন পরিশ্রমের কোনো কাজ না করি। যত কম পরিশ্রম করব তত বেশি আমার আয়ু। কিন্তু এগুলো স্রেফ মৌখিক সান্ত্বনা, বুঝতে পারতাম আমি। জানতাম সাক্ষাৎ মৃত্যু আমাকে পেয়ে বসেছে। এর হাত থেকে কোনো নিস্তার নেই। আজ হোক, কাল হোক আর এক বছর পরেই হোক-মৃত্যু আমার সুনিশ্চিত।

'ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি জানতে চাইলেন মামলায় স্বাক্ষ্য দেব কিনা। বললাম অবশ্যই দেব। নেলী কঠিন শাস্তি পাক এটাই ছিল তখন আমার একমাত্র কামনা। আর আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে নেলীকে তার প্রাপ্য শাস্তির পাওনা মিটিয়ে দিতে পারি। সেই দিনটির কথা জীবনেও ভুলব না। আদালতের অর্ধেক জুড়ে ছিল নেলীর আত্মীয়-স্বজন। যেন কেয়ামত নেমে আসছে এইভাবে সবাই হাপুস নয়নে কাঁদছিল। নেলীর লোকজনদের বেশভূষা দেখে মনে হচ্ছিল সবাই সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান। হয়তো অতিরিক্ত আদরে অকালেই বখে গিয়েছিল নেলী। ডিফেন্স অ্যাটর্নি নেলীর স্বপক্ষে যুক্তি দেখাতে চেয়েছিলেন অল্প বয়সের কথা উল্লেখ করে। কিন্তু যেই আমি স্বাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালাম তখন সব ঠাণ্ডা। কোনো যুক্তিই ধোপে টিকলো না।

'বিচারে কি রায় হয়েছে আপনি তো জানেনই। ত্রিশ বছরের জেল হয়ে গিয়েছে নেলীর। খুনীটাকে আসলে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসানো উচিৎ ছিল। কিন্তু কৌশলগত কিছু সমস্যার কারণে নেলীর ফুল পানিশমেন্ট হয়নি, বিশেষ করে যতদিন আমি বহাল তবিয়তে বেঁচে আছি।'

'কিন্তু নেলীর নিস্কৃতি সহজেই মিলবে না। যদি বুলেটটা আমার বুকের মধ্যে বিঁধে না থাকত তাহলে নেলী হয়তো পূর্ণ শাস্তি থেকে রক্ষা পেত। মানে ত্রিশ বছর ওকে জেলে কাটাতে হতো না। বুড়ো হওয়ার আগেই জামিনে মুক্তি পেত। কিন্তু এই বুলেটটাই নেলীর এখন সবচেয়ে বড় শত্রু। কারণ বুলেটটা দ্রুত আমার আয়ু ক্ষয় করে চলেছে। আর যেদিন আমি মারা যাব, আদালতের আইন অনুযায়ী নেলীও সেদিন খুনী

বলে সাব্যস্ত হবে। তার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হবে। তখন নেলীকে ইলেকট্রিক চেয়ারের হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। যদি অন্য কোনোভাবে আকস্মিক আমার মৃত্যু ঘটে শুধু তাহলেই সে রক্ষা পেতে পারে।'

'ব্যাপারটা খুব কৌতুককর, তাই না, সাংবাদিক সাহেব ? আমার শত্রু এখন জেলে বসে আমার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছে। কিন্তু ডাক্তার বলেছেন আমার আরোগ্য হওয়ার কোনো সুযোগই নেই। আমি মারা যাওয়া মাত্র নেলীর বিরুদ্ধে ফার্স্ট ডিগ্রী মার্ডার চার্জ আনা হবে আদালতে। আর এই চার্জ থেকে নেলীর মুক্তির কোনোই আশা নেই।'

'আর এটাই এখন আমার একমাত্র সান্ত্বনা। আমার যখন সময় আসবে তখন নেলীরও দিন ফুরাবে। তবে এতে খুব একটা সুখী হওয়ার কিছু নেই-কিন্তু আমার জায়গায় আপনি হলে আপনার অনুভূতিও আমার মতোই হতো।'

কথা বলতে বলতে আস্তে আস্তে পায়চারী করছে জো হারপার। খোলা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, তাকালো বাইরে। সন্ধ্যা নামছে, বেগুনি আকাশের সামিয়ানায় এখানে ওখানে ফুটকির মতো তারা ফুটতে শুরু করেছে। ওদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল জো হারপার।

'ব্যাপারটা সত্যি কঠিন', গম্ভীর স্বরে বলল বব মিলান। 'আপনার গল্প শুনে সত্যি আমার দুঃখ হচ্ছে, মিঃ হারপার।'

'না', বলল সাংবাদিক। 'কিছু আসে যায় তা আমি বলছি না।' হারপারের পেছনে চলে এলো সে, হাত রাখল কনুইতে। 'তবে আপনার জন্যেও আমার দুঃখ হয়।' আবার বলল সে। তারপর ধাক্কা দিল সে হারপারকে। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল হারপার, ডিগবাজী খেয়ে চব্বিশ তলা দালানটা থেকে পড়ে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে আতঙ্কের বদলে তার চোখে নিখাদ অবিশ্বাস আর বিস্ময় দেখল বব মিলান।

'আমি সাংবাদিক নই', ওলোট পালোট খেয়ে নেমে যাওয়া শরীরটার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল সে। 'আমার নাম বব মিলানও নয়। আমি ফ্রেড নেলী। ফ্রাঙ্ক নেলীর বড় ভাই।'

গ্রানিস বার্থডে

ফ্রেডরিক ব্রাউন

হালপারিনদের পরিবারটি বিরাট। যৌথ হলেও এই একটি পরিবার যেখানে কারও সাথে কারও কোন গন্ডগোল নেই, সংঘাত নেই। স্মিথ মনে মনে ঈর্ষাই করে এই পরিবারটিকে। বোধহয় নিজের কোন পরিবার নেই বলেই।

আজ দাদিমা হালপারিনের আশিতম জন্মদিন। ঢঙ দেখে আর বাঁচি না, মনে মনে ভাবে স্মিথ। কে কবে শুনেছে অজ পাড়াগাঁয়েও আশি বছরের বুড়ির জন্মদিন ঘটা করে পালন করা হয়! নাহ্, 'ঘটা করে' বলাটা বোধহয় ঠিক হল না। এই জন্মদিন আসলে পালন করছে শুধু ওই জন ক্রস না কি যেন নাম, ওকেই দেখা যাচ্ছে। ছেলেটা দাদিমার বড় নাতি হ্যাংক হালপারিনের বন্ধু-টন্ধু হবে বোধহয়।

জন্মদিনের পার্টিতে সবাই উপস্থিত। দাদিমার পাঁচ ছেলে এক মেয়ে। পাঁচ ছেলের পাঁচ বৌ, মেয়ে জামাই, চার নাতি, সব মিলে ষোলো জন। তবে বাচ্চাদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ওরা লেকে গেছে নৌকা চড়তে।

পুরোদমে আয়োজন চলছে খানাপিনার। একটা ভেড়া জবাই করা হয়েছে, টার্কিগুলোর ছাল ছড়ানো হচ্ছে। মেয়েরা সব রান্নায় ব্যস্ত। ছেলেরা এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। গল্প করছে।

দাদিমা তাঁর সিংহাসনের মতো চেয়ারে বসে ওয়াইনের গ্লাসে মৃদু চুমুক দিচ্ছেন আর উজ্জ্বল চোখে লক্ষ করছেন সবাইকে। মৃদু হাসির রেখা ফুটে আছে তাঁর ঠোঁটে।

দাদিমা দেখতে ছোটখাট, তবে প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। স্মিথ জানে, এ গাঁয়ের সবচাইতে প্রভাবশালী পরিবার হালপারিনরা। এদের কথায় এখনও বাঘে মোষে এক ঘাটে পানি খায়। পরপর তিনবার তিনি এখানকার শেরিফের পদে দাঁড়িয়েছেন। তিনবারই জয়ী হয়েছেন। লোকে গোপনে বলাবলি করে আসলে টাকা দিয়ে তিনি সব ভোট কিনে নিয়েছেন। তবে প্রকাশ্যে এই কথা বলতে কেউ সাহস পায় না। কারণ, লোকের ধারণা, শহরের সবচাইতে কুখ্যাত ক্রিমিনাল দলটির সঙ্গে হালপারিন পরিবারের গোপন যোগাযোগ আছে। তিনি ওদের নিয়মিত মাসোহারা দেন। স্থানীয় প্রশাসনকেও তিনি নাকি টাকা খাইয়ে মুখ বন্ধ করে রেখেছেন। তবে এই কথা প্রকাশ্যে বলার মতো বুকের পাটা কারও নেই ? কে আর বেঘোরে জানটা খোয়াতে চায় ? তবে কেউ বেঘোরে জান খুইয়েছে কিনা শোনেনি স্মিথ। অনেকদিন ধরে সে হালপারিন পরিবারের আইনজীবী হিসেবে কাজ করছে। কই হালপারিনদের কোন দুর্নীতি তো তার চোখে আজতক পড়েনি। বরং দেখেছে লোকজন দাদিমার কাছে কোন সাহায্যের জন্যে এলে তিনি না করেন না। তারপরও লোকজন দাদিমাকে কেন ভয় পায় বুঝতে পারে না সে।

আশি বছর বয়সে জন্মদিন করার প্ল্যানটা দাদিমার বড় নাতি হ্যাংকের। তবে তিনি একটা শর্ত দিয়েছেন, বাইরের কাউকে দাওয়াত করা চলবে না। সম্পূর্ণ ঘরোয়াভাবে জন্মদিন পালন করতে হবে। কিন্তু জন ক্রসই সেদিন ওর নানীর জন্মদিনে স্মিথকে নিয়ে গিয়ে খুব বড়াই করে বলেছিল, 'দ্যাখ, আমরা নানীর জন্মদিনও করি। কিন্তু তোরা গাঁইয়া ভূতরা তো এ-ধরনের কারও জন্মদিনের কথা কল্পনাও করতে পারিস না।' ক্রস কথাটা হেসে বললেও হ্যাংকের খুব লেগেছিল। ক্রস সবদিক থেকে তাকে টেক্কা মারবে এ কেমন করে হয় ? তখনই সে ঠিক করে তার দাদীর জন্মদিন করতে হবে, আর এমন ধুমধাম করবে যাতে ক্রসের চোখ ট্যারা হয়ে যায়। অবশ্য ওদের বাড়িতে ঢোকার আগেই ক্রসের চোখ ট্যারা হয়ে গেছে। হ্যাংকদের বাড়িটাকে ছোটখাট একটা জমিদার বাড়িই বলা চলে। হালপারিনদের গ্রামের শেষ মাথা থেকে শুরু হয়েছে বিশাল বনভূমি। এটা ওদের দাদীমার সম্পত্তি। গ্রামের হাইস্কুলটাও ওর দাদীর নামে। ক্রস দেখেছে উঠতে বসতে লোকজন সালাম করে হ্যাংকের দাদীকে। সেই সালামে থাকে ভয় মেশানো শ্রদ্ধা। ছোটখাট এই মানুষটাকে সবাই কেন এতো ভয় পায় বুঝতে পারে না ক্রস। অত্যন্ত অমায়িক ব্যবহার দাদীমার। হ্যাংকের বন্ধু শুনে তিনি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। আজ চারদিন ক্রস হ্যাংকদের বাড়িতে। অবাক হয়ে লক্ষ করেছে একমাত্র হ্যাংক বাদে আর সবাই যেন দাদীমার ভয়ে জড়োসড়ো। হ্যাংকের বাবা আর চাচারা তাঁর প্রতিটি কথা পালন করছেন নীরবে। এমন তো নয় তিনি সব সময় মেজাজ দেখান ওদের সাথে। তবুও ওরা এরকম আড়ষ্ট হয়ে থাকে কেন মাথায় ঢোকে না ক্রসের। বুড়ো লোকটির মধ্যে রহস্যময় কি যেন একটা আছে, ঠিক ধরতে পারছে না সে। হ্যাংক বলেছে, 'দূর দূর। রহস্য-টহস্য আবার কি ? ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি দাদীমাকে সবাই ভয় পায়। কেন ভয় পায় আমি নিজেও জানি না। তবে দাদীমার সাথে আমি কিন্তু খুব ফ্রি, তাই না ?'

তা হ্যাংক ফ্রিই বটে। দাদীমার সাথে তার সম্পর্ক বন্ধুর মত। দাদীমাও তাঁর এই নাতিটিকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখেন। তাঁর একটা ছেলেও স্কুলের গন্ডি পেরোতে পারেনি। অথচ হ্যাংক কিনা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জায়গায় পড়ছে। বড় নাতিটির সব আবদার তিনি মেনে নেন হাসিমুখেই। সে যখন এবার খুব করে ধরল তাঁর জন্মদিন করতে হবে, না করতে পারেননি দাদীমা। অন্য কেউ বললে তিনি হয়ত রাজি হতেন না। সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশের এই অনুষ্ঠানটি তিনি বেশ উপভোগ করছেন। ইচ্ছে করেই বাইরের কাউকে দাওয়াত করেননি। আর সত্যি বলতে কি, তিনি এই গ্রামের কাউকে তাঁর জন্মদিনে অতিথি হওয়ার মতো যোগ্য মনে করেন না। স্মিথের ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা। সে গতকাল বিকেলে লন্ডন থেকে এসেছে ওখানে একটা প্লট কেনার ব্যাপারে আলাপ করতে। দাদীমা ঠিক করেছেন লন্ডনে ছয়তলা একটা ফ্ল্যাট তুলবেন। তাঁর ছয় ছেলেমেয়েকে ওটা দান করবেন। ওরা তাঁর মৃত্যুর পর যদি এই গ্রামে থাকতে না চায় তাহলে লন্ডনে গিয়ে থাকবে। অবশ্য ওদের লন্ডন থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কারণ তাঁর প্রতিটি ছেলেই অকর্মার ধাড়ি। কোন কাজ

করে না, খালি খায় দায় ঘুমায় আর আড্ডা মারে। সংসারের কোন চিন্তা নেই। এতো সুখের নিবাস ছেড়ে ওরা দেশের বাইরে যাবে বলে মনে হয় না। তবে কিনা বসে খেলে রাজার ধনও ফুরায়। তাই বাড়ি করার পরিকল্পনা করেছেন দাদীমা। বিশাল ফ্ল্যাট করবেন। ওটা থেকে প্রতিমাসে যা ভাড়া আসবে তা দিয়েই তাঁর অকর্মার ধাড়িগুলো দিব্যি খেয়ে পরে বাঁচতে পারবে।

দাদীমা হাতছানি দিয়ে ডাকলেন স্মিথকে। স্মিথ কাছে আসতে জানতে চাইলেন, 'জমিন কিনতে তোমার কয়দিন সময় লাগবে ?'

'লন্ডন গিয়ে সপ্তাহখানেকের মধ্যে সব ফর্মালিটিজ সেরে ফেলতে পারব, দাদীমা।'

'অ, ভেরীগুড। কোন ঝামেলা হইবে না তো ?'

'জ্বী না, দাদীমা। কোন ঝামেলা হবে না।'

'তয় বাড়িডা বানাইবে কেডা ?'

'নামকরা এক আর্কিটেক্টের সাথে আমি কথা বলেছি, দাদীমা। উনি বাড়িটা কেমন হবে, কোন স্টাইলে হবে, এসব ছক এঁকে দেবেন।'

'হ, ভাল স্টাইলে বাড়িডা বানাইতে হইবে। লোকে যেন দেইখ্যা কয় এইডা হালপারিনদের বাড়ি।'

'জ্বী, দাদীমা।'

এই সময় চড়া গলার আওয়াজ শুনে দোতলার ঝুল-বারান্দার দিকে তাকালেন দাদীমা। জোরে কথা বলা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। ঝুল-বারান্দার রেলিংয়ে পা ঝুলিয়ে বসেছে হ্যাংক আর তার বন্ধু জন ক্রস। কি একটা ব্যাপার নিয়ে ওদের মধ্যে খুব তর্ক হচ্ছে। ক্রমেই গলার স্বর উঁচুতে উঠছে দু'জনের। ওরা আবার মারামারি শুরু করে না দেয়, ভাবলো স্মিথ। তরুণ রক্ত হঠাৎই গরম হয়ে ওঠে।

'স্মিথ পোলাপানগুলারে একটু আস্তে কথা কইতে কও। ঐহানে বসার কি দরকার। পইড়া গেলে তো মাথা ফাইটটা ছাতু হইয়া যাইবে।'

স্মিথ পা বাড়িয়েছে, এই সময় ঘটনাটা ঘটলো। হঠাৎ ক্রুদ্ধ একটা চিৎকার করে হ্যাংক প্রচন্ড ঘুসি মারল ক্রসের মুখে। ক্রস টাল সামলাতে না পেরে ডিগবাজি খেয়ে নিচে, শক্ত চাতালে ছিটকে পড়ল। পড়ার পূর্বমুহূর্তে আকাশ ফাটানো আর্তনাদ করে উঠেছিল ক্রস, তারপর সব চুপ।

দৌড়ে গেল স্মিথ ক্রসের কাছে। চিৎ হয়ে পড়ে আছে ক্রস। চোখ দুটো খোলা স্থির। ঝুঁকে পালস রেট পরীক্ষা করল স্মিথ। নেই, মাথার পেছন থেকে রক্তের মোটা একটা ধারা নেমে আসছে।

সোজা হয়ে দাঁড়াল স্মিথ। রক্তশূন্য হয়ে গেছে মুখ। ভাঙা গলায় বলল ও, 'মারা গেছে! ছেলেটা মারা গেছে!'

এই সময় হ্যাংক এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্রসের ওপর। চৌচির হয়ে যাওয়া রক্তমাখা খুলি দেখে যা বোঝার বুঝে নিল সে। মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ, বিকৃত কণ্ঠে কান্নায় ভেঙে পড়ল। 'মরে গেছে! দাদী, ক্রস মরে গেছে! বিশ্বাস করেন, আমি ওকে মারতে চাইনি কিন্তু ও আমাকে...।'

দাদীমা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। লাশটার দিকে একপলক তাকালেন, হাসির রেখা মুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল তাঁর। কর্কশ গলায় কথা বলে উঠলেন তিনি, 'ও-ই তোরে আগে মারছে, হ্যাংক। আমি নিজের চউখে দেখছি। আমরা সবাই দেখছি। দেখি নাই ?'

ঘুরলেন তিনি, শেষ কথাটা বললেন স্মিথকে লক্ষ্য করে। তাঁর চোখে স্পষ্ট শাসানী।

স্মিথ অস্বস্তিতে নড়ে উঠল। 'আ-আমি ব্যাপারটার শুরু ঠিক লক্ষ করিনি, দাদীমা।'

'অবশ্যই করেছ', ধমকে উঠলেন দাদীমা। 'তুমি অগো দিকে তাকাইয়া ছিলা, স্মিথ।'

স্মিথ কোন জবাব দেয়ার আগে হ্যাংক কথা বলে উঠল, 'দাদী, আ-আমি খুব দুঃখিত। আমার-আমার মাথায় এমন রক্ত চড়ে গেল...ও খোদা, আমার নির্ঘাৎ ফাঁসি হবে... ।'

'চুপ কর, হ্যাংক। কান্দিস না', নরম গলায় বললেন দাদীমা। স্মিথের দিকে ঘুরে বললেন, 'ও ধরা পড়লে অর ফাঁসি হইবে, না স্মিথ ?'

'জ্বী।'

'আর যদি ধরা না পড়ে ?'

'মানে ?'

'যদি পুলিশ জানতে না পারে হ্যাংকের কারণে ওই ছ্যামরাডা মরছে, তাইলে ?'

'তাহলে হ্যাংকের কিছুই হবে না। কিন্তু তা কি করে সম্ভব ? এই রকম একটা জলজ্যান্ত... ।' 'চুপ। আর কোন কথা না। তুমি না কইলে পুলিশের বাবারও সাধ্য নাই কিছু করে। কিন্তু তোমারে আমি চিনি স্মিথ। তুমি উপরে উপরে যতই ভক্তি দেখাও, সুযোগ পাইলে আমাগো ক্ষতি তুমি ঠিকই করবা।'

'একি বলছেন, দাদীমা! আমি আপনাদের ক্ষতি করতে যাব কেন ?' প্রতিবাদ করল স্মিথ। 'চুউপ!' প্রচন্ড জোরে ধমকে উঠলেন দাদীমা।

'তোমারে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। তুমি একবার শহরে গেলে পুলিশের কাছে এই কথা ফ্লাশ করবা না, এইডা আমারে বিশ্বাস করতে কও ?'

'কিন্তু বাবা', বলল হ্যাংকের বাপ, 'আমাগো তো...'

'তুইও চুপ থাক, বিল। আমি যা কই এহন চুপ মাইরা শোন হগলডি। বেবাক ঘটনা আমি নিজের চউক্ষে দেখছি। তোমরাও দেখছ। আসল ঘটনা কি ঘটলো ? এই স্মিথ আর হ্যাংকের বন্ধুটা ওই দোতলার বারান্দায় খাড়াইয়া কি কারণে জানি মারামারি বাজাইছে। দুইজনেই জড়াজড়ি কইর‍্যা ব্যালকনি দিয়া পইর‍্যা যাইয়া মাথা ফাইটটা মরছে। পুলিশ আইলে আমরা অগো এই কথাই কমু। আমি আমার নাতি হ্যাংকরে কিছুতেই জেলে যাইতে দিমু না। আমাগো ফোরটিন জেনারেশনেও কেউ কোন দিন জেলে যায় নাই। আর কোনদিন যাইবেও না। হ্যাংক, তুই একটা কাম কর। লাশটারে

আরও কয়েকখান ঘুসিটুসি মার, যাতে দেইখ্যা মনে হয় তোর বন্ধু খুব মাইর খাইছে। আর তোমরা হগলডি স্মিথরে ধইর‍্যা দোতলার বারান্দায় লইয়া যাও ,হেরপর... ।'

হ্যাংক ছাড়া হালপারিন পরিবারের বাকি সবাই এবার বৃত্ত করে এগিয়ে যেতে লাগল স্মিথের দিকে। দাদীমা তার চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

বৃত্তটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। সবার চোখে খুনের নেশা। কোথাও কোন শব্দ নেই। দাদীমার চোখে চোখ পড়ল স্মিথের। অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখে তিনি তাকিয়ে আছেন স্মিথের দিকে। হঠাৎ মৃদু শব্দ করে হেসে উঠলেন তিনি। হ্যাংকের বাবা হাতের মুগুরটা মাথার উপর তুলল। শেষ মুহূর্তে এতিম স্মিথের চোখে ভেসে উঠল মরা মায়ের মুখটা। তারপরই বিদ্যুৎবেগে মুগুর নেমে এলো ওর মাথার ওপর।

ক্যাপ্টিভ অডিয়েন্স

জ্যাক রিচি

অ্যাডাম কার্লসনের কানে ভেসে এলো দুরাগত কুকুরের ক্ষীণ চিৎকার, পনের সেকেন্ড পর একটি প্লেনের শব্দ শুনতে পেল সে। ইঞ্জিনের আওয়াজ ক্রমশ বেড়েই চলল। অ্যাডাম টের পেল প্লেনটা বাড়ির ছাদের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। মাথার ওপর শেডহীন বাল্বের আলোয় ঘড়ি দেখল সে। রাত ২:৩২।

চৌকিতে উঠে বসল অ্যাডাম, ঘাড় ঘুরিয়ে আরো একবার দেখল চারপাশ। ঘরটা বারো বাই চৌদ্দ ফুট। জানালা নেই, কংক্রিটের কঠিন দেয়াল, দরজাটা ভারী ওক কাঠের। প্রায় সাউন্ড প্রুফ ঘর, তবে একেবারে শব্দহীন নয়। কুকুরটা সম্ভবত কাছে পিঠে কোথাও আছে। এখানে কতক্ষণ ধরে সে আছে ? মনে হয় যেন অনেকদিন। আসলে এ ঘরে অ্যাডামের অবস্থান মাত্র আট ঘন্টা হলো। সন্ধ্যা থেকে সে এখানে আছে। জানে না আরও কতক্ষণ থাকতে হবে। কিংবা এর শেষ কোথায়।

সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে গ্যারেজে গাড়ি ঢোকাতে যাচ্ছে অ্যাডাম, এমন সময় অন্ধকার ফুঁড়ে বেরোয় ওরা দু'জন। হাতে বন্দুক মুখে মুখোশ।

ভয় পায়নি অ্যাডাম, তবে অবাক হয়েছে বেশ। মাথার ওপর হাত তুলে বলেছে, 'টাকা পয়সা যা আছে নিতে পার। কিন্তু ওয়ালেটটা রেখে যেয়ো।' ওয়ালেটে ওর ড্রাইভিং লাইসেন্স, বিভিন্ন কার্ডসহ আরও দরকারি কিছু কাগজপত্র ছিল। এগুলো হারালে মুশকিল।

কিন্তু মুখোশধারী অ্যাডামের টাকা-পয়সা কিংবা ওয়ালেটের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখাল না। লম্বা, বলিষ্ঠ গড়নের লোকটা পিস্তল নেড়ে ইঙ্গিত করল অ্যাডামকে। সামনে বাড়তে হবে। অ্যাডাম একবার ভেবেছিল চিৎকার করবে। কিন্তু লাভ হবে না কোনো। কারণ বাড়িতে হাউসকিপার মিসেস রেগান ছাড়া কেউ নেই। আর চিৎকার দিলে নিশ্চয়ই ওরা গুলি করবে। তাই ঝুঁকিটা নেয়নি অ্যাডাম।

দুই মুখোশধারী অ্যাডামকে হাঁটিয়ে নিয়ে এলো ড্রাইভ ওয়ের পেছনে, দু'টো গেট পোষ্ট পার হয়ে নির্জন রাস্তার একধারে পার্ক করা একটা কালো সেডানের সামনে এসে দাঁড়াল।

অ্যাডামের চোখ বেঁধে ফেলল ওরা, গাড়ির পেছনের ফ্লোরে শুতে বাধ্য করল। প্রথম দিকে রাস্তার দিক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিল অ্যাডাম। কিন্তু ওরা এতো বেশি মোড় ঘুরল যে হাল ছাড়তে বাধ্য হলো সে।

ঘন্টাখানেক পর থামলো গাড়ি। অ্যাডামের হাতের দড়ি খুলে ফেলা হল। চোখ বন্ধ অবস্থায় তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো একটি রাস্তা দিয়ে, তারপর দরজা খোলার শব্দ শুনল অ্যাডাম। একসার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো ওরা। তারপর ঢুকলো এই ঘরে।

চোখের বাঁধন খুলে ফেলা হলে প্রথমে কিছুক্ষণ উজ্জ্বল আলোতে কিছুই দেখল না অ্যাডাম। তারপর চোখ পিট পিট করে সয়ে নিল আলো। একটা চৌকি, একখানা চেয়ার, টেবিল, টেবিলের ওপর এক টুকরো কাগজ আর কলম। ব্যস, আর কিচ্ছু নেই ঘরে।

লম্বা লোকটা এই প্রথম মুখ খুলল। 'বসো' আদেশ করল সে। 'তোমার স্ত্রীকে একটা চিঠি লিখতে হবে। আমাদের দুই লাখ ডলার চাই।'

বিস্মিত চোখে তাকালো অ্যাডাম লোকটার দিকে। 'দুইলাখ ডলার ?'

মুখোশের আড়ালে সম্ভবত হাসলো লম্বু। 'ঠিক তাই, মিষ্টার। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ কেন আমরা তোমাকে এখানে ধরে এনেছি।'

ঠোঁট কামড়াল অ্যাডাম। 'আমার স্ত্রী গত সপ্তাহে ইউরোপে গেছে ওর মা'র সঙ্গে।'

মুখ চাওয়া চাওয়ি করল দু'জন। ওদের কি একটু বিভ্রান্ত মনে হলো ? লম্বু পিস্তল তাক করল, 'তাতে কিছু যায় আসে না', স্পষ্ট হুমকি তার কণ্ঠে। 'আমাদের দুই লাখ ডলার অবশ্যই চাই। কিভাবে যোগাড় করবে তা জানি না। কিন্তু টাকাটা আমাদেরকে দিতেই হবে।'

টেবিলে এসে বসল অ্যাডাম। 'হ্যারল্ড ব্যারিষ্টার। আমার আইনজীবী এবং দীর্ঘদিনের পরামর্শদাতা। ওকে লিখতে পারি।'

আবারও পিস্তলটা নড়ল। 'তাহলে দেরী করছ কেন ? কলম নাও। আর আমি যা বলি তা লেখো।'

লিখল অ্যাডাম:

প্রিয় হ্যারল্ড,

আমার জন্য একশ ডলারের নোটে দু'লাখ টাকা এখুনি যোগাড় করো। আর কি করতে হবে আমি ফোনে জানাব। পুলিশকে কিছু জানাবে না। যদি জানাও তাহলে আমাকে আর জীবিত দেখতে পাবে না।

অ্যাডাম কার্লসন।

লম্বু মুখোশধারী চিঠি পড়ে মাথা ঝাঁকাল। বেরিয়ে গেল বেঁটে সঙ্গীকে নিয়ে। দড়াম শব্দে বন্ধ হলো দরজা।

আর তারপর থেকে অ্যাডাম এই ঘরে বন্দী। আলোটা চোখে বড় জ্বালা দিচ্ছে। চোখ বুজলো সে। ডুবে গেল গভীর চিন্তায়।

টাকা পাবার পরে ওরা কি তাকে খুন করবে ? কিন্তু খুন করার ইচ্ছে থাকলে মুখোশ পরে আছে কেন ? নিশ্চয়ই নিজেদের পরিচয় লুকাতে চাইছে। যাতে অ্যাডাম ওদের চিনতে না পারে। তার মানে অ্যাডাম ওদেরকে চিনে ফেললেই বিপদ। মুখোশধারীদের পরিচয় প্রকাশিত হলে মৃত্যু অবধারিত।

হঠাৎ দরজায় চাবি ঘোরানোর শব্দে জেগে গেল অ্যাডাম। ঘড়ির দিকে চাইল। আটটা পঁচিশ। আগডুম বাগডুম ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে তাই মনে নেই। বুকের ধড়ফড়ানি স্পষ্ট টের পেল অ্যাডাম।

একটা ট্রে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো বিশালদেহী, লম্বা লোকটা। এখনও মুখে মুখোশ।

'তোমার নাস্তা', বলল সে।

কাল রাত থেকে এক ফোঁটা দানা পড়েনি পেটে। বুভুক্ষের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল অ্যাডাম। কয়েক মিনিটে চেটে পুটে সাফ করে ফেলল প্লেট। চোখ বাঁধার কাপড়টা বের করল লম্বু অ্যাডামের খাওয়া শেষ হলে। 'অফিসে ফোন করতে হবে তোমাকে। সেক্রেটারীকে বলবে কমপক্ষে এক সপ্তাহ তুমি অফিসে যাবে না। বলবে বাইরে কোথাও ঘুরতে যাচ্ছ।'

চোখ বেঁধে অ্যাডামকে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল সে।

'তোমার নাম্বার কত ?' জানতে চাইল লম্বা লোকটা।

অ্যাডাম নাম্বার বলল ওকে। ডায়াল করার শব্দ শুনল। ওর হাতে গুঁজে দেয়া হলো ফোন। অ্যাডামের সেক্রেটারী মেজ জবাব দিল ওধারে। 'মেজ' বলল অ্যাডাম। 'আমি সপ্তাহখানেক অফিসে যেতে পারব না। ছুটি কাটাতে যাচ্ছি বাইরে।'

'জ্বী, স্যার', বলল সে। 'কিন্তু প্রয়োজনে আপনার সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ করব ?'

তোমাকে যোগাযোগ করতে হবে না।' বলল অ্যাডাম। 'সব কাজ আপাতত বন্ধ রাখো। আর আমার সমস্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যান্সেল করে দাও।'

লম্বু ফোন কেড়ে নিল ওর হাত থেকে, 'তোমার অন্তর্ধানে আর কে কে তোমার জন্য চিন্তা করতে পারে ? কিংবা পুলিশে খবর দিতে পারে ?'

একটু ভেবে অ্যাডাম বলল, 'ঠিক সময়ে বাড়ি না ফিরলে হাউজকীপার চিন্তা করবে।' লম্বুকে বাড়ির ফোন নাম্বার দিল সে। আবার কথা বলতে হলো ওকে।

'মিসেস রেগ্যান ?'

'জ্বী' জবাব দিল হাউজকীপার। 'মিঃ কার্লসন বলছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কোত্থেকে বলছেন, স্যার ? সকাল বেলায় নাস্তা খেয়ে বাড়ি ফিরলেন না দেখে খুব চিন্তায় পড়েছি। জেমসকে আপনার খোঁজে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ও আপনার কোনো সন্ধান করতে পারেনি। বলল আপনি নাকি কাল রাতে বাসায় ফিরেছিলেন। কারণ আপনার সবগুলো গাড়ি গ্যারেজে।'

'হ্যাঁ, বাসায় ফিরেছিলাম।' বলল অ্যাডাম। 'কিন্তু সকালেই আবার বেরিয়ে পড়েছি। আমার এক বন্ধু আমাকে গেট থেকে তুলে নিয়েছে।' সে শ্বাস টানলো বড় করে। 'মিসেস রেগ্যান আমি সপ্তাহখানেক দেশে থাকব না। ছুটি কাটাতে যাচ্ছি বাইরে।'

'ঠিক আছে', বলল হাউজকীপার। 'আপনার স্ত্রীর একটি চিঠি এসেছে গতকালের ডাকে। হলঘরের টেবিলে খামটা রেখেছি আমি। কিন্তু আপনার বোধহয় চোখে পড়েনি।'

'তাই নাকি ?' বলল অ্যাডাম। 'দেখিনি তো!'

'যাবার আগে ওটা আপনাকে পৌঁছে দেব ?'

'না', তার দরকার হবে না। ওটা তোমার কাছেই থাক। এসে দেখব।'

একটু বিরতি। তারপর মিসেস রেগ্যান জানতে চাইল, 'আপনি যেখানে থাকবেন সেই ঠিকানায় ওটা পাঠাতে পারি।'

'না', বলল অ্যাডাম। 'এখনও ঠিক করিনি কোথায় উঠব। বেশির ভাগ সময় হয়তো আমাকে রাস্তায় কাটাতে হবে।'

কথা শেষ হবার পর বিশালদেহী লোকটা অ্যাডামকে তার বন্দীশালায় নিয়ে এসে খুলে দিল চোখের পট্টি। সন্ধ্যায় লম্বুর বেঁটে সঙ্গী খাবার দিয়ে গেল।

ওরা বোধ হয় পালাক্রমে দরজায় পাহারা দিচ্ছে, ভাবলো অ্যাডাম, লম্বু দিনে আর বাঁটকু রাতে।

অ্যাডাম জিজ্ঞেস করল, 'ব্যারিষ্টারের কাছ থেকে কোনো সংবাদ পেয়েছ?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল বাঁটুল। অ্যাডাম খাচ্ছে, অধৈর্য্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে। অ্যাডাম লক্ষ্য করল ডান হাতের গাঁটে একটু পর পর চিমটি কাটার বদভ্যাস আছে লোকটার।

পরদিন সকালে লম্বু নিয়ে এলো অ্যাডামের নাস্তা।

কঠিতে চুমুক দিতে দিতে সে জানতে চাইল, 'টা-টাকা পেয়েছ?'

মাথা নাড়ল লম্বু। 'পাইনি। ব্যারিষ্টারকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সময় দেব।'

প্রতিটি ঘন্টা, দিন আর রাতগুলো পার হতে লাগল অসহ্য ধীর গতিতে। বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘরে ঢুকেই বিশালদেহী কর্কশ গলায় বলল, 'ব্যারিষ্টার আমাদের সঙ্গে প্রতারণা শুরু করেছে।' পকেট থেকে চোখ বাঁধার কালো পট্টিটা বের করল সে। 'তুমি ওর সঙ্গে কথা বলে রাজি করাও। কাল দুপুরের মধ্যে টাকা না পেলে তোমার খবর হয়ে যাবে। আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ?'

হাতের ঘাম মুছলো অ্যাডাম। 'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।'

ফোনে ব্যারিষ্টারকে পেয়েই জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম, 'হ্যারল্ড, এখনও টাকা পাঠাচ্ছ না কেন?'

'অ্যাডাম নাকি?' জানতে চাইল তার আইনজীবী।

'হ্যাঁ'

'তুমি ঠিক আছ তো?'

'হ্যাঁ', বলল অ্যাডাম। 'আমি ঠিক আছি। কিন্তু ওরা বলল তুমি নাকি ইচ্ছে করে দেরী করছ।'

ইতস্তত করল ব্যারিষ্টার। 'না, অ্যাডাম। কিন্তু অতগুলো টাকা জোগাড় করতে সময়ওতো দরকার। কোম্পানির নতুন কেমিক্যালটা যদি সোমবার বিক্রি করি তাহলে ভাল লাভ পেতাম।'

'দরকার নেই', ধমক দিল অ্যাডাম। 'এক্ষুনি ওটা বিক্রি করো।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্যারিষ্টার। 'ঠিক আছে, অ্যাডাম। আর তোমার শোর অ্যাপার্টমেন্টের শেয়ারের ব্যাপারটা। রজার্স পঁচাত্তর হাজার ডলার দিতে চাইছে।'

'দিয়ে দাও ওকে।' ফোন চেপে ধরল অ্যাডাম। 'হ্যারল্ড, কাল দুপুরের মধ্যে অবশ্যই টাকাটা দিতে হবে। ওই সময়ের মধ্যে টাকা জোগাড় না হলে অনেক দেরী হয়ে যাবে।

পাঁচ সেকেন্ড নীরব থাকল ব্যারিষ্টার। তারপর বলল, 'বুঝতে পারছি অ্যাডাম। যেভাবে হোক কাল দুপুরের মধ্যে আমি টাকা জোগাড় করবই। আমার ওপর ভরসা রাখো।'

পরদিন বেলা একটায় লম্বু লাঞ্চ নিয়ে এলো অ্যাডামের জন্য। অ্যাডাম বিছানায় উঠে বসল। 'ব্যারিষ্টার টাকা দিয়েছে ?'

ঘেউঘেউ করে উঠল লম্বু। 'ফোন করেছিলাম। বলল টাকা জোগাড় হয়েছে। তবে আজ রাতেই সব প্রমাণ হয়ে যাবে।' টেবিলে ট্রে রাখল সে। 'প্রার্থনা করো যেন গড়বড় কিছু না হয়ে যায়।'

ওইদিন রাত দশটায় অ্যাডামের ঘরের তালা খোলার শব্দ হলো। বুক ধড়ফড় করতে লাগল তার। ওরা দু'জন। এখনও মুখে মুখোশ।

দশ মিনিট পর অ্যাডামকে চোখ বেঁধে গাড়ির পেছনের ফ্লোরে শুইয়ে দেয়া হলো। অ্যাডামের মনে হলো এ যাত্রার শেষ নেই। এক সময় থামলো গাড়ি। ওরা ওকে বের করল গাড়ি থেকে। তারপর আক্ষরিক অর্থেই ছুঁড়ে ফেলল রাস্তার পাশে, ঘাসের ওপর।

চুপচাপ শুয়ে থাকল অ্যাডাম। ভয় পাচ্ছে না জানি কখন গর্জে ওঠে পিস্তল। কিন্তু একটু পরে গাড়িটা চলে যাবার শব্দ শুনল সে।

আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকল অ্যাডাম। বেঁচে গেছে এই আনন্দে বুক ভরে শ্বাস টানলো। তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল বাঁধন খুলতে। নিজেকে মুক্ত করে উঠে দাঁড়াল সে। আকাশে বিশাল থালার মতো চাঁদ। কোমল আলো ছড়াচ্ছে চারদিকে। আধা মাইল দুরে একটা খামার বাড়ি চোখে পড়ল অ্যাডামের। ওদিকে হাঁটতে শুরু করল সে সাহায্যের জন্য।

রাত দু'টো নাগাদ পুলিশ অ্যাডামকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করল। ওদের প্রশ্ন পর্ব শেষ হলে অ্যাডাম দেখল হ্যারল্ড ব্যারিষ্টার তার জন্য অপেক্ষা করছে।

ব্যারিষ্টারকে উদ্বিগ্ন দেখাল। 'পুলিশ আমাকে অভিযোগ করেছে, অ্যাডাম। বলেছে তোমার ফোন পাবার পরেও কেন আমি অপহরণের কথা তাদেরকে জানাইনি।'

থানার বাইরে অপেক্ষমান ব্যারিষ্টারের গাড়িতে উঠল দু'জনে। চোখ ঘষলো অ্যাডাম। ক্লান্তিতে ঘুম পাচ্ছে খুব। 'এক গ্লাস ড্রিঙ্ক পেলে মন্দ হতো না।' বলল সে।

ইগনিশন কি ঘোরাল ব্যারিষ্টার। 'এত রাতে কোনো দোকান খোলা পাবে না। আমার বাসায় চলো। মার্টিনি খাওয়াব।'

মিনিট বিশেক পর ব্যারিষ্টারের লিভিং রুমে ঢুকলো অ্যাডাম। একটা ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিল সে। ব্যারিষ্টার এগিয়ে গেল লিকার ক্যাবিনেটের দিকে। 'যে লোকটা আমাকে ফোন করেছিল তার উচ্চারণ অনেকটা মিড ওয়েষ্টার্নদের মতো। আরেক কিডন্যাপারের কথা শুনে তোমার কি মনে হয়েছে ?'

'জানি না', বলল অ্যাডাম। 'বেঁটে লোকটা একবারও মুখ খোলেনি।'

এই সময় কুকুরের ডাক শুনল অ্যাডাম।

শরীর শক্ত হয়ে গেল ওর একটু পরেই প্লেনের আওয়াজ শুনে। আওয়াজটা ক্রমশ বেড়েই চলল। এক সময় বাড়ির ছাদের ওপর দিয়ে উড়ে গেল ওটা।

ঘড়ির দিকে তাকালো অ্যাডাম। রাত ২-৩২। ওর চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। গত সোমবার ঠিক এই সময়ে সে একই আওয়াজ দু'টো শুনে আসছে। লিকার কেবিনেটের বোতলে চোখ বুলাতে বুলাতে ব্যারিষ্টার বলল, 'ভারমাউথের বোতলটা আবার রাখলাম কোথায় ?' অন্যমনস্কভাবে সে ডান হাতের গাঁটে চিমটি দিতে লাগল।

'ও, এইতো' বলল সে। 'পেয়েছি।' বোতলটা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ব্যারিষ্টার। 'আশা করি পুলিশ তোমার কিডন্যাপারদের ধরতে পারবে।'

মেঝের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে অ্যাডাম। অবিকল বন্দীশালার সেই ছোট ঘরটার মতো। মুখ তুলে চাইল সে বেঁটেখাটো আইনজীবীর দিকে। আড়ষ্ট হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'হ্যাঁ', বলল সে। 'আমারও তাই ধারণা।'

দ্য চিলড্রেন অব নোয়া
রিচার্ড ম্যাথিসন

রাত তিনটার দিকে মি. কেচামের নজরে পড়ল সাইনবোর্ডটি। *জ্যাচরি জনসংখ্যা ৬৭*। তিনি নাক দিয়ে 'ঘোঁৎ' জাতীয় একটি শব্দ করলেন। মেইনের সমুদ্র তীরবর্তী এই খুদে শহরগুলোর কি কোন শেষ নেই, বিরক্ত হয়ে ভাবলেন তিনি। এক সেকেণ্ডের জন্য চোখ বুজলেন মি. কেচাম, চোখ খুলেই পুরো দাবিয়ে ধরলেন অ্যাকসেলেরেটর। ফোর্ড গাড়িটা বাঘের মতো লাফ দিল সামনের দিকে।

মি. কেচাম বিশাল বপু নিয়ে হেলান দিলেন সীটের গায়ে। পা জোড়া মেলে দিলেন সামনে। মেজাজ খারাপ হয়ে আছে তাঁর। ভ্রমণটা এমন বাজে হবে কল্পনাও করেননি। অফিস থেকে ছুটি নিয়েছিলেন নিউ ইংল্যান্ডের ঐতিহাসিক জায়গাগুলো মন ভরে দেখবেন বলে। ইচ্ছে ছিল প্রকৃতির সাথে মিশে যাবেন, রোমন্থন করবেন ফেলে আসা দিনগুলো। কিন্তু কোথায় কি? বরং সফরটা অত্যন্ত নীরস এবং একঘেয়ে ঠেকছে। বিরক্তির একশেষ।

গাড়ি চালাতে চালাতে মি. কেচামের মনে হলো পুরো শহরটাই যেন ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে। ইঞ্জিনের শব্দ ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। সব আশ্চর্য রকম নিশ্চুপ। এতো বেশি নিস্তব্ধ যে ভয় ধরিয়ে দেয়।

হেড লাইটের আলোয় এক ঝলকের জন্য আরেকটা সাইনবোর্ড দেখতে পেলেন মি. কেচাম। *সর্বোচ্চ গতিসীমা ১৫ মাইল*। পরক্ষণে ওটাকে ঝড়ের বেগে পেরিয়ে গেলেন তিনি। বিদ্রূপাত্মক এক টুকরো হাসি ফুটলো মুখে, 'আচ্ছা, আচ্ছা', বিড়বিড় করে বললেন তিনি, গ্যাস পেডালে চাপ বাড়লো আরও। খেয়ে দেয়ে তো কাজ নেই এই মরার শহরে পনেরো মাইল স্পীডে গাড়ি চালাবেন তিনি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন মি. কেচাম। অন্ধকারে দালান কোঠাগুলোকে ভূতের মতো লাগছে। বিদায় জ্যাচরি, মনে মনে বললেন তিনি, বিদায় লোকসংখ্যা ৬৭।

এই সময় রিয়্যারভিউ মিররে গাড়িটির আকৃতি ফুটে উঠল। আধা ব্লক পেছনে, মাথায় ঘূর্ণায়মান স্পটলাইট নিয়ে সোজা মি. কেচামের গাড়ির দিকে ছুটে আসছে সেডানটা। গাড়িটা কাদের, দেখেই বুঝতে পারলেন মি. কেচাম। নিজের অজান্তে স্পীড কমিয়ে আনলেন, টের পেলেন বুকের মধ্যে হাতুরির পাড় পড়ছে। তিনি স্পীড লিমিট অমান্য করেছেন এটা ওরা দেখে ফেলেনি তো, শঙ্কিত হয়ে ভাবলেন মি. কেচাম।

কালোরঙের সেডানটা চলে এলো ফোর্ডের সামনে, পথ রোধ করে দাঁড়াল। সামনের জানালা দিয়ে মুখ বের করল এক টুপিওয়ালা, 'গাড়ি থামান!' ঘেউ ঘেউ করে উঠল সে।

শুকনো ঢোক গিলে মি. কেচাম ফুটপাথ ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করালেন, ইমার্জেন্সী ব্রেক টেনে ধরে ইগনিশন সুইচ অফ করলেন, স্থির হয়ে গেল ফোর্ড। পুলিশের গাড়িটা এগিয়ে এলো তাঁর দিকে, থামলো। ডানদিকের দরজা খুলে গেল।

ফোর্ডের হেডলাইটের আলোয় অগ্রসরমান আগন্তুকের কাঠামোটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মি. কেচাম তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে ফেললেন। আরেকবার ঢোক গিললেন। রাত তিনটার সময়, অচেনা, অজানা একটা জায়গায় পুলিশ তাঁকে ধরতে আসছে স্পীড লিমিট অমান্য করার দায়ে, এরচে' মর্মান্তিক আর কি হতে পারে? মি. কেচাম চোয়াল শক্ত করে বসে রইলেন গাড়িতে।

কালো ইউনির্ফম এবং চওড়া হ্যাটপরা লোকটা ঝুঁকল জানালার দিকে, হাত বাড়ালো। 'লাইসেন্স'।

মি. কেচাম ঈষৎ কাঁপা হাত ঢোকালেন পকেটে। বেরিয়ে এলো কতগুলো বিলের কাগজপত্র। রাগে দাঁত কড়মড় করলেন তিনি, আবার খুঁজতে থাকলেন। এবার লাইসেন্সটা তুলে দিলেন ভাবলেশহীন মুখে চেয়ে থাকা লোকটার হাতে। লোকটা ফ্লাশ লাইট ফেলল লাইসেন্সের ওপর।

'নিউজার্সি থেকে?'

'জ্বী, জ্বী... ওখান থেকে.' তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন মি. কেচাম।

পুলিশের লোকটা একভাবে চেয়ে আছে লাইসেন্সটার দিকে। মি. কেচাম অস্বস্তিতে নড়ে উঠলেন, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেন। 'ডেট এখনও পার হয়নি', বললেন তিনি।

লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়াল। পরক্ষণে ফ্লাস লাইটের তীব্র আলো ঝলসে দিল মি. কেচামের চোখ। তিনি আঁতকে উঠে মাথা সরালেন। আলোটা সরে গেল। মি. কেচামের চোখে ইতিমধ্যে জল এসে গেছে। তিনি চোখ পিটপিট করলেন।

'নিউজার্সির লোকেরা কি ট্রাফিক সাইন পড়তে জানে না?' পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করল।

'কি   যেন   আপনি কি ওই জ-জনসংখ্যার সাইনবোর্ডটির কথা বলছেন?

'না, আমি অন্য একটা সাইনবোর্ডের কথা বলছি।'

'ও।' গলা খাঁকারি দিলেন মি. কেচাম। 'আমি একটাই সাইনবোর্ড দেখতে পেয়েছি।'

'তাহলে তো আপনি ড্রাইভার হিসেবে খুবই বাজে।'

'জ্বী মানে-'

'ওই সাইনবোর্ডে স্পষ্ট লেখা ছিল এখানকার সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় পনেরো মাইল। কিন্তু আপনি পঞ্চাশ মাইল স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছিলেন।'

'আ-আমি দুঃখিত। আমি সত্যি ওটা দেখতে পাইনি।'

'আপনি দেখতে পান বা না পান এখানকার সর্বোচ্চ স্পীড ওই পনেরো মাইলই।'

'ইয়ে মানে- এই ভোর রাতেও?'

'সাইনবোর্ডের ওপর একটা টাইম টেবিল ছিল। দেখেননি?'

'না। দেখিনি। আমার আসলে ওই সাইনবোর্ডটিই চোখে পড়েনি।'

'তাই, না?'

মি.কেচাম অনুভব করলেন তাঁর ঘাড়ের পেছনের চুলগুলো সব খাড়া হয়ে গেছে। 'এই যে ভাই; দেখুন', ভাঙা গলায় বলতে শুরু করলেন তিনি, হঠাৎ থেমে গেলেন, পুলিশের লোকটার দিকে তাকালেন, একটু বিরতি দিয়ে আবার বললেন, 'আমি কি আমার লাইসেন্স ফেরত পেতে পারি?'

পুলিশ অফিসার কোন কথা বলল না। মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকল।

'আমি কি'- মি. কেচাম আবার শুরু করলেন।

'আমাদের সঙ্গে আসুন', কর্কশ সুরে বলল পুলিশ অফিসার। ঘুরে দাঁড়াল, লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল নিজের গাড়ির দিকে।

মি. কেচাম বোকার মতো তাকিয়ে থাকলেন লোকটার দিকে, জবান বন্ধ হয়ে গেছে তাঁর। 'এই যে ভাই শুনুন শুনুন', প্রায় চিৎকার করে উঠলেন তিনি। আরে, লোকটা তাঁর লাইসেন্স নিয়েই হাঁটা শুরু করেছে। হঠাৎ পেটের মধ্যেটা ঠাণ্ডা এবং ফাঁকা ঠেকল মি. কেচামের।

'এসব হচ্ছেটা কি?' বিড়বিড় করে বললেন তিনি। দেখলেন পুলিশ অফিসার তার গাড়ির মধ্যে ঢুকলো, ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নামাল সেডান, ওটার মাথায় আবার লাল স্পট লাইট জ্বলতে শুরু করল।

মি. কেচাম সেডানের পিছু পিছু গাড়ি ছোটালেন।

এসব খুব খারাপ হচ্ছে, জোরে কথাটা বললেন তিনি। তাঁর সঙ্গে এরকম আচরণ করার কোন অধিকার তাদের নেই। এটা কি মধ্যযুগ নাকি যে যা ইচ্ছা করল তাই চাপিয়ে দিলাম? ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কঠিন মুখে মি. কেচাম অনুসরণ করতে লাগলেন পুলিশের গাড়িটিকে।

দুই ব্লক পরে সেডান বাঁ দিকে ঘুরল। মি. কেচাম হেড লাইটের আলোয় একটা দোকান ঘর দেখতে পেলেন। মাথায় পুরানো, বিধ্বস্ত একটা সাইনবোর্ড টাঙানো–হস্ত শিল্পের দোকান।

রাস্তায় কোন বাতি নেই। কালির মতো কালো পথ ধরে এগোচ্ছেন মি. কেচাম। ঠিক সামনে পুলিশের গাড়িটির রিয়ার লাইট এবং স্পট লাইটের তিনটে লাল চোখ দানবের চোখের মতো জ্বলছে। আর সবকিছু ঢেকে আছে নিঃসীম অন্ধকারে।

কি বিশ্রী একটা দিন গেল, তেতো মুখ করে ভাবছেন মি. কেচাম। সারাদিন গন্তব্যহীন যাত্রার পর শেষ পর্যন্ত সামান্য দোষে পুলিশের হাতে ধরা খেতে হলো। কেন যে নিউইয়র্কে ছুটিটা কাটাননি। দিব্যি ঘুমিয়ে, ভাল ভাল খাবার খেয়ে, সিনেমা, থিয়েটার দেখে চমৎকার সময় কাটানো যেত। এখন রীতিমত আফসোস হতে লাগল তাঁর। পুলিশের গাড়িটি ডানদিকে ঘুরল, এক ব্লক পরে আবার বাঁয়ে মোড় নিল তারপর থেমে

দাঁড়াল। মি. কেচাম ওটার ঠিক পেছনে তাঁর গাড়ি থামালেন। এ সবের কোন মানে হয় না। সস্তা নাটক হয়ে যাচ্ছে, মেইন স্ট্রীটে ওরা ইচ্ছে করলেই তাঁকে জরিমানা করে ছেড়ে দিতে পারত। তা না, তাঁকে ইঁদুরের মতো খেলাচ্ছে।

মি. কেচাম চুপচাপ বসে থাকলেন গাড়িতে। সামান্য এই ব্যাপারটা নিয়ে ওদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে মন সায় দিচ্ছে না। ওরা চাইলে তিনি বিনাবাক্যব্যয়ে জরিমানা দিয়ে চলে যেতে রাজি আছেন। হঠাৎ কথাটা মনে পড়তেই তাঁর ভ্রু কুঁচকে উঠল। ওরা ইচ্ছে করলে যত খুশি জরিমানা করতে পারে। অঙ্কটা পাঁচশো ডলার হওয়াও বিচিত্র নয়। তিনি শুনেছেন এইসব ছোট শহরে পুলিশই হচ্ছে সর্বেসর্বা। তাদের কথাই আইন। সুতরাং তারা ইচ্ছে করলেই তাঁর বারোটা বাজাতে পারে। পরক্ষণে জোর করে চিন্তাটা মাথা থেকে বের করে দিলেন মি. কেচাম। ধ্যাত্তেরি, আবোলতাবোল এ সব কি ভাবছেন তিনি।

পুলিশ অফিসারটি এসে দরজা খুলল। 'বেরিয়ে আসুন' বলল সে। এদিকের রাস্তায়ও কোন আলো নেই, বাতি জ্বলার কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না আশপাশের ঘরবাড়িতে। অফিসারের কালো কাঠামোটাই শুধু নজরে পড়ছে।

ঢোক গিললেন মি. কেচাম।

'এটাই কি পুলিশ স্টেশন? জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আলো নিভিয়ে নেমে আসুন', বলল পুলিশ অফিসার।

হেডলাইটের সুইচ অফ করে গাড়ি থেকে নামলেন মি. কেচাম। দড়াম করে দরজা বন্ধ করল অফিসার, উচ্চকিত শব্দটি অনেকক্ষণ প্রতিধ্বনি তুলল, যেন রাস্তায় নয়, তারা দাঁড়িয়ে আছেন অন্ধকার একটা ওয়্যারহাউজে। মি. কেচাম আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইলেন। বিশাল এক দোয়াত কালি ঢেকে রেখেছে চাঁদ আর তারাদের।

পুলিশ অফিসারের হাড্ডিসার আঙুল আচমকা চেপে বসল মি. কেচামের হাতে। এক মুহূর্তের জন্য ভারসাম্য হারালেন তিনি, অন্ধকার ফুঁড়ে যেন উদয় হলো লম্বা আরেক লোক, চট করে ধরে ফেলল সে মি. কেচামকে। তিনি মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। আরেকজন পুলিশ অফিসার।

'খুব অন্ধকার' যেন অনুযোগ করছেন এমন ভাবে কথাটা বললেন মি. কেচাম। কিন্তু লোকটা কিছু বলল না। পাশাপাশি হাঁটছে সে লম্বা পা ফেলে। আরেকজন শক্ত করে ধরে আছে তাঁর হাত। ব্যথ্যা পাচ্ছেন, মি. কেচাম। ব্যাটারা আমাকে ভয় দেখাতে চাইছে, মনে মনে বললেন তিনি, কিন্তু আমি ভয় পাব না।

মি. কেচাম বুক ভরে শ্বাস টানলেন। ভেজা, স্যাঁতসেঁতে সামুদ্রিক হাওয়া ঢুকলো বুকে, পরক্ষণে সশব্দে বাতাসটা বের করে দিলেন তিনি। নোংরা, জঘন্য একটা শহর, লোকসংখ্যা যার সাকুল্য ৬৭ জন; সেখানে দুজন পুলিশ অফিসার রাত তিনটায় পাহারা দিতে বেরোয়, এরচেয়ে হাস্যকর আর কি হতে পারে?

পুলিশ অফিসাররা মি. কেচামকে নিয়ে একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। দরজা খুলল। ভেতরে তাকিয়ে মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মি. কেচাম। পুলিশ স্টেশনই বটে। কাঠের উঁচু একটা ডেস্ক, বুলেটিন বোর্ড, পেটমোটা একটা স্টোভ, দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দেয়া পুরানো একটা বেঞ্চ, মেঝেতে কার্পেট ছেঁড়া। এক সময় হয়তো ওটার রঙ সবুজ ছিল। এখন কালচে মেরে গেছে।

'বসুন' বলল প্রথম পুলিশ অফিসার। 'আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

মি. কেচাম এই প্রথম লোকটার দিকে তাকালেন। মুখটা লম্বা, নিষ্ঠুর, গায়ের রঙ মিশমিশে কালো। কোটরাগত চোখ, যেন শূণ্য দুটো গহ্বর হাঁ করে আছে। লোকটার পরনে ঢিলেঢালা ইউনিফর্ম।

মি. কেচাম দ্বিতীয় অফিসারকে লক্ষ করার সময় পেলেন না, তার আগে দু'জনেই পাশের রুমে চলে গেল। বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন মি. কেচাম। মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে। এই সুযোগ পালালে কেমন হয়, ভাবলেন তিনি। উঁহু, ওদের কাছে তাঁর ঠিকানাসহ লাইসেন্স আছে। ধরা পড়ে যাবেন। তাছাড়া এটা ফাঁদও হতে পারে। ওরা হয়তো চাইছে তিনি যেন পালিয়ে যান। তাহলে গুলি করেও বসতে পারে। এদের ভাবগতিক সুবিধের ঠেকছে না। সুতরাং হঠকারী কোন সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবে না।

মি. কেচাম বেঞ্চটার ওপর বসলেন। বেহুদা ঝুঁকি নেয়া বোকামি। এই ছোট শহরে থেকে পালাবার আগেই ওরা তাঁকে ধরে ফেলবে। তাছাড়া ওরা তাঁকে বড়জোর জরিমানা করতে পারে-

আচ্ছা, ওরা তখন তাঁকে জরিমানা করল না কেন? এই নাটুকেপনার কি সত্যি কোন প্রয়োজন ছিল? মুখটা কঠোর হয়ে উঠল মি. কেচামের। ঠিক আছে, ওরা তাঁকে নিয়ে কত খেলতে পারে দেখা যাক। তিনি চোখ বুজলেন। এ দুটোকে একটু বিশ্রাম দেয়া দরকার।

কিছুক্ষণ পর আবার চোখ মেললেন মি. কেচাম।

চারপাশ অসহ্য রকম শান্ত। তিনি চারদিকে চোখ বোলাতে লাগলেন। দেয়ালগুলো যাচ্ছে তাই নোংরা, স্থানে স্থানে পলেস্তারা খসে পড়ে দাঁত দেখাচ্ছে লাল ইট। এক দেয়ালে একটা ঘড়ি ঝুলছে। ডেস্কের পেছনে একটা ছবি চোখে পড়ল মি. কেচামের। হাতে আঁকা ছবি। বুড়ো এক লোক। জেলেদের টুপি মাথায়। সম্ভবত জ্যাচরির বয়োজ্যেষ্ঠ নাবিকদের কেউ হবে।

কিন্তু পুলিশ স্টেশনে এই লোকের ছবি থাকবে কেন, একটু অবাক হলেন মি. কেচাম। পরে নিজেই উত্তর খুঁজে বের করলেন, জ্যাচরি আটলান্টিকের তীর ঘেঁষা একটি শহর। এখানকার আয়ের উৎস হতে পারে মাছ ধরা। পেশাজীবীদের বেশিরভাগই হয়তো জেলে আর নাবিক। কিন্তু তাতে আমার কি ভেবে তিনি ছবিটা থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন।

পাশের রুম থেকে পুলিশ অফিসারের গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। কান খাড়া করলেন মি. কেচাম, শোনার চেষ্টা করলেন ওরা কি বলছে। কিন্তু বোঝা গেল না। বন্ধ

দরজার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকলেন। আয় ব্যাটারা, যা বলার সামনাসামনি বলবি, আয়। আবার তাঁর চোখ গেল দেয়াল ঘড়িটার দিকে। তিনটা বিশ। নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। দেয়াল ঘড়িটা একদম ঠিক সময় দিচ্ছে। এই সময় খুলে গেল দরজা। দুই পুলিশ অফিসার এসে ঢুকলো ভেতরে।

একজন চলে গেল। দ্বিতীয়জন, যে মি. কেচামের লাইসেন্স নিয়েছিল, সে উঁচু ডেস্কটার দিকে এগিয়ে গেল। ডেস্কের ওপর হাঁস আকৃতির একটি বাতি, সুইচ টিপে আলো জ্বাললো সে। ওপরের ড্রয়ারটা খুললো, বের করল বড় একটা লেজার বই। ঝুঁকে কি যেন লিখতে শুরু করল সে। অবশেষে ব্যাপারটা ঘটতে যাচ্ছে, ভাবলেন মি. কেচাম।

এক মিনিট এভাবেই চুপচাপ কেটে গেল।

'আ-' খুকখুক কাশলেন মি. কেচাম; 'আমি কি–

লেজার বই থেকে মাথা তুলল অফিসার, ঠাণ্ডা চোখে তাকালো মি. কেচামের দিকে। তার হিমশীতল চাউনি দেখে মাঝপথে থেমে গিয়েছিলেন মি. কেচাম, এবার সাহস সঞ্চয় করে বলতে শুরু করলেন, 'আপনি কি...ইয়ে মানে, আমাকে কি এখন জরিমানা দিতে হবে?'

অফিসার তার চোখ ফিরিয়ে নিল লেজার বইতে। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'অপেক্ষা করুন।'

'কিন্তু এখন তো সাড়ে তিনটার মত-' মি. কেচাম বিস্ফোরিত গলায় বললেন, 'আপনি কি আমাকে দয়া করে বলবেন আমি কখন এখান থেকে যেতে পারব?'

পুলিশ অফিসার লেখা বন্ধ করল। মি. কেচাম শক্ত হয়ে বসে থাকলেন জায়গায়, এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন লোকটার দিকে।

পুলিশ অফিসার মি. কেচামের দিকে মুখ তুলে চাইল, 'বিবাহিত?' জিজ্ঞেস করল সে।

মি. কেচাম একভাবে চেয়েই আছেন তার দিকে। যেন কথাটা কানে যায়নি তাঁর।

'আপনি কি বিবাহিত?'

'না না– লাইসেন্সে ওটা লেখাই আছে।' মি. কেচাম মনে মনে রীতিমত উল্লাস অনুভব করলেন লোকটাকে এই প্রথমবারের মত্তো অগ্রাহ্য করতে পেরেছেন ভেবে।

'জার্সিতে পরিবার আছে?' প্রশ্ন করল পুলিশ অফিসার।

'হ্যাঁ। মানে, না। এক বোন শুধু থাকে উইসকনস- মি. কেচাম কথা শেষ করতে পারেননি, তার আগেই লোকটা আবার লিখতে শুরু করেছে।

'চাকরি করেন? জানতে চাইল অফিসার।

ঢোক গিললেন মি. কেচাম। 'মানে আ-আমি নির্দিষ্ট কোন চাকরিতে-'

'তার মানে বেকার', বলল অফিসার।

'না, না। বেকার নই' প্রতিবাদ করে উঠলেন মি. কেচাম। 'আমি একজন ফ্রী-ল্যান্স সেলসম্যান। আমি জিনিসপত্র কিনি- তার কথা বন্ধ হয়ে গেল পুলিশ অফিসার মুখ তুলে তাকাতেই। ঢোক গিলতে চাইলেন, কিন্তু গলায় যেন একটা ডেলা পাকিয়ে গেছে, কিছুতেই নামতে চাইছে না নিচে। হঠাৎ উপলব্ধি করলেন তিনি বেঞ্চটার একেবারে কোনার ধারে বসে আছেন, প্রয়োজনে এটাকে এক ঝটকায় তুলে নিয়ে আত্মরক্ষার কাজে লাগানো যাবে। কিন্তু হঠাৎ উত্তেজিত হওয়া চলবে না, নিজেকে সাজেশন দিতে শুরু করলেন মি. কেচাম। রিল্যাক্স! গভীর দম নিলেন তিনি, চোখ বুজলেন, স্থির ভাবে বসে থাকলেন বেঞ্চের ওপর।

ঘরে এখন ঘড়ির টক্‌টক্ শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই। মি. কেচাম টের পেলেন তাঁর হৃৎপিন্ডটা ধীরে ধীরে ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো খাঁচার মধ্যে যেন দুলছে। তিনি ভারী শরীরটা বিছিয়ে দিলেন শক্ত বেঞ্চের ওপর। চোখ খুললেন। দাড়িওয়ালার সঙ্গে চোখাচোখি হলো তাঁর, বুড়ো নাবিক যেন একঠায় তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে...

আহা!

মুখ দিয়ে শব্দ বেরুল মি. কেচামের, তাঁর চোখের পাতা খুলে গেল, মণি দুটো বিস্ফারিত। ধড়মড় করে উঠে বসতে গেলেন তিনি, কিন্তু আবার চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন বেঞ্চিতে। কালো চেহারার একটা লোক ঝুঁকে আছে মি. কেচামের দিকে, হাত দুটো তাঁর কাঁধের ওপর।

'আপনি কে?' মি. কেচাম জিজ্ঞেস করলেন। তার পাঁজরে ধড়াস ধড়াস বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিন্ড।

'চীফ শিপলি', জবাব দিল সে। 'আমার অফিসে একবার আসবেন?'

'অ্যা?' বললেন মি. কেচাম। 'জ্বী, জ্বী, যাব।'

তিনি উঠে বসলেন। পিঠের পেশীগুলো আড়ষ্ট হয়ে আছে। জোরে জোরে ডলতে শুরু করলেন জায়গাটা। লোকটা উঠে দাঁড়াল। অজান্তে মি. কেচামের চোখ ঘুরে গেল দেয়াল ঘড়িটির দিকে। সোয়া চারটা বাজে।

'দেখুন' দৃঢ় গলায় বললেন মি. কেচাম, 'আমাকে জরিমানা করে আপনারা ছেড়ে দিচ্ছেন না কেন?'

চীফ শিপলি হাসলো। নিষ্প্রাণ হাসি।

'আমাদের জ্যাচরি শহরের নিয়মকানুন অন্যদের তুলনায় একটু অন্যরকম, মি. কেচাম। আসুন।' পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল সে. মি. কেচামকে। একটা ছোট রুমে ঢুকলো দুজনে। অত্যন্ত পুরানো, বাসি একটা গন্ধ নাকে ঢুকলো মি. কেচামের। কুঁচকে উঠল নাক। কিন্তু ব্যাপারটা খেয়াল করল না চীফ। 'বসুন।' একটা চেয়ার দেখাল সে মি. কেচামকে। নিজে গিয়ে বসল তার ডেস্কে।

উঁচু পিঠওয়ালা চেয়ারটায় বসলেন মি. কেচাম। ক্যাঁচকোঁচ করে তীব্র আপত্তি জানাল ওটা। কিন্তু ওর আপত্তি গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে তিনি বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না কেন আমি ফাইন দিয়ে চলে যেতে পারছি না।'

'সঙ্গত কারণেই', বলল শিপলি।

কিন্তু মি. কেচাম শুরু করতে গিয়ে থেমে গেলেন। শিপলির মুখে ক্রুর এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেছে যেন সর্তক করে দিচ্ছে সে মি. কেচামকে। মুখ অন্ধকার করে চেয়ারে বসে থাকলেন মি. কেচাম। চীফ গভীর মনোযোগে ডেস্কের ওপর রাখা এক তাড়া কাগজ দেখতে লাগল। লোকটার পরনের ইউনিফর্মে তাকে মোটেও মানায়নি। এরা কি জানেও না কিভাবে পোশাক পরতে হয়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন মি. কেচাম।

'আপনি দেখছি এখন পর্যন্ত বিয়ে শাদীই করেননি।' নীরবতা ভেঙে বলল শিপলি।

মি. কেচাম কোন কথা বললেন না। ওরা যেমন প্রশ্ন করলে জবাব দেয় না, আমিও ওদের বিরুদ্ধে ঠিক একই ঔষুধ প্রয়োগ করব, ঠিক করলেন তিনি।

'মেইনে আপনার বন্ধুবান্ধব আছে?' জানতে চাইল শিপলি।

'কেন?'

'জাস্ট রুটিন কোয়েশ্চেন, মি. কেচাম', বলল চীফ, 'উইসকনসিনে আপনার বোন থাকেন, তাই না?'

জবাব দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করলেন না মি. কেচাম, ট্রাফিক আইন অমান্য করার সঙ্গে এসবের কি সর্ম্পক?

'স্যার?' একঘেয়ে কণ্ঠে ডাকল শিপলি।

'আমি তো আপনার অফিসারকে এ ব্যাপারে আগেই বলেছি। আমি বুঝি না বারবার এক কথা বলার–'

'এখানে ব্যবসার কোন কাজে এসেছেন?'

রাগে ফেটে পড়ার হাত থেকে নিজেকে অনেক কষ্টে রক্ষা করলেন মি. কেচাম। আশ্চর্য শীতল গলায় বললেন, 'আমাকে এসব প্রশ্ন করার মানে কি?'

'রুটিন। বললেন না তো ব্যবসার কাজে এখানে এসেছেন কিনা।'

'আমি এখানে ছুটি কাটাতে এসেছিলাম। কিন্তু ছুটি আমার মাথায় উঠেছে। আমাকে এখন জরিমানা যা করার করুন। আমি চলে যাই।'

'কিন্তু তা তো সম্ভব নয়, মি. কেচাম', বলল চীফ।

মি. কেচামের মুখ হাঁ হয়ে গেল, তিনি অনেক চেষ্টার পর শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারলেন, 'মা-মানে?'

'আপনাকে বিচারপতির সামনে দাঁড়াতে হবে।'

'কিন্তু কথাটা খুব হাস্যকর শোনাচ্ছে।'

'তাই কি?'

'অবশ্যই। আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাগরিক। আমি আমার নাগরিক অধিকার দাবি করছি।'

চীফ শিপলির ঠোঁট থেকে হাসি মুছে গেল। 'আপনি আমাদের আইন ভেঙেছেন বলে সেই অধিকার এখন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে', বলল সে, 'আমরা আপনাকে যে দন্ড দেব এখন আপনাকে তাই মাথা পেতে নিতে হবে।'

মি. কেচাম শূণ্য দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকালেন। তিনি বুঝতে পারছেন ওরা তাঁকে পুরোপুরি কব্জা করে ফেলেছে। ওরা ইচ্ছে করলে এখন যত খুশি জরিমানা করতে পারে, জেলেও দিতে পারে। তিনি এতক্ষণ বুঝতে পারেননি কেন ওরা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সর্ম্পকে প্রশ্ন করেছে। ওরা এখন জানে তিনি প্রায় ছিন্নমূল একজন মানুষ। তিনি বাঁচলেই কি আর-

ঘরটা হঠাৎ অসম্ভব গরম মনে হতে লাগল মি. কেচামের। ঘামে ভিজে গেল শরীর।

'আপনি তা করতে পারেন না',. চিৎকার করে উঠলেন মি. কেচাম কিন্তু ভাঙা শোনাল কণ্ঠ।

'আজ রাতটা আপনাকে জেলে থাকতে হবে', বলল চীফ। 'কাল সকালে বিচারপতি আসবেন।'

কিন্তু এ অসম্ভব! মি. কেচাম বিস্ফোরিত হলেন, 'অসম্ভব কথা বলছেন আপনি।'

পরমুহূর্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলেন তিনি, 'আমাকে একটা ফোন করতে হবে', দ্রুত বললেন, 'আমাকে অবশ্যই ফোন করতেই দিতে হবে। এ আমার বৈধ অধিকার।'

'পারতেন', বলল শিপলি, 'যদি জ্যাচরিতে কোন ফোন সার্ভিস থাকত।'

ওরা মি. কেচামকে সেলে পুরে তালা মেরে দিল। সেলের দেয়ালেও একটা পেইন্টিং ঝুলতে দেখলেন তিনি। সেই দাড়িওয়ালা বুড়ো নাবিকের ছবি। মি. কেচাম এবার ইচ্ছা করেই আর দ্বিতীয়বার ফিরে তাকালেন না ছবিটার দিকে।

মি. কেচাম প্রচন্ড উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর ঘুমভাঙা ফোলা মুখে উদ্বেগের ছাপ সুস্পষ্ট। পেছন দিকে ঝনঝন শব্দ হতেই কনুইয়ে ভর করে সেলের দরজার দিকে তাকালেন। পুলিশী ইউনিফর্ম পরা একটি লোক দরজা খুলে ঢুকলো ভেতরে। একটা ট্রে নামিয়ে রাখল মাটিতে।

'সকালের নাস্তা', বলল সে। লোকটি অন্য দুই পুলিশ অফিসারের চেয়ে বয়সী, এমনকি শিপলির চেয়েও তাকে বড় মনে হচ্ছে। চুলের রঙ কালচে পড়া লোহার মত, দাড়ি গোঁফ কামানো পাতলা মুখ। মি. কেচাম লক্ষ করলেন এর গায়েও ইউনিফর্ম ঠিক ফিট করেনি। ঢলঢল করছে।

লোকটি দরজায় আবার তালা মারতে শুরু করেছে, এই সময় মি. কেচাম জিজ্ঞেস করলেন, 'বিচারপতির সাক্ষাৎ কখন মিলবে?'

লোকটি তাঁর দিকে এক মুহূর্তের জন্য তাকালো। জানি না', বলে ঘুরল সে, পা বাড়াল সামনে।

'এই যে যাবেন না। শুনুন!' মি. কেচাম উচ্চস্বরে ডাকলেন তাকে, কিন্তু লোকটি তাঁকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করল। জুতোর শব্দ তুলে চলে গেল। সিমেন্টের মেঝেতে হিলের আওয়াজ যেন অনেকক্ষণ ধরে ভেসে বেড়াল।

মি. কেচাম উঠে বসলেন; আঙুল দিয়ে চোখ ঘষতে লাগলেন, তাকালেন ঘড়ির দিকে। সাতটা নয়। খিদে পেয়েছে খুব। হাত বাড়ালেন ট্রে-র দিকে। পরক্ষণে সরিয়ে নিলেন হাতটা।

না, নিজেকে চোখ রাঙালেন মি. কেচাম। ওদের দেয়া কোন খাবার তিনি খাবেন না। তিনি বুকে হাত বেঁধে স্থির হয়ে বসে একঠায় নিজের মোজাপরা পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

খানিকপর পেটের মধ্যে ছুঁচোর কেত্তন শুরু হয়ে গেল।

'ঠিক আছে, খুলেই দেখি না কি দিয়েছে', খিদের কাছে শেষমেষ পরাজয় বরণ করে নিলেন মি. কেচাম। ট্রেটা টেনে নিলেন নিজের কাছে। ওপরের কাপড়টা সরিয়ে ফেললেন। একটা প্লেটে মাখন দিয়ে ভাজা তিনটে ডিম, থাক থাক মাংসের বেকন, পাশের প্লেটে পুরু করে মাখন দেয়া চার স্লাইস টোস্ট, এককাপ জেলী, তার পাশেই লম্বা গ্লাসে কমলার রস এবং একটা ডিশে ক্রীমের মধ্যে ডোবানো টসটসে স্ট্রবেরী। আর সবশেষে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা একটি টিপট। গরম কফির মন মাতানো গন্ধ বেরিয়ে আসছে ওটা থেকে।

মি. কেচাম কমলার রসের গ্লাসটা তুলে নিলেন, ছোট্ট একটা চুমুক দিলেন। স্বাদটা চমৎকার লাগল। তারপর আর ইতস্তত করলেন না তিনি। ঝাঁপিয়ে পড়লেন খাদ্য দ্রব্যগুলোর ওপর।

খেতে খেতে মি. কেচাম চিন্তা করতে লাগলেন এতো চমৎকার নাস্তা পরিবেশনের উদ্দেশ্যটা কি।

ওরা বোধহয় শেষ পর্যন্ত নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে। তাই এতো আয়োজন। যাই হোক, স্বীকার করতেই হবে এদের রান্নার হাতটি বেশ ভাল। জীবনেও এতো সুস্বাদু নাস্তা খাননি মি. কেচাম।

তৃতীয় কাপ কফি ধ্বংস করে ওটা মাটিতে নামিয়ে রাখতে যাচ্ছেন মি. কেচাম, এই সময় পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন। হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। সব খাপে খাপ মিলে যাচ্ছে। হাসিটুকু মুখে ধরে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

চীফ শিপলি এসে দাঁড়াল ওপাশে। 'নাস্তা খেয়েছেন?'

মি. কেচাম মাথা দোলালেন। কোটটা তুলে নিলেন হাতে।

কিন্তু চীফ দাঁড়িয়েই থাকল আগের জায়গায়।

'জ্বী...?' মি. কেচাম কয়েক মুহুর্ত পর কথা বললেন। তাঁর আশা ইতিমধ্যে নিভতে শুরু করেছে।

চীফ শিপলি মি. কেচামের দিকে অর্থবোধক দৃষ্টিতে তাকালো। মি. কেচামের হৃৎপিন্ড ধড়াস করে উঠল।

'আমি কি অনুসন্ধানের জন্য... তিনি শুরু করতে গেলেন।

'বিচারপতি এখনও আসেননি', বলল শিপলি।

'কিন্তু...' এটুকু বলেই খেই হারিয়ে ফেললেন মি. কেচাম।

'আপনাকে শুধু খবরটা দিতে এসেছিলাম, 'বলে চলে গেল চীফ শিপলি।

মাথায় রাগ উঠে গেল মি. কেচামের। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন নাস্তার প্লেটের দিকে, যেন এই অবস্থার জন্য ওটাই দায়ী। ঠাস করে নিজের উরুতে ঘুসি বসিয়ে দিলেন তিনি। অসহ্য! ওরা এসব কি শুরু করেছে তাঁকে নিয়ে? ভয় পাওয়াতে চাইছে? ঈশ্বর, শঙ্কিত হয়ে ভাবলেন মি. কেচাম, ওরা সত্যি তাঁকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

মি. কেচাম দরজার দিকে এগোলেন। গরাদের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে তাকালেন বাইরে। পুরো প্যাসেজ খালি। কোথাও জনমনিষ্যির টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না। ভয়ের ঠাণ্ডা একটা স্রোত নামতে লাগল শিরদাঁড়া বেয়ে। পা দুটোর ওজন মনে হলো কয়েক মণ। তিনি ডানহাত দিয়ে বারবার শীতল গরাদে আঘাত করতে শুরু করলেন।

বেলা দুটোর দিকে চীফ শিপলি সেই বয়সী পুলিশ অফিসারকে নিয়ে মি. কেচামের সেলে ঢুকলো। বিনাবাক্যব্যয়ে দরজা খুলল সে। মি. কেচামও একটিও কথা না বলে কোটটা কাঁধে ফেলে পা বাড়ালেন সেলের বাইরে। দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

মি. কেচামকে নিয়ে ওরা প্যাসেজ ধরে এগোল। 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' জানতে চাইলেন তিনি।

'বিচারপতি অসুস্থ', জবাব দিল শিপলি। 'আপনার জরিমানা করার জন্য তাঁর বাড়িতে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

'ঠিক আছে', বললেন মি. কেচাম, 'আপনারা যা ভাল মনে করেন।'

'এটাই এই মুহূর্তে আমাদের একমাত্র করণীয় কাজ', পাথরের মতো মুখ করে বলল শিপলি।

মি. কেচাম মনে মনে খুশি হয়ে উঠলেন। যাক, শেষ পর্যন্ত ঘটনাটা ঘটতে যাচ্ছে। তিনি জরিমানা দেবেন এবং সমস্ত ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন।

বাইরে প্রচুর কুয়াশা। রাস্তায় যেন সিগারেটের ধোঁয়ার মতো পাক খাচ্ছে কুয়াশা। মি. কেচাম শীতে কেঁপে উঠলেন, টুপিটা আরেকটু টেনে নামালেন কপালের নিচে। হাড্ডির মধ্যে যেন প্রবল ঠাণ্ডা কামড় বসাচ্ছে। বিশ্রী একটা দিন, ভাবলেন তিনি। এদিক ওদিক তাকালেন। তাঁর গাড়িটাকে খুঁজছেন।

বুড়ো পুলিশ অফিসার তাদের পুলিশ কারের পেছনের দরজা মেলে ধরল। শিপলি তাঁকে ভেতরে ঢোকার জন্য ইশারা করল।

'আমার গাড়িটার কি হলো ?' জিজ্ঞেস করলেন মি. কেচাম।

'বিচারপতির সঙ্গে দেখা করার পর আমরা আবার এখানে আসব', বলল শিপলি।

'কিন্তু আমার...'

মি. কেচাম ইতস্তত করতে লাগলেন। তারপর এগোলেন দরজার দিকে, বিশাল শরীর নিয়ে রীতিমত কসরৎ করে তাঁকে ঢুকতে হলো ভেতরে, ধপ্ করে বসে পড়লেন ব্যাক সীটে। বরফের মতো ঠাণ্ডা চাবুক বসাল গায়ে। তিনি ঈষৎ শিউরে উঠলেন। শিপলি ঢুকলো এরপর। মি. কেচাম সরে জায়গা করে দিলেন তার জন্য।

পুলিশ অফিসার দরজা বন্ধ করল সশব্দে।

আবার সেই প্রতিধ্বনি উঠল, যেন সমাধিস্থলে কোন কফিনের ঢাকনা বন্ধ করা হলো। মি. কেচাম মুখ বিকৃত করলেন।

পুলিশ অফিসার ড্রাইভিং সীটে গিয়ে বসল। খকখক কেশে উঠল এঞ্জিন। লোকটা স্টার্ট নেয়ার চেষ্টা করছে, মি. কেচাম জানালা দিয়ে তাকালেন বাইরের দিকে।

কুয়াশাটা এখনও ধোঁয়ার মতো পাক খাচ্ছে। কাছে পিঠে কোন গ্যারেজে আগুন-টাগুন লেগেছে বোধহয়। নইলে কুয়াশার চেহারা এমন হবে কেন? মি. কেচাম গলা খাঁকারি দিলেন। তাঁর পাশে বসা চীফ শিপলি নড়ে উঠল।

'খুব ঠাণ্ডা', বলল মি. কেচাম।

শিপলি কোন কথা বলল না।

গাড়িটা হঠাৎ স্টার্ট নিয়ে ছুটতে শুরু করল, পেছনে দিকে হেলে পড়লেন মি. কেচাম। ইউ-টার্ন নিয়ে গাড়িটা কুয়াশা ঢাকা রাস্তা দিয়ে ধীর গতিতে ছুটে চলল। ভেজা পেভমেন্টে টায়ারের শব্দ হতে লাগল খসখস করে, ওয়াইপার দুটো সমান ছন্দে কাজ করে যাচ্ছে, উইন্ডশিল্ড থেকে দূর করে দিচ্ছে কুয়াশার জল।

মি. কেচাম কিছুক্ষণ পর তাঁর হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। প্রায় তিনটে বাজে। এই জঘন্য শহরে ইতিমধ্যে তাঁর প্রায় আধা একটা দিন কেটে গেছে। তিনি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। ভৌতিক শহরটা দ্রুত পেছনে সরে যাচ্ছে। ঘন কুয়াশায় ফুটপাথের পাশের দালানগুলোর অস্পষ্ট কাঠামো চোখে পড়ছে। একঘেয়ে দৃশ্য। মি. কেচাম রাস্তা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। তাকালেন শিপলির দিকে। চীফ তার সীটে মূর্তির মতো একভাবে বসে আছে। অনড়, স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ সামনের দিকে। মি. কেচাম ঢোক গিললেন। কুয়াশাটাকে মনে হলো বুকের মধ্যে আটকে আছে।

মেইন স্ট্রীটে পড়ল ওরা। এখানে কুয়াশা অত ঘন এবং গাঢ় নয়। সমুদ্রের হাওয়ার কারণে এটা হতে পারে; ভাবলেন মি. কেচাম। তিনি রাস্তা দেখতে থাকলেন। দোকানপাট অফিসঘর সব বন্ধ।

'লোকজন সব কই?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'কি?'

'রাস্তাঘাটে তো কাউকে দেখছি না। গেল কই সব?'

'বাড়িতে', সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল চীফ।

'কিন্তু আজ তো বুধবার', বললেন মি. কেচাম, 'দোকানপাটও বন্ধ?'

'আবহাওয়া খারাপ, বলল শিপলি, 'এই আবহাওয়ায় কে আসবে দোকানে?'

'তা অবশ্য ঠিক', বললেন মি. কেচাম। 'আপনাদের এখানে অধিবাসীদের সংখ্যা সাতষট্টি, তাই না?'

চীফ কোন কথা বলল না।

'আচ্ছা জ্যাচরির বয়স, মানে..... এটা কত বছরের পুরানো শহর?'

আঙুল ফোটাল চীফ, 'দেড়শো বছর।'

'জ্যাচরির নামকরণ কি করে হলো?' কৌতূহল চেপে রাখতে পারলেন না মি. কেচাম।

'নোয়া জ্যাচরি এই শহর প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।'

আচ্ছা, আচ্ছা। স্টেশনে যার ছবি দেখলাম উনিই কি সেই.......?

হ্যাঁ, চুপ হয়ে গেলেন মি. কেচাম। অলস দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন একের পর ব্লক পেরিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো প্রশ্নটি উদয় হলো তাঁর মনে। এতো বড় একটা শহরের লোকসংখ্যা মাত্র ৬৭ জন কেন?

আচ্ছা, এখানে মাত্র– 'মুখ ফস্কে কথাগুলো বেরিয়ে যাচ্ছিল, দ্রুত লাগাম টেনে ধরলেন মি. কেচাম। তাঁর মনের ভেতর কে যেন সর্তক করে দিল এই প্রশ্নটা করা ঠিক হবে না। কারণ উত্তরে ভয়াবহ কিছু একটা কথা তাঁকে শুনতে হতে পারে।'

'কি?'

'না, না, কিছু না এমনি'– সশব্দে চেপে রাখা শ্বাস ফেললেন মি. কেচাম। কিন্তু শেষপর্যন্ত কৌতূহলের জয় হলো। তাঁকে ব্যাপারটা জানতেই হবে জবাব যাই আসুক না কেন।

'এখানে অধিবাসীদের সংখ্যা মাত্র সাতষট্টিজন কেন?'

'বাড়তি যারা আসে তারা চলে যায়।'

কপালে ভাঁজ পড়ল মি. কেচামের। তাহলে রহস্যটা হচ্ছে এই! অবশ্য অগামার্কা এই মফস্বল শহরে নতুন প্রজন্মকে ধরে রাখার মতো কোন ব্যবস্থাই নেই। এখান থেকে অন্য জায়গায় চলে যাওয়াটাই তাদের জন্য স্বাভাবিক।

মি. কেচাম সীটে হেলান দিলেন। এই পচা জায়গাটায় আমারও আর এক মুহূর্তে থাকতে ইচ্ছে করছে না, মনে মনে বললেন তিনি। এখান থেকে বিদায় হতে পারলেই বাঁচি।

হঠাৎ উইন্ডশিল্ড দিয়ে ব্যানারের মতো একটা জিনিস দেখতে পেলেন মি. কেচাম। কাছাকাছি আসতে দেখলেন সত্যিই কাপড়ের তৈরি একটা ব্যানার। ঝুলছে রাস্তার ওপর। বড় বড় অক্ষরে লেখা, **'ভোজ, আজরাতে।** সম্ভবত এই শহরের লোকজন আজ রাতে কোন উৎসবের আয়োজন করতে যাচ্ছে, ভাবলেন তিনি।

'এই জ্যাচরি ভদ্রলোক কি করতেন?' নীরবতা ভেঙে প্রশ্ন করলেন মি. কেচাম।

'জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন', জবাব দিল চীফ।

'কোথায়?'

'দক্ষিণ সমুদ্রে জাহাজ চালাতেন', বলল শিপলি।

লম্বা মেইনস্ট্রীটে শেষ হলো অবশেষে। গাড়িটা ঘিঞ্জি একটা রাস্তায় ঢুকলো। রাস্তার দুপাশে ঘন ঝোপড়ার চোখ পড়ল মি. কেচামের। বিচারপতিটি কোথায় থাকেন, ভাবলেন তিনি, পাহাড়ের ওপর? নাক দিয়ে 'ঘোঁৎ' শব্দ করে নড়ে চড়ে বসলেন তিনি।

কুয়াশা ক্রমশ হালকা হতে শুরু করেছে। গাছপালা, ঘাস ইত্যাদি আস্তে আস্তে দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। গাড়িটা মোড় ঘুরল, ছুটল সাগরের দিকে মুখ করে। খানিকপর একটা লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল।

মি. কেচাম খুক করে কাশলেন, আচ্ছা...'ইয়ে মানে, বিচারপতি কি ওখানে থাকেন?' জবাবে শুধু মাথা ঝাঁকাল শিপলি।

'খুব উঁচু জায়গা', অনিশ্চিত গলায় বললেন মি. কেচাম।

পাহাড়ের ঠিক চুড়োয় ধুসর সাদা রঙের বাড়িটি। তিনতলা। বুড়ো জ্যাচরির মতই বাড়িটি পুরানো, ভাবলেন মি. কেচাম। গাড়িটা যতই বাড়িটির দিকে এগোচ্ছে, মি. কেচামের বুক ততই শুকিয়ে যাচ্ছে। নিজের হাতের দিকে তাকালেন তিনি। কাঁপছে ও দুটো। ঢোক গেলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু গলা শুকিয়ে সাহারা মরুভূমি। খকখক কাশলেন। মনে মনে নিজেকে চোখ রাঙালেন- এসব হচ্ছেটা কি? এতো ভয় পাওয়ার কি আছে। তাঁর বারবার মনে পড়তে লাগল রাস্তায় দেখা ব্যানারটার হেডিং।

দ্রুত কাছিয়ে আসছে বিচারপতির বাড়ি। মি. কেচাম অনুভব করলেন তাঁর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আমি ওই বাড়িতে যাব না, ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল তাঁর। দরজা খুলে লাফ মেরে পালিয়ে যাওয়ার তীব্র একটা আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল মনে। পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল।

মি. কেচাম চোখ বন্ধ করলেন। নিজেকে সংযত করার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। আমি খামোকা ভয় পাচ্ছি, নিজেকে বোঝাতে চাইলেন তিনি। হয়তো ওই বাড়িতে পৌছার পর মারাত্মক কিছুই ঘটবে না। আমি কেন শুধু শুধু... থেমে গেল গাড়ি। চীফ দরজা খুলে নামলো। পুলিশ অফিসারটি এসে পেছনের দরজাটি খুলল। মি. কেচাম লক্ষ করলেন একটা পা তিনি নড়াতে পারছেন না, যেন পঙ্গু হয়ে গেছে ওটা। দরজা ধরে অনেক কষ্টে তিনি পা রাখলেন মাটিতে।

'হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম', কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিতে বললেন মি. কেচাম।

কিন্তু অন্য দুজন কোন কথা বলল না। মি. কেচাম আড়চোখে চাইলেন বাড়িটির দিকে। কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। চীফ তাঁকে আগে বাড়তে ইশারা করল। তিনজন একসঙ্গে পা বাড়াল সামনে।

'আ-আমার কাছে নগদ টাকা বিশেষ কিছু নেই', বললেন মি. কেচাম.... ট্রাভেলার্স চেক দিলে চলবে তো?

'চলবে', বলল চীফ।

বারান্দা পেরিয়ে একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। পুলিশ অফিসারটি পেতলের তৈরি একটি বড় কি হেড ধরে মোচড় দিল। ভেতরে কোথাও একটি ঘন্টা বেজে উঠল। ডান পায়ে ঝিঝি ধরে গেছে, তিনি বাঁ পায়ে ওপরসাবধানে শরীরের ওজন চাপালেন। পায়ের নিচে কাঠের মেঝে ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল। লোকটা আবার বেল বাজাল। 'সম্ভবত উনি খুব অসুস্থ', মি. কেচাম ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন। এটা একটা চান্স বটে, ভাবলেন তিনি।

ওরা কেউ তাঁর দিকে তাকালো না পর্যন্ত। মি. কেচাম টের পেলেন তাঁর পেশী আবার শক্ত হয়ে উঠেছে। কাঁধের ওপর দিয়ে পেছন দিকে তাকালেন তিনি। যদি এই মুহূর্তে কষে দৌড় মারেন ওরা কি তাঁকে ধরতে পারবে? না এটা করা ঠিক হবে না, পালানোর বুদ্ধিটা বাতিল করে দিলেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে। তারচেয়ে জরিমানা দিয়ে সুবোধ বালকের মতো চলে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

হঠাৎ দরজা খুলে গেল। লম্বা, রোগা এক মহিলা, পরনে কালো পোশাক, এসে দাঁড়াল সামনে। এই মহিলার গায়ের রঙও কালো, মুখে বয়সের চিহ্ন সুস্পষ্ট। মি. কেচামের হাত থেকে হঠাৎ টুপিটা খসে পড়ে গেল মাটিতে।

'ভেতরে আসুন', বলল মহিলা।

মি. কেচাম ঘরের মধ্যে পা রাখলেন।

'আপনার টুপিটা ওখানে রাখতে পারেন', হাত তুলে সে হ্যাট র‍্যাকটি দেখাল। মি. কেচাম কালো রঙের একটা র‍্যাকে তাঁর টুপিটা ঝুলিয়ে রাখলেন। এই সময় সিঁড়ির গোড়ায় একটি বড় পেইন্টিং-এর দিকে তাঁর দৃষ্টি আটকে গেল। তিনি কি যেন বলার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছেন, মহিলা বাধা দিল, 'এদিক দিয়ে আসুন।'

হলঘর দিয়ে ওরা এগিয়ে চলল। পেইন্টিংটির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মি. কেচাম জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই মহিলাটি কে? জ্যাচরির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।'

ওনার স্ত্রী, 'উত্তর দিল চীফ।'

কিন্তু তিনি তো-

মি. কেচামের হঠাৎ শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। আতঙ্কে কেঁপে উঠল শরীর। এও কি সম্ভব জ্যাচরির স্ত্রী এতদিন পরেও বেঁচে আছেন।

মহিলাটি একটি দরজা খুলল, এখানে অপেক্ষা করুন, বলল সে।

মি. কেচাম ভেতরে ঢুকলেন। তিনি ঘুরে দাড়াচ্ছেন চীফকে কি যেন বলতে যাবেন, এই সময় দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

দ্রুত দরজার নব ঘোরাবার চেষ্টা করলেন মি. কেচাম। কিন্তু ঘুরল না ওটা।

ভ্রু কুঁচকে উঠল তাঁর। এই, এ সব হচ্ছেটা কি? বন্ধ ঘরে গমগম করে উঠল তাঁর ভারী কণ্ঠ। মি. কেচাম চারদিকে তাকালেন। চারকোনা ঘর। সম্পুর্ণ খালি।

তিনি আবার দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। মনে মনে গুছিয়ে নিলেন কথাগুলো। তারপর বলতে শুরু করলেন, 'আচ্ছা, এটা খুব-' জোরে মোচড় দিলেন তিনি নবে!

'ঠিক আছে, আমি বুঝতে পারছি আপনারা আমার সঙ্গে মস্করা করছেন। কিন্তু একজন বুড়ো মানুষের সঙ্গে কি মস্করা করা কি ঠিক?'

কিন্তু কেউ তাঁর কথার জবাব দিল না। তিনি হতভম্বের মতো চারপাশে তাকালেন। হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পেলেন। কিসের শব্দ ওটা? মনে হচ্ছে না যেন তীব্র বেগে পানির ধারা ছুটে আসছে?

'হেই', চিৎকার করলেন মি. কেচাম, 'হেই! এসব কি শুরু করেছ তোমরা? নিজেকে কি ভাব তোমরা, অ্যাঁ?'

শব্দটা দ্রুত বেড়েই চলল। মি. কেচাম কপালের ঘাম মুছলেন হাতের চেটো দিয়ে। ঘরের আবহাওয়া যেন হঠাৎ বদলে গেছে, গরম হতে শুরু করেছে।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে', ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললেন মি. কেচাম, 'বুঝলাম আমাকে নিয়ে মস্করা করা হচ্ছে। কিন্তু–'

হঠাৎ কেঁপে উঠলেন তিনি, সাঁৎ করে নব থেকে হাতটা সরিয়ে নিলেন। প্রচন্ড গরম হয়ে উঠেছে দরজাটা।

কিন্তু এ কি করে সম্ভব? আতঙ্কিত হয়ে ভাবলেন মি. কেচাম। উন্মাদের মতো ছুটে গেলেন দরজার দিকে, দুমদুম করে ধাক্কাতে শুরু করলেন। চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'হেই! হেই! অনেক হয়েছে। এখন আমাকে দয়া করে বেরুতে দাও। নইলে আমি খুব বিপদে পড়ে যাব।'

কিন্তু কারও কোন সাড়াশব্দ নেই।

ঘরটি দ্রুত গরম হয়ে চলেছে। মনে হচ্ছে যেন জ্বলন্ত উনুনের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন মি. কেচাম। হঠাৎ একের পর এক দৃশ্যগুলো তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। লোকগুলোর অদ্ভুত আচরণ, সবার পরনে বেমানান ঢলঢলে পোশাক, চোখে মুখে বন্য ক্রূরতা, খালি রাস্তা, জেলখানায় সেই উপাদেয় নাস্তা, তাদের চাউনি, পেইন্টিং এর সেই মহিলা, নোয়া জ্যাচরির বউ-কি বীভৎস ভঙ্গিতে সে ছবিতে হাসছিল। তারপর রাস্তার সেই ব্যানারটা **ভোজ আজরাতে**, মুখ হাঁ হয়ে গেল মি. কেচামের, গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিতে লাগলেন তিনি। তীব্র আতঙ্কে তাঁর চোখের মণি কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে হিংস্র পশুদের মত, ফেনা জমা গেছে ঠোঁটের কোনায়। প্রচন্ড জোরে লাথি মারতে লাগলেন দরজায়।

'আমাকে বেরুতে দাও! আমাকে বেরুতে দাও! আমাকে বেরুতে দাও!!'

কিন্তু কেউ তাঁর কথা শুনল না।

ডেথ ইজ এ ড্রিম
রবার্ট আর্থার

তুমি এখন ঘুমিয়ে পড়ছে ডেভিড।

হ্যাঁ, আমি এখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

আমি এখন তোমার স্ত্রীর সাথে কথা বলব। তুমি কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নাও, ডেভিড।

ঠিক আছে, ডাক্তার। আমি কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিচ্ছি। আপনি কথা বলুন।

মিসেস কার্পেন্টার, আপনার স্বামী এখন সম্মোহনের হালকা স্তরে আছেন। ওকে বিরক্ত না করেই আমরা কথা বলতে পারব।

ঠিক আছে, ডাক্তার ম্যানসন। বুঝতে পেরেছি। আপনি কি জানতে চান, বলুন?

প্রথমেই আমি ডেভিডের দুঃস্বপ্নের ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চাই। আপনি আমাকে বলেছেন আপনাদের বিয়ের রাত থেকেই নাকি ডেভিড এই দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করে।

জ্বী, ডাক্তার। ব্যাপারটার শুরু হপ্তাখানেক আগে। বিয়ের ঝামেলাটা চুকে যাবার পরপরই আমরা সরাসরি আমাদের এই নতুন বাড়িতে চলে আসি। কয়েকজন অতিথিকে দাওয়াত করেছিলাম। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতে চুকতে মাঝ রাত হয়ে যায়। তারপর আমরা ঘুমাতে যাই। ঠিক ভোরের দিকে আমার ঘুম ভেঙে যায় ডেভিডের চিৎকারে। ঘুমের মধ্যে প্রচন্ড চিৎকার করছিল ও। শরীর মোচড় খাচ্ছিল, দুর্বোধ্য স্বরে কি যেন বলছিল। আমি তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে জাগালাম ওকে। মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে ডেভিডের। রীতিমত কাঁপছে। জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে। শিউরে উঠল ও। বলল ভয়ানক একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছে।

কিন্তু স্বপ্নটা যে কি ছিল সে সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেনি, তাই না?

হ্যাঁ। কিছুই মনে করতে পারিনি। একটা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে আবার শুয়ে পড়ল ডেভিড। কিন্তু পরদিন রাতে একই ঘটনা। পরের দিন রাতেও। এভাবে প্রতিটি রাতে ও দুঃস্বপ্ন দেখছে।

মিসেস কার্পেন্টার, এ নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। ডেভিডকে আমি ছেলেবেলা থেকে চিনি। এবং আমার বিশ্বাস ওকে এই দুঃস্বপ্নের হাত থেকে মুক্ত করতে আমাকে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না।

তাই যেন হয়, ডাক্তার।

সম্ভবত রিচার্ড ওর অবচেতন মনে আবার ঢুকে পড়েছে।

রিচার্ড? রিচার্ড কে, ডাক্তার?

রিচার্ড হচ্ছে ডেভিডের দ্বিতীয় সত্তা।

ঠিক বুঝলাম না। অনুগ্রহ করে একটু বুঝিয়ে বলবেন?

তাহলে শুনুন ঘটনাটা। ডেভিডের বয়স তখন বছর বারো হবে, এই সময় ও একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে। গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট। দুর্ঘটনায় প্রচন্ড রকম শক্ পায় ডেভিড। মানসিক রোগীতে পরিণত হয় সে। আর তখনই তার ভেতরে দুটো ব্যক্তিত্ব বা সত্তা গড়ে ওঠে। একটি সত্তার মালিক ডেভিড নিজেই। আর অন্য সত্তাটি ডেভিডের সম্পূর্ণ বিপরীত। বেপরোয়া, অশুভ এবং ভয়ঙ্কর। এই বিপরীতধর্মী সত্তাটিকেই ডেভিড রিচার্ড বলে ভাবতে থাকে এবং তার মতে রিচার্ড তারই যমজ ভাই। বলাবাহুল্য, মিসেস কার্পেন্টার, ডেভিড তাঁর কল্পনায় এই দ্বিতীয় সত্তাকে মনে মনে পুষে এসেছে।

অদ্ভুত ব্যাপার!

অবাক হওয়ার কিছু নেই, মিসেস কার্পেন্টার। মেডিকেল হিস্টরিতে এরকম কেস বহু আছে। তো যা বলছিলাম। ডেভিড যখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে বা ভয় পায় কিংবা উদ্বিগ্ন হয়, তখন ডেভিডের ওপর পুরো নিয়ন্ত্রণ চলে আসে দ্বিতীয় সত্তা রিচার্ডের। তখন রিচার্ডই ডেভিডকে পরিচালনা করে। যেমন ডেভিড ঘুমের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আগুন লাগিয়ে দেয় বিছানায় চাদরে। রিচার্ড যা বলে ডেভিড তখন তাই শোনে। কারণ নিজের ওপর তখন তার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। মাঝে মাঝে ডেভিড বুঝতেও পারে না সে কি করছে বা করতে যাচ্ছে। কখনও কখনও তার মনে হয় পুরো ব্যাপারটাই আসলে একটা দুঃস্বপ্ন ছিল।

কি ভয়ঙ্কর!

ডেভিডের এই মানসিক রোগের চিকিৎসা আমিই করছি। অবশ্য ভেবেছিলাম যে ডেভিডের মন থেকে রিচার্ডকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছি। কিন্তু এটা সম্ভব হত...যাকগে। আমি এখন ডেভিডকে জিজ্ঞেস করে ওর দুঃস্বপ্নের ব্যাপারটা জেনে নেই। ব্যাপারটা পুরো জানতে পারলে বোধহয় সম্ভব হবে সমাধানের একটা পথ খুঁজে বের করা। ডেভিড...!

বলুন, ডাক্তার?

যে দুঃস্বপ্ন তোমাকে বারবার বিরক্ত করছে সেই স্বপ্ন সম্পর্কে যাবতীয় খুঁটিনাটি আমি তোমার কাছ থেকে জেনে নিতে চাইছি। তুমি কি স্বপ্নের কথা মনে করতে পারছ, নাকি পারছ না।

স্বপ্ন! হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্বপ্নের কথা মনে পড়ছে আমার। আমি মনে করতে পারছি।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, এতো উত্তেজিত হতে হবে না। শান্ত হও। ঠাণ্ডা মাথায় আমাকে স্বপ্নের কথা খুলে বলো। প্রথম কবে তুমি এই স্বপ্নটা দেখেছ?

প্রথমবার– ও হ্যাঁ, অ্যানকে যেদিন বিয়ে করলাম সেই রাতে আমি স্বপ্নটা প্রথম দেখি। না না ভুল বলেছি। ওই দিন না। বিয়ের আগের রাতে আমি আসলে স্বপ্নটা দেখি।

ঠিক বলছ তো?

হ্যাঁ। ওইদিন সন্ধ্যায় রিভারডেপের কাছে কেনা নতুন বাড়িতে আমি আসি সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখতে। নতুন বাড়িতে অ্যানের যাতে কোন অসুবিধে না হয় তা

দেখাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। সবকিছু দেখেশুনে আমার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরতে রাত এগারোটা বেজে যায়। সেদিন খুবই ক্লান্ত ছিলাম। বিছানায় গেলাম। কিন্তু এতো ক্লান্তি সত্ত্বেও ঘুম এলো না। ঘুমের বড়ি খেলাম। কিন্তু গভীর ঘুম আসার আগেই ভয়ঙ্কর স্বপ্নটার শুরু হলো।

কিভাবে শুরু হলো, ডেভিড?

মনে হলো স্বপ্নের মধ্যে বুঝি টেলিফোন বাজছে। আমার বিছানার পাশেই টেবিলের ওপর ফোনটা সবসময় থাকে। স্বপ্নের মধ্যে উঠে বসলাম। ফোন ধরলাম। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো ব্যাপারটা আসলে স্বপ্ন নয়, সত্যি। পরক্ষণে বুঝলাম না, আমি সত্যি সত্যি স্বপ্ন দেখছি।

কিভাবে বুঝলে, ডেভিড?

কারণ লুইজি তখন ফোনে কথা বলছিল। ঘুমের মধ্যে আমার এটুকু চেতনা ছিল যে লুইজি কিছুতেই কথা বলতে পারে না। ও তো মারা গেছে।

লুইজি কবে মারা গেছে, ডেভিড?

এক বছর আগে। ও তখন পশ্চিম ভার্জিনিয়া যাচ্ছিল ওর বাবা মা'র সঙ্গে দেখা করতে। রাস্তার ওর গাড়িটা উল্টে গিয়ে খাদে পড়ে। আগুনে পুড়ে মারা যায় লুইজি।

তারমানে দেখা যাচ্ছে তুমি যখন ফোনে ওর কথা শুনলে তখন তুমি ভাবছ আসলে তুমি স্বপ্ন দেখছ, তাই না?

অবশ্যই। লুইজি বলছিল, 'ডেভিড, আমি লুইজি বলছি..... ডেভিড, কি হয়েছে? কথা বলছ না কেন? এক মুহূর্তের জন্য আমার মুখে কোন জবাব যোগালো না। তারপর স্বপ্নের মধ্যে বললাম, তুমি লুইজি হতে পারো না। লুইজি মারা গেছে।

তাই কি, ডেভিড? লুইজির তীব্র ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠ ভেসে এলো ইথারে। এই কণ্ঠ আমার খুব পরিচিত। ও আবার বলল, 'সত্যি কি লুইজি মারা গেছে?

এটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছূই নয়, 'আমি ওকে বললাম। 'আমি এখুনি ঘুম থেকে জেগে উঠব। দেখব এতক্ষণ আমি একটা বাজে স্বপ্ন দেখছিলাম।

'ঠিক কথা', ডার্লিং, লুইজি হাসলো। তোমার এখন ঘুম থেকে উঠে পড়াই উচিত। কারণ আমি তোমার সাথে কিছু কথা বলব। আমিও কবর থেকে উঠে আসছি।'

ফোন রেখে দিল লুইজি। হঠাৎ করেই স্বপ্নটা বদলে গেল। যেভাবে ঘুমের মধ্যে হুট হাট করে স্বপ্নেরা বদলে যায়, তেমনি। দেখি আমি পুরো পোশাক পরে আছি। বসে বসে সিগারেট ফুঁকছি। অপেক্ষা করছি আসলে অপেক্ষা করছি লুইজির জন্য। লুইজি বলেছে ও কবর থেকে উঠে আসছে আমার সাথে কথা বলার জন্যে।

দ্বিতীয় সিগারেটটা শেষ করেছি সবে, এমন এই সময় বেজে উঠল কলিংবেল। যান্ত্রিক মানুষের মতো উঠে দাঁড়ালাম আমি। সোজা গিয়ে দরজা খুললাম। না, লুইজি নয়। রিচার্ড। দাঁড়িয়ে আছে দরজার ওপাশে।

তোমার জমজ ভাই, রিচার্ড।

জ্বী, আমার জমজ ভাই। তবে আমার চেয়ে লম্বা, শক্তিশালী। আর দেখতেও অনেক হ্যান্ডসাম। ও আমাকে দেখে হাসলো। চোখে সেই পুরানো বুনো ভাব চকচক করছে।

হ্যালো, ডেভিড, বলল সে। আমাকে ভেতরে আসতে বলবে না? হাজার হোক পনেরো বছর ধরে তোমার সাথে আমার কোন যোগাযোগ নেই। ভদ্রতার খাতিরেও তো একবার আমাকে আমন্ত্রণ জানানো উচিত, নাকি?

না, রিচার্ড।' আমি চিৎকার করে উঠলাম। তুমি আবার ফিরে আসতে পারো না!

কিন্তু আমি ফিরে এসেছি, বলে আমাকে প্রায় ঠেলে ভেতরে ঢুকলো ও। অনেকদিন ধরেই আমি মনে মনে প্ল্যান করছিলাম কোন ছুতোয় তোমার কাছে আসা যায়। আজকে রাতে অবশ্য এখানে আসার বেশ ভাল একটা কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে।

তুমি আবার এলে কেমন করে? আমি জানতে চাইলাম। তুমি তো মরেই গেছ। আমি আর ডাক্তার ম্যানসন মিলে তোমাকে খুন করছি।

লুইজিও তো মরে গেছে, বলল রিচার্ড। সে যদি আজ রাতে আসতে পারে আমার আসতে দোষ কি?

তুমি আসলে কি চাও বলো তো?

শুধু তোমাকে সাহায্য করতে চাই, ডেভিড। আজ রাতে তোমার সাহায্যের খুবই দরকার। মৃতা স্ত্রীর সাথে নতুন করে সাক্ষাৎ করার মতো স্নায়ুর জোর তোমার নেই যে!

প্লীজ, রিচার্ড, প্লীজ। দয়া করে চলে যাও! রীতিমত অনুনয় করে বললাম আমি।

আমার কথার জবাব দিল না রিচার্ড। বলল, দরজায় কে যেন ঘা মারছে। এ লুইজি না হয়েই যায় না। তুমি ওর সাথে কথা বলো। তবে মনে রেখো কাছেপিঠেই আছি আমি। সাহায্যের দরকার হলে ডাক দিয়ো।

রিচার্ড চলে গেল পাশের রুমে। দরজায় অসহিষ্ণু ঘা ক্রমশ বেড়েই চলছে। দরজা খুলে দিলাম। লুইজি। সাদা পোশাক পরনে। যেভাবে আমি কবর দিয়েছিলাম ঠিক সেই পোশাক। মাথায় ঘোমটা। বীভৎস পোড়া মুখটা ঢেকে রেখেছে। আমাকে পাশ কাটিয়ে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকলো লুইজি। খুব আস্তে একটা চেয়ারে বসল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর কথা বলে উঠল লুইজি, আমাকে দেখে খুব চমকে উঠেছে, তাই না, ডেভিড? যাও দরজাটা বন্ধ করে এসো। তারপর তোমার সাথে আমি কথা বলছি।

আমি দরজা বন্ধ করলাম। তারপর বিস্ফোরণের মতো আমার গলা থেকে কথাগুলো বেরিয়ে এল। কি চাও তুমি এখানে? বলো, কেন এসেছ? তুমি তো মারা গেছ। হাসিতে ভেঙে পড়ল সে। হাসতে হাসতে বলল, তাই নাকি, ডেভিড? আমি মারা গেছি? তুমি নিশ্চই বিশ্বাস করো না যে আমি মারা গেছি, নাকি করো? না, ডেভিড, আমি মরিনি। তোমার সাথে একটা ছোট্ট মজা করেছি।

মজা? আমার সাথে? আমি হতবুদ্ধির মতো বললাম। আবার হাসতে শুরু করল লুইজি। এমন হাসি, যেন মৃগী রোগ হয়েছে।

হ্যাঁ, ডেভিড, ভৎর্সনা করে বলল সে। যে কোন সমস্যা এলেই তুমি ভয়ে অস্থির হয়ে যাও। তাই আমার ভূত সেজে দেখতে ইচ্ছে করল তুমি আসলে কি করো।

মিথ্যে কথা বলছ তুমি, আমি চিৎকার করে বললাম। তুমি মৃত। আমি নিজে তোমাকে কবর দিতে দেখেছি।

মেরীর কসম, ডেভিড। আমি মিথ্যে বলছি না। এবার লুইজিকে একটু বিরক্তই মনে হলো। আমার দিকে ভাল করে তাকাও তো। আমাকে কি মরা মানুষের মতো লাগছে দেখতে?

ঘোমটা তুলে ফেলল লুইজি। ওর মুখ দেখতে পেলাম আমি। সারা মুখে কোথাও দাগ নেই। ভরাট গাল, উজ্জ্বল চোখ, ঝকমকে দাঁত। টসটসে অধরে বেড়াল সুলভ হাসি। তুমি যাকে কবর দিয়েছ সে আমি নই। অন্য একটি মেয়ে। মেয়েটিকে আমি রাস্তা থেকে তুলে নিয়েছিলাম। আমার কাছে লিফট চেয়েছিল। গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় মেয়েটি। অলৌকিকভাবে বেঁচে যাই আমি। ওর আঙুলে আমার আংটি পরিয়ে দেই। আমার হাতব্যাগটা দেই ওর শরীরের নিচে। তারপর গাড়িতে আগুন লাগাই।

কিন্তু কেন? গুঙিয়ে উঠলাম আমি। ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। এই কাজ কেন করতে গেলে তুমি?

কারণ আমি মজা দেখতে চেয়েছিলাম। আমাকে নিয়ে তুমি যতটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলে আমি তার চেয়েও বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম তোমার সাথে বাস করতে গিয়ে। সম্পূণ ভিন্ন পরিচয়ে বেঁচে থাকার প্ল্যানটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। তাছাড়া আমি তো ঠিক করেই রেখেছিলাম যখন এই লুকোচুরি খেলায় ক্লান্ত হয়ে পড়ব তখন আবার ফিরে আসব। এখন আমার টাকা পয়সা সব শেষ। তাই আমাকে আবার ফিরতে হয়েছে।

কিন্তু আমি তো কাল বিয়ে করতে যাচ্ছি। অ্যান নামে একটি মেয়েকে।

সে কথা আমি জানি। খবরের কাগজেই জেনেছি তোমাদের বিয়ের কথা। খবরটা পড়ার পর মনে হলো তুমি নিশ্চয়ই চাইবে না এতো চমৎকার সময়ে তোমাদের চারপাশে আমি ঘুরঘুর করে তোমার বারোটা বাজাই। না, ডেভিড, আমি তোমার বারোটা বাজাব না। আমি না হয় আরও কিছুদিন মরার ভূমিকায় অভিনয় করব। তুমি নির্ভয়ে তোমার সেরা মক্কেলের মেয়েকে বিয়ে করতে পারো। আমি বাগড়া দিতে আসব না। তবে হ্যাঁ, এর বিনিময়ে আমার টাকা চাই।

না! আমি তোমাকে টাকা দেব না। তুমি তো মরে গেছ।

কাল রাতের সংবাদপত্রগুলোর হেডলাইনে কি হবে তা এখনই আমি কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, বলল লুইজি. প্রখ্যাত তরুণ আইনজীবীর মৃতা স্ত্রীর সমাধি ত্যাগ-মৃতা স্ত্রীর হস্তক্ষেপে বিয়ে কি ভন্ডুলের পথে?

না! আমি চিৎকার করে উঠলাম। এ আমি কিছুতেই হতে দেব না।

বেশি না, দশ হাজার ডলার হলেই চলবে আমার। চুপচাপ ডিভোর্স পাবে তুমি আমার কাছ থেকে। কাকপক্ষীটিও টের পাবে না। নির্ভাবনায় বিয়েটা করতে পারবে। দেখো, কোন ঝামেলাই হবে না।

আমি কোন কথা বললাম না। মনের মধ্যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ভীষণ দুর্বল ঠেকছে শরীর। মাথাটা কাজ করছে না। নিজেকে নিস্তেজ লাগছে। লুইজি উঠে দাঁড়াল।

প্রস্তাবটা ভেবে দেখো। আমি নাকে পাউডার লাগাতে যাচ্ছি। পাঁচ মিনিট সময় দিয়ে গেলাম ভাবার। তারপর এসে তোমার কাছ থেকে একটা চেক আশা করব।

লুইজি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। হতাশা আর যন্ত্রণায় আমি মুখ ঢেকে বসে রইলাম। কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা করলাম এখনই যেন আমি জেগে উঠি ঘুম থেকে। যখন চোখ তুললাম, দেখি পাশেই দাঁড়িয়ে আছে রিচার্ড, আমার জমজ ভাই।

তুমি পুরো ব্যাপারটাই গুবলেট করে ফেলেছ, ডেভিড। ও তোমার পিলে চমকে দিয়েছে দেখছি, বলল রিচার্ড।

কিন্তু ও তো মারা গেছে! আমি চিৎকার করে উঠলাম। আমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছি।

কোনটা স্বপ্ন আর কোনটা স্বপ্ন নয় এ কথা কে বলতে পারে? আমার পরামর্শ হচ্ছে, ওকে কোন সুযোগ দিয়ো না। একবার যদি ওকে টাকা দাও, ও কয়েকদিন পর আবার এসে নির্ঘাত টাকা চাইবে।

কিন্তু এ ছাড়া আমার করার তো কিছু নেই। হতাশায় আমি গুঙিয়ে উঠলাম।

অব্যশই আছে। লুইজি একবার মরেছে। ওকে আবারও একবার মরতে হবে।

না! না! ওকে আমি মারতে পারব না।

তাহলে তো পুরো ব্যাপারটা সেই ছেলেবেলার মতো আমাকেই সামলাতে হয়। আমার দিকে তাকাও, ডেভিড!

না! না!

কিন্তু পারলাম না। চুম্বকের মতো আকর্ষণ করল রিচার্ডের চোখ। সেই ছোটবেলার অনুভূতি ফিরে এলো আমার মধ্যে। রিচার্ডের চোখ যেন ক্রমশ বড় হতে শুরু করেছে। কালো, অন্ধকার সেই চোখের তারা কি তীব্র আকর্ষণে আমাকে গ্রাস করে চলেছে টের পাচ্ছি আমি। মনে হচ্ছে চোখ নয়, কালো জলের গভীর একটা হ্রদ। সেই হ্রদে আমি ডুবে যাচ্ছি...ডুবে যাচ্ছি।

এখন, ডেভিড, তোমার শরীরের পুরো নিয়ন্ত্রণ আমি নিয়ে নিচ্ছি, যেভাবে আগে নিতাম। কিছুক্ষণের জন্য তোমান সত্তা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে আমার মধ্যে।

রিচার্ডের চোখের ওই সর্বগ্রাসী কালো দীঘি আমাকে ক্রমশ গ্রাস করে চলল। হঠাৎ মাথাটা মোচড় দিয়ে উঠল। তারপরই দেখি রিচার্ড নেই। বুঝতে পারলাম বরাবরের মতো ওরই জিত হয়েছে। ও এখন আমাদের শরীর নিয়ন্ত্রণ করছে। ওর কাছে আমি এখন সম্পূর্ণ অসহায়। এই চোখ এবং কান এখন শুধু আমার নয়, আমাদের। রিচার্ড যা বলবে কোন প্রতিবাদ ছাড়াই সেই কাজগুলো আমাকে করতে হবে।

লুইজি এই সময় রুমে ঢুকলো। উজ্জ্বল চোখ দুটো আত্মবিশ্বাসে ঝকমক করেছে।

তাহলে ডেভিড, বলল সে, এতক্ষণে নিশ্চয়ই তুমি তোমার মনস্থির করে ফেলেছ।

হ্যাঁ, লুইজি, আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আমার ভেতরে থেকে কথা বলে উঠল রিচার্ড। তবে কণ্ঠ অনেক ভারী এবং আত্মবিশ্বাসী। লুইজি একটু চমকে উঠল।

বিস্ময়ের ভাবটুকু গোপন করে বলল, তাহলে চেকটা দাও। লাস ভেগাসে আমি ডিভোর্সের ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলব। তোমার সাথে আমার আর কোন সম্পর্কই থাকবে না।

তুমি কোন চেক পাচ্ছ না, কোন ডিভোর্সও হচ্ছে না, রিচার্ড বলল ওকে।

তাহলে তো আঙুলটা বাঁকা করতেই হয়। তবে এই পাবলিসিটি কিন্তু তোমার ক্যারিয়ারের জন্য খুব একটা সুফল বয়ে আনবে না বলেই আমার বিশ্বাস, ডেভিড।

তুমি কোন পাবলিসিটিও করতে পারবে না। আর তোমার জ্ঞাতার্থে বলছি, আমি ডেভিড নই। আমি রিচার্ড।

রিচার্ড? বিস্মিত দেখাল লুইজিকে। কি আবোলতাবোল বকছ তুমি?

আবোলতাবোল না। আমি ডেভিডের জমজ ভাই। ডেভিড যা করতে পারে না, আমি রিচার্ড ওর সেই কাজগুলো করে দেই।

তোমার মাথাটা দেখছি সত্যি খারাপ হয়ে গেছে। যাকগে আমি এখন যাচ্ছি। কাল সকাল ন'টা পর্যন্ত তোমাকে সময় দিলাম। এর মধ্যে মন পরিবর্তন করে চেকটা আমাকে হস্তান্তর করতে হবে।

কোন চেক পাবে না তুমি। আমি খুব ভাল করেই জানি তুমি একটা দু'মুখো সাপ। আর দু'মুখো সাপেরা কখনও তাদের কথা রাখে না।

বলতে বলতে রিচার্ড এগিয়ে গেল ওর দিকে। এই প্রথম ভয় পেল লুইজি। দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল, যেন দৌড় দেবে। খপ করে ওর হাত চেপে ধরল রিচার্ড। টান মেরে ওকে নিজের দিকে ঘোরাল। তারপর কঠিন দুটো হাত দিয়ে চেপে ধরণ লুইজির গলা।

আমি অসহায়ের মতো তাকিয়ে দেখলাম রিচার্ডের দুই হাত শক্ত হয়ে ক্রমশ চেপে বসছে লুইজির গলায়। লুইজির মুখের রঙ দ্রুত পরিবর্তিত হতে শুরু করল। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল। ত্রিশ সেকেন্ডের মতো ধস্তাধস্তি করল ও। লাথি মারতে চাইল, খামচি বসাল। নীল হয়ে গেছে মুখ। হাঁ করা মুখের কোণ থেকে গড়িয়ে পড়ছে লালা। চোখ দুটো যেন গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। রিচার্ড ঠাণ্ডা মাথায় গলায় চাপ বাড়িয়েই চলল। এক সময় নিস্তেজ হয়ে পড়ল লুইজি। মারা গেছে। ছেড়ে দিল ওকে রিচার্ড। মেঝেতে পড়ে গেল নিষ্প্রাণ দেহটা।

'ঠিক আছে, ডেভিড, বলল রিচার্ড, এখন তুমি কথা বলতে পারো।

তুমি..... তুমি ওকে খুন করেছ!'

রিচার্ড আমার রুমাল দিয়ে ওর মুখ মুছল।

'চমৎকার কথা। আমিই কি ওকে খুন করেছি, নাকি করিনি? সত্যি কি ও জীবিত ছিল নাকি মৃত ছিল?

'তুমি আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছ। অবশ্যই ও মৃত ছিল। এটা নিছক একটা স্বপ্ন। কিন্তু-'

'কিন্তু এটা স্বপ্ন হলেও তোমার বাড়িতে এরকম একটা লাশ এভাবে ফেলে রাখা ঠিক হচ্ছে না, তাই না? ওর আসল জায়গা যেখানে সেখানেই ওকে আমাদের রেখে আসা উচিত। ফেয়ারফিল্ড গোরস্থান।'

'এটা কখনই সম্ভব নয়।'

'তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব। আমি লুইজিকে নিয়ে লিফটে নেমে যাব নিচে, একটা ট্যাক্সি ডাকব এবং ওটাতে করেই ওকে গোরস্থানে রেখে

আসব। ব্যস, ঝামেলা শেষ। এখন তুমি চুপ করো। আমি অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত আর কথা বলতে পারবে না।'

ঠাণ্ডা মাথায় কাজ শুরু করল রিচার্ড। প্রথমেই আমার টুপি আর গ্লাভস পরে নিল। লুইজির পার্স থেকে ঘোমটাটা বের করল। আটকে দিল ওর টুপির সাথে। কোট ঠিকঠাক করল, অবিন্যস্ত চুলগুলো আঁচড়ে দিল আগের মত। এখন লুইজির চেহারায় ধস্তাধস্তির কোন চিহ্ন নেই। হাতে তুলে নিল লাশটা। যেন একটা বাচ্চা মেয়েকে বহন করছে এইভাবে স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে গেল লিফটের দিকে।

বেল বাজাল রিচার্ড। লুইজিকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে অপেক্ষা করতে লাগল। খানিক পর লিফট এল। দরজা খুলে দিল। জিমি, আমাদের নৈশ প্রহরী।

'ছোট্ট একটা সমস্যা হয়ে গেছে, জিমি', বলতে বলতে ভেতরে পা রাখল রিচার্ড। লুইজিকে জড়িয়ে ধরে আছে। এই সময় লুইজির কোল থেকে ওর পার্সটা পড়ে গেল। যেভাবে রিচার্ড আশা করেছিল, সেভাবে জিমি ঝুঁকল, তুলে নিল পার্স। ফিরিয়ে দিল রিচার্ডকে।

'এই ভদ্রমহিলা-' রিচার্ড খুব স্বাভাবিক গলায় বলতে লাগল',এখানে আসার আগে থেকেই মাতাল হয়ে পড়েছিলেন। আমি তাঁকে শুধু একটা ককটেল খেতে দিয়েছি। ইনি ওটা খেয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। এখন আমাকেই ওঁর বাসায় যেতে হচ্ছে ওঁকে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। তুমি কি কষ্ট করে আমার জন্যে একটা ট্যাক্সি, ডেকে দিতে পারবে ?'

কেন পারব না, মি. কার্পেন্টার। অবশ্যই পারব', জিমি বিগলিত গলায় বলল।

ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এলো জিমি। রিচার্ড লুইজিকে নিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। ওর হাবভাব এমন যেন এই গভীর রাতে নিউ ইয়র্কের রাস্তায় একটা লাশকে নিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ার মতো স্বাভাবিক কাজ আর হয় না। 'কোথায় যাবেন, স্যার ?' জানতে চাইল ট্যাক্সি ড্রাইভার।

'ফেয়ারফিল্ড গোরস্থান।'

'ফেয়ারফিল্ড গোরস্থান। এতো রাতে ? আপনি আমার সাথে মশকরা করছেন না তো, স্যার ?'

'একেবারেই না।' রিচার্ড ড্রাইভারের প্রশ্নে খুবই বিরক্ত হলো। ওর কথার যদি কেউ দাম না দিতে চায় ও এভাবেই বিরক্ত হয়। 'এই ভদ্রমহিলা মারা গেছেন এবং আমি তাকে কবর দিতে যাচ্ছি', ভ্রূ কুঁচকে বলল ও।

'শুনুন, স্যার!' ঘুরল ড্রাইভার। রাগে গনগন করছে মুখ। 'এই রাত দুপুরে এসব ঠাট্টা ইয়ার্কি ভাল লাগে না। আপনি সত্যি কোথায় যেতে চান বলুন, না হয় দয়া করে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ুন।'

রিচার্ড এক মুহূর্ত সিদ্ধান্তহীনততায় ভুগল। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'দুঃখিত। তোমার সাথে আমি সত্যি ইয়ার্কি করছিলাম। যাকগে, আমাদের রিভারডেল নিয়ে চলো-নয়শো সাঁইত্রিশ ওয়েস্ট স্ট্রিট।'

'হ্যাঁ, এটা একটা ঠিকানা হতে পারে বটে!' বিড়বিড় করে বলল ড্রাইভার। স্টার্ট দিল ট্যাক্সিতে। নিউ ইয়র্কের ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে আমরা ছুটে চললাম। রিচার্ড এখনও লুইজিকে ধরে আছে। যেন একটা বাচ্চা মেয়েকে আদর করছে। ড্রাইভারকে শুনিয়ে ও বলল, 'আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরো, সোনা!'

টাইমস স্কোয়ার পেরিয়ে গেলাম আমরা। উজ্জ্বল আলো এসে পড়ল লুইজির মুখে। ট্রাফিক জ্যামে দাঁড়াতে হলো। লোকজন পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। অলস দৃষ্টি ছুঁড়ে দিচ্ছে কেউ কেউ আমাদের দিকে। মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছে। বিশ্বের ব্যস্ততম শহরের কেন্দ্রস্থল ধরে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। কারও মনে সামান্যতম সন্দেহও জাগছে না, ট্যাক্সিতে রিচার্ডের গায়ে হেলান দেয়া ঘোমটা পরা এই মহিলাটি একটু আগে খুন হয়েছে। আসলে একটা লাশ বহন করে চলেছে রিচার্ড।

হেনরি হাডসন হাইওয়েতে উঠে ট্যাক্সি ছুটল রিভারডেলের দিকে। যে বাড়ির ঠিকানা রিচার্ড ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দিয়েছে ওটা আমারই বাড়ি। অ্যান আর আমার জন্যে বাড়িটা কিনেছি আমি। বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামলো। রিচার্ড সাবধানে লুইজিকে নামাল ট্যাক্সি থেকে। পকেট থেকে টাকা বের করল। ভাড়া দিয়ে দিল। চলে গেল ট্যাক্সি ড্রাইভার। অন্ধকার রাত। শূন্য রাস্তা। এমনকি একটা কুকুর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না কোথাও। কেউ দেখল না, কেউ জানল না একটা লাশ নিয়ে রিচার্ড বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছে। পকেট থেকে চাবি বের করল সে। দরজা খুলল। লুইজিকে নিয়ে ঢুকলো ভেতরে।

ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালল না রিচার্ড। লিভিংরুমে একটা সোফার ওপর ছুঁড়ে ফেলল লুইজিকে। বসল ওর বিপরীতে। সিগারেট ধরাল। 'ঠিক আছে, ডেভিড, এখন তুমি কথা বলতে পারো', বলল সে।

'রিচার্ড', আগে আমি রাগে আগুন হয়ে বললাম, 'তুমি পাগল হলে নাকি ? লুইজিকে আমার অ্যাপার্টমেন্টে রেখে আসার বদলে এখানে নিয়ে এসে মোটেই বুদ্ধির পরিচয় দাওনি তুমি। এখন আমরা কি করব শুনি?'

'আমারই বা আর কি করার ছিল ?' বিরক্ত হয়ে বলল রিচার্ড, নিজেই তো দেখলে ওই ব্যাটা ড্রাইভারটা গোরস্থানে যেতে চাইল না।'

এই সময় আমাদের ভয়ানক চমকে দিয়ে উঠে বসল লুইজি।

লুইজিকে ভয়ানক অসুস্থ লাগছে। হাত দিয়ে গলা ডলল ও কিছুক্ষণ। যখন কথা বলল, ব্যাঙের আওয়াজ বেরুল গলা থেকে। 'ডেভিড', রেগে মেগে বলল ও। 'তুমি-তুমি আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে।'

রিচার্ড ওর চোখের দিকে তাকালো। অশুভ, ভয়ঙ্কর একটা দৃষ্টি ফুটে উঠল চোখে। 'কাজটা দেখছি আমি ঠিক মতো করতে পারিনি।' স্বগতোক্তির মতো শোনাল কথাটা। যেন নিজের ওপর খুব বিরক্ত হয়েছে সে।

'তুমি আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে', আবার বলল লুইজি। যেন ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না ও। 'এ জন্যে তোমাকে জেলে যেতে হবে। মেরীর কসম আমি সেই ব্যবস্থা করব।'

'সেই সুযোগ তুমি আর পাবে না।', উঠে দাঁড়াল রিচার্ড। বিপজ্জনক ভঙ্গিতে এগুলো ওর দিকে। 'কাজটা আবার নতুন করে করতে হবে, এটুকুই যা বাড়তি পরিশ্রম হবে আমার।'

লুইজি কুঁকড়ে গেল। খুনে দৃষ্টিটা চিনতে পেরেছে ও। প্রচন্ড ভয় পেল। 'না, খোদার দোহাই, না।' চিৎকার করে উঠল লুইজি। 'আমি দুঃখিত ডেভিড, আমি আসলে কথাটা ওভাবে বলতে চাইনি। মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে। আমি আর জীবনেও তোমার কাছে আসব না। বিশ্বাস করো, জীবনে আর কোনদিন তোমাকে বিরক্ত করব না। আ-আমাকে মেরো না, প্লীজ!'

'আমি রিচার্ড, ডেভিড নই', খসখসে গলায় বলল রিচার্ড। 'তোমাকে খুন করা খুব কঠিন কাজ, তাই না, লুইজি ? দুইবার মরেও তুমি মরোনি। কিন্তু আর না। এই শেষ বার, এবার তোমাকে মরতেই হবে।'

'থামো, রিচার্ড!' আমি চিৎকার করে উঠলাম। 'ওকে যেতে দাও। ও চলে যাক। ও আর কখনও-'

'তুমি লুইজির মতো মেয়েদের ঠিক চেনো না, ডেভিড।' রিচার্ড আমাকে অবজ্ঞা করে বলল, 'চিনলে আর এই কথা বলতে না। যাকগে, এই ব্যাপারটা এখন শুধু আমার আর লুইজির। তুমি শুধু শুধু আমার কাজে বাধা সৃষ্টি করছ। তোমাকে আর বিরক্ত করতে দেব না। ঘুমাও ডেভিড। ঘুমাও...ঘুমাও...।'

টের পেলাম আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি। বিশাল অন্ধকারের একটা পর্দা আমাকে ঢেকে ফেলছে দ্রুত। ঠিক সেই ছেলেবেলার মত। রিচার্ড আমার সত্তা গ্রাস করছে, গ্রাস করছে...

কিছুক্ষণ পর নিজেকে আমি আমার বিছানায় আবিষ্কার করলাম। ঘুমের পোশাক পরা। রিচার্ড দাঁড়িয়ে আছে রুমের মাঝখানে। হাসছে আমার দিকে চেয়ে। 'ঠিক আছে, ডেভিড। আর কোন সমস্যা নেই। তুমি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ। আমি এখন চলে যাচ্ছি।'

'লুইজি!' আমি চিৎকার করে উঠলাম। 'লুইজির কি করেছ তুমি ?'

'রিচার্ড হাই তুলল। 'লুইজির কথা ভুলে যাও। ও আর তোমাকে কোনদিন বিরক্ত করতে আসবে না। ওর একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

'কি-কি করেছ তুমি ওর ? জবাব দাও।'

রিচার্ড হাসলো। আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, 'গুডনাইট, ডেভিড। আমি চলে যাচ্ছি। ও হ্যাঁ, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে আবার কোন কারণে ভয় পেয়ো না। মনে কোরো এটা স্রেফ একটা স্বপ্নই ছিল, কেমন ? চমৎকার মজার একটা স্বপ্ন, তাই না ?'

চলে গেল রিচার্ড। এক মুহূর্ত পর আমি চোখ মেললাম। দেয়াল ঘড়ির শব্দ ভেসে এলো কানে। ন'টা বেজেছে। বুঝলাম এতক্ষণ আসলে একটা স্বপ্ন দেখছিলাম আমি। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। তো এই আমার কাহিনী, ডাক্তার। এখন আপনার বক্তব্য কি ?

ধন্যবাদ, ডেভিড। পুরো ব্যাপারটাই এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার কাছে। আমি জিনিসটা তোমাকে ব্যাখ্যা করে বোঝালেই আর কখনও এই স্বপ্ন তুমি দেখবে না।

বলুন ডাক্তার।

তোমার প্রথমা স্ত্রী লুইজির মৃত্যুর আগে তুমি অনেকবার ওর মৃত্যু কামনা করেছ, তাই না ?

জ্বী, ডাক্তার। আমি মনেপ্রাণে চেয়েছি ডাইনীটা যেন মারা যায়।

রাইট। তাই ও যখন মারা গেল তখন নিজের অবচেতন মনের কাছে অপরাধী হয়ে গেলে তুমি। ভাবলে এই মৃত্যুর জন্যে তুমিই দায়ী। তুমিই খুন করেছ ওকে। অ্যানকে যখন বিয়ে করতে যাচ্ছিলে তুমি, অবচেতন মনে আরেকটা চিন্তা আবার প্রবল হয়ে উঠল। তুমি ভাবলে লুইজি হয়তো সত্যিই মারা যায়নি। ও হয়তো হঠাৎ করেই ধূমকেতুর মতো উদয় হয়ে তোমার সমস্ত সুখ ছারখার করে দেবে। আর তারপর থেকেই তুমি এই দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করো। সম্ভবত তোমার অ্যালার্ম ক্লকের ধ্বনি শুনে ঘুমের মধ্যে ভেবেছ ওটা টেলিফোনের শব্দ। আর তারপরই তুমি ওই স্বপ্নটা দেখতে শুরু করো। আর সেই স্বপ্নে একের পর এক হাজির হয়েছে লুইজি, রিচার্ড ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যাপারটা এখন বুঝতে পারছ তো, ডেভিড ?

জ্বী, ডাক্তার। বুঝতে পারছি।

তাহলে তুমি কিছুক্ষণের জন্যে আবার বিশ্রাম নাও। আমি যখন তোমাকে জেগে উঠতে বলব শুধু তখন তুমি জেগে উঠবে। আর জেগে ওঠার পর থেকে তুমি এই দুঃস্বপ্নের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাবে। তোমাকে এই স্বপ্ন আর কোনদিন তাড়া করবে না। এখন বিশ্রাম নাও, ডেভিড।

জ্বী ডাক্তার।

আ, ডাক্তার ম্যানসন-

বলুন, মিসেস কার্পেন্টার ?

আপনি কি নিশ্চিত ও আর কখনও এই স্বপ্ন দেখবে না ?

অবশ্যই নিশ্চিত। ওর অবচেতন মনের অপরাধবোধ থেকেই এই দুঃস্বপ্নের সৃষ্টি। আমি ওর অবচেতন মন থেকে সেই অপরাধবোধটুকু মুছে ফেললেই ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। আর কোন সমস্যা থাকবে না।

তাহলে আমি বড়ই খুশি হব, ডাক্তার ম্যানসন। বেচারার জন্যে আমার যে কি কষ্ট হয়! ওহ্, মাফ করবেন, কলিংবেলের শব্দ শুনলাম। একটু দেখে আসি কে আবার এল। ঠিক আছে, যান।

...ওহ্, এই লোকটি তো দেখি আমাদের জন্য অনেকগুলো কম্বল নিয়ে এসেছে। দেখি দেখি, কে পাঠাল। ওমাঃ, ডেভিডের বোন পাঠিয়েছে উপহার হিসেবে। কম্বলগুলো খুব সুন্দর, না ?

হ্যাঁ, খুব সুন্দর।

এগুলো আমি খুব যত্ন করে তুলে রাখব। হুম্! কোথায় রাখা যায় ? এই তো মনে পড়েছে। ডেভিড আমাদের এই জানালার ফোকরে বেশ বড় একটা সিন্দুক বানিয়েছে। সিন্দুকটা এয়ারটাইট। পোকায় ধরারও সম্ভাবনা নেই। ঠিক আছে এটার মধ্যে এখন কম্বলগুলোকে রাখি।

ডেভিড, তুমি এখন সম্মোহিতের অবস্থা থেকে জেগে উঠতে পারো...বাঃ এই তো জেগে উঠেছ দেখছি। কেমন লাগছে ডেভিড ?

চমৎকার লাগছে, ডাক্তার। তবে আপনি ভুল করেছেন। আমি ডেভিড নই, রিচার্ড। তবে আমার একটা ব্যাপার ভেবে খুব অবাক লাগছে, ডেভিড আপনাকে যে গল্পটা শোনাল সেটা আপনি স্রেফ একটা দুঃস্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিলেন। আপনার বোঝা উচিত ছিল সত্যকে গোপন করার জন্যে ডেভিডের ওটা একটা কৌশলমাত্র। কিন্তু, আমি রিচার্ড কখনও মিথ্যে বলি না। সেদিন রাতে সত্যি সত্যি কিন্তু ফোন বেজেছিল আর-অ্যান! ওকি করছ তুমি! না, না সিন্দুকটা খুলো না খুলো না বলছি! ...ঠিক আছে, খুলে যখন ফেলেছ, আর কিছু করার নেই আমার। আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম। শুনলে তো না এখন লাশটা দেখে ভয়ে যত খুশি চিৎকার করো, আমার কিছু যায় আসে না!

দ্য কাস্ক অব আমোনটিলাডো

এডগার অ্যালান পো

আমার বন্ধু ফরটুনাটোর মতো আমিও, অর্থাৎ মন্ট্রেসর জাতিতে ইতালিয়ান এবং অভিজাত পরিবারের সন্তান। ফরটুনাটোকে 'বন্ধু' বললাম কি ? উহুঁ ভুল বলেছি। বরং ও আমার যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়েও নিকৃষ্ট, উদ্ধত এবং সব সময় সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভোগে।

ফরটুনাটো অনেক ক্ষতি করেছে আমার। সব মুখ বুজে সহ্য করেছি। কিন্তু যেদিন ও আমাকে অপমান করল, মাথায় জ্বলে উঠল আগুন। আর সহ্য করতে পারলাম না। প্রতিজ্ঞা করলাম শোধ নেব। ভয়ঙ্কর শোধ।

না, অপমানিত হওয়ার পরেও ফরটুনাটোকে কোন গালমন্দ করিনি আমি, হুমকিও দেইনি। শুধু মনে মনে প্রতিশোধের এক ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা করেছি। ঠিক করেছি সুযোগ পেলেই ছোবল মারব। বুঝিয়ে দেব আমার প্রতিহিংসা কত ভয়ানক। ফরটুনাটো অবশ্য জানত ওর ওপর ভয়ানক রেগে আছি আমি। জানত সুযোগ পেলে অপমানের শোধ না নিয়ে ছাড়ব না। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি আমার প্রতিশোধের ধরণ এতো নির্মম হবে।

অপমানে জর্জরিত আমি ফরটুনাটোকে দেখলেই শুধু হাসতাম। কিন্তু অন্তরে যে আমার প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে, হাসিটা যে নিতান্তই কৃত্রিম, হতভাগা সেটা বুঝতে পারত না বলে উৎকট উল্লাসে ভেতরে ভেতরে আমি তখন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছি।

ফরটুনাটোকে শহরের সবাই বেশ মান্যগণ্য করত, ভয়ও পেত অনেকেই। তবে তার একটা দিক ছিল খুবই দুর্বল। জ্ঞানের অস্বাভাবিক অহঙ্কার ছিল তার আর উৎকৃষ্ট মদ পেলে ডাইনে-বাঁয়ে তাকাবার ফুরসৎ থাকত না মোটেই।

মদ আমারও বেশ পেয়ারের জিনিস। আমাদের গ্রামের মদ তো গুণেমানে ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। আর ফরটুনাটোর মতই যখনই সুযোগ পেতাম সেরা মদে সাজাতাম আমার ভাঁড়ার ঘর। টাকা পয়সার অভাব নেই আমার। খুবই বড়লোকের সন্তান আমি। তাই ফরটুনাটোর সঙ্গে সম্পদ আর ঐশ্বর্যের প্রতিযোগিতায় কখনোই পিছিয়ে থাকিনি। আমার সেরা সম্পদ ছিল এই মদের বোতলগুলো। আমার সুরম্য অট্টালিকাসম বাড়ির সেলারে ওগুলো সাজিয়ে রাখতাম আমি।

একদিন সন্ধ্যায় আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এলাম আমি। কার্নিভাল উৎসবের সময় ওটা। সবাই পেট পুরে খাচ্ছে, যার যত ইচ্ছে মদ ঢালছে গলায়। কারণ এর পরেই ছয় হপ্তা ধরে উপবাসের পালা শুরু হতে যাচ্ছে, চলবে সেই ইস্টারের আগ পর্যন্ত। উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা সবাই, যেন পাগল হয়ে গেছে প্রত্যেকে। আর

সবার মতো ফরটুনাটোও রঙ ঝলমলে পোশাক পরে আছে। ওর পরনে বহুরঙা স্ট্রাইপের ভাঁড়ের পোশাক, মাথায় ঘণ্টা বাঁধা ডাবল টুপি।

আমাকে দেখে হাসলো ফরটুনাটো, যেন খুব খুশি হয়েছে। সন্দেহ নেই প্রচুর গিলেছে ব্যাটা। আমিও ওকে দেখে খুব খুশি হওয়ার ভান করে ওর বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললাম, 'মাই ডিয়ার ফরটুনাটো, তোমাকে আজকে যা চমৎকার লাগছে! শোনো, তোমার জন্যে আমি দারুণ একটি খবর নিয়ে এসেছি। এই তো সেদিন বিশাল এক মদের ব্যারেল কিনলাম। বিক্রেতা বলল ওটা নাকি আমোন্টিলাডো।। কিন্তু আমার ঠিক বিশ্বাস হয়নি ওর কথা।'

আমরা দু'জনেই জানি আমোন্টিলাডো খুব দামী মদ; শেরী, দক্ষিণ স্পেনের মন্টিলা শহরেই এটা শুধু তৈরি হয়।

'অসম্ভব!' বলল ফরটুনাটো। 'আমোন্টিলাডো ? এই সময়ে ?'

'বললামই তো আমার নিজেরও কেমন সন্দেহ হচ্ছিল' বললাম আমি।

'তোমার সঙ্গে আলাপ না করেই পুরো ব্যারেলের দাম চুকিয়ে দিয়ে বোধহয় ভুলই করেছি। কারণ জানি তো মদ চেনার বিষয়ে তুমি একজন এক্সপার্ট। কিন্তু ওই সময় তোমাকে না পেয়ে দামদরও আর করা হয়নি।'

'আমোন্টিলাডো!' বিড়বিড় করে বলল ফরটুনাটো। যেন বিশ্বাস করতে পারছে না কথাটা।

'সন্দেহ তো আমিও করেছি', বললাম। বুঝতে পারছি ও আমার ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছে। 'কিন্তু ব্যাপারটা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাই আমি। তবে তুমি ব্যস্ত না থাকলে তোমাকেই জিনিসটা দেখাতাম আমি। এখন বাধ্য হয়ে লুচেসির কাছে যেতে হচ্ছে আমায়। অবশ্য মদের ব্যাপারে ভালমন্দের জ্ঞানটি ওরও বেশ টনটনে। ও-ই হয়তো আমাকে বলতে পারবে...।'

'লুচেসির কাছে আমোন্টিলাডো যা সাধারণ শেরীও তাই', রেগে উঠল ফরটুনাটো, শিকার আরও কাছিয়ে আসছে ফাঁদের দিকে, বুঝতে পেরে খুশি লাগল আমার।

'কিন্তু লোকে তো বলে তোমার মতই নাকি সে মদের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ।' বললাম আমি।

'লোকে কিচ্ছু জানে না', ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল ফরটুনাটো। 'চলো, আমিই যাব।'

এতক্ষণে ব্যাটা খপ্পরে পড়েছে। 'কোথায় ?' যেন কিছুই জানি না, এভাবে জানতে চাইলাম আমি।'

'তোমার মদের ভল্টে।'

'নো, মাই ফ্রেন্ড, নো। তোমার উৎসবের আনন্দটা আমি মাটি করতে চাই না। তুমি খুব ব্যস্ত। লুচেসি...।'

'আমি অত ব্যস্ত নই। চলো।'

'উহুঁ। ভল্টে ভয়ানক ড্যাম্প। তাছাড়া তোমার খুব সর্দিও লেগেছে।'

'তারপরও চলো। সর্দিতে কিচ্ছু হবে না। আমোন্টিলাডো! ব্যাটা নির্ঘাত তোমাকে ঠকিয়েছে। আর লুচেসির কথা ভুলে যাও। গর্দভটা জানেই না আমোন্টিলাডোর সঙ্গে সাধারণ শেরীর কি পার্থক্য।'

কথা বলতে বলতে আমার হাত ধরে রীতিমত টানাটানি শুরু করে দিল ফরটুনাটো। প্রায় ঠেলে নিয়ে চলল আমার বাড়ি অভিমুখে।

বাড়ি পৌঁছে দেখি চাকরবাকরদের টিকিটিও নেই। নির্ঘাত সবক'টা কার্নিভাল উৎসবের মজা মারতে গেছে। অথচ বাইরে যাবার আগে পইপই করে বলে গিয়েছিলাম আগামীকাল সকালের আগে ফিরব না আমি, কেউ যেন কোথাও না যায়। কিন্তু যেই বেরিয়ে পড়েছি, সঙ্গে সঙ্গে ওরাও ছুট লাগিয়েছে উৎসবের উদ্দেশে।

দেয়াল থেকে দুটো মশাল নিলাম আমি। একটা ফরটুনাটোকে দিয়ে অন্যটা হাতে নিয়ে আগে বাড়তে শুরু করলাম আমরা। অনেকগুলো ঘর পেরিয়ে মদ রাখার ভল্টের প্রবেশপথে এসে দাঁড়ালাম। লম্বা, জীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলাম নিচে। ফরটুনাটোকে বললাম আমাকে যেন সাবধানে অনুসরণ করে।

ফরটুনাটো টলতে টলতে এগোল, প্রতিটি পদক্ষেপে ওর টুপির সঙ্গে বাঁধা ঘণ্টাগুলো বেজে উঠল টুংটাং শব্দে। লম্বা, অন্ধকার প্যাসেজওয়ে দিয়ে নীরবে এগিয়ে চলেছি আমরা, ফরটুনাটো জিজ্ঞেস করল, 'আমোন্টিলাডো ? কোথায় ?'

'এই তো আরেকটু সামনে', বললাম আমি।

অবশেষে আমরা প্যাসেজওয়েটার মাথায় এসে পৌঁছুলাম। দাঁড়িয়ে পড়লাম ড্যাম্প পড়া সেলারে। এই সেলার আসলে আমার পূর্বপুরুষ মনট্রেসরদের কবরখানা।

'দেখেছ কিরকম স্যাঁতসেঁতে দেয়াল', বললাম আমি। খক খক কাশল ফরটুনাটো, কফ ফেলল। বেশি মদ্যপানের কারণে ওর চোখ দিয়ে জল গড়াতে শুরু করেছে।

'কবে থেকে সর্দি বাঁধিয়েছ ?' জানতে চাইলাম আমি।

এমন ভয়ানক কাশতে থাকল ফরটুনাটো যে অনেকক্ষণ কথাই বলতে পারল না।

এটা তেমন কোন ব্যাপার নয়', বলল ও।

'শোনো', দৃঢ় গলায় বললাম আমি। 'আমরা এখনই এখান থেকে চলে যাব। কারণ এতো ঠাণ্ডায় যদি তোমার কিছু হয়ে যায় নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না আমি। তুমি ধনী, সম্মানিত এবং সবার প্রিয়পাত্র। এভাবে এখানে আরও কিছুক্ষণ থাকলে তোমার শরীর নিশ্চই আরও খারাপ হবে। সেটা আমি হতে দিতে পারি না। আর লুচেসি যখন আছেই....।'

'রাখো তোমার লুচেসি!' চেঁচিয়ে উঠল ফরটুনাটো। ভাঙা শোনাল গলা। 'বললামই তো, সর্দিটা এমন ভয়ঙ্কর কিছু নয়। এতে আমি মরে যাব না।'

'তা অবশ্য ঠিক', বললাম আমি।'তবুও একটু সতর্ক করে দিলাম আর কি। ঠিক আছে, তুমি যখন ছাড়বেই না তাহলে নাও এখান থেকে কয়েক ঢোক খেয়ে নাও। শরীরটা গরম থাকবে।'

সেলারে সাজানো এক সাইজের বোতলের লম্বা সারি থেকে একটা বোতল তুলে দিলাম ফরটুনাটোর হাতে। 'খাও', বললাম ওকে।

মুখের কাছে বোতলটা তুলে ধরল ফরটুনাটো, লোভে চকচক করছে চোখ। আমার দিকে ফিরে নড় করল ও, আবারও মিষ্টি শব্দে বেজে উঠল ঘণ্টাগুলো।

'তোমার পূর্বপুরুষরা, যারা এখানে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে', ঠোঁটে বোতলটা ছোঁয়াল ফরটুনাটো।

'আর আমি পান করছি তোমার দীর্ঘ জীবন', বললাম আমি। তারপর একসঙ্গে মদ্যপান করলাম আমরা।

'তোমাদের বংশমর্যাদার সূচক কি ?'

'বিশাল পা, সোনালি রঙের, পেছনে নীল ব্যাকগ্রাউন্ড। পা-টাকে জড়িয়ে থাকে একটা সাপ, সাপটার বিষদাঁতগুলো পড়ে থাকে পায়ের পাতার নিচে।'

'আর তোমাদের বংশমর্যাদায় সূচকের আদর্শ-বাণী কি ?'

'নেমো মি ইমপুন লাসোসিট! অর্থাৎ যে আমাকে আক্রমণ করবে সে সাবধানে থেকো!'

প্রচুর মদ পেটে যাওয়ার কারণে ফরটুনাটোর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, হাঁটার সঙ্গে বেজে উঠছে ঘণ্টা। ভল্টগুলোর একেবারে ভেতরের দিকে চলে এলাম আমরা। ভূ-গর্ভস্থ সমাধিস্তম্ভগুলো এখন আমাদের সামনে। মানুষের হাড়গোড় গাদা করে রাখা দেয়ালের সঙ্গে। আর আমার সবচেয়ে দামী মদের ভান্ডার ওগুলোর পাশেই। আমি মদের ব্যারেলগুলো এখানে রেখেছি কারণ জায়গাটা খুব ঠাণ্ডা। নষ্ট হবে না আমার এতো মূল্যবান সম্পদ।

এখানে এসে আমি থমকে দাঁড়ালাম, ফরটুনাটোর কনুই খামচে ধরলাম।

'স্যাঁতসেঁতে ভাবটা', বললাম আমি, 'খেয়াল করেছ বেড়েই চলেছে। আমরা এখন ঠিক নদীর তলায় এসে দাঁড়িয়েছি। দেখছ কঙ্কালগুলোর গা কেমন ভেজা ভেজা। চলো, চলো, না হলে তোমার সর্দি...।

'বাদ দাও তো!' বলল ফরটুনাটো, 'চলতে থাকো। তার আগে এসো আরেকবার গলা ভিজিয়ে নিই।'

এক ঢোকে সে বোতলটা শুন্য করে ফেলল। ঝিকমিক করে উঠল চোখ দুটো।

'এখন চলো আমোন্টিলাডোর স্বাদ নিয়ে আসি', চেঁচিয়ে বলল ফরটুনাটো।

'তবে তাই হোক', বললাম আমি। একটা হাত বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে। ও প্রায় ঝুলে যেতে লাগল আমার সঙ্গে।

নিচু খিলানের একটা প্যাসেজ ধরে চললাম আমরা। তারপর আবার নামতে শুরু করলাম নিচে। অবশেষে মাটির নিচের একটি কক্ষে এসে ঢুকলোম। বাতাস এখানে এতো কম যে আমাদের মশালগুলো প্রায় নিভু নিভু হয়ে এল।

কক্ষটির শেষ মাথায় আরেকটি ছোট ঘর। ওটার তিন দিকের দেয়ালে মানুষের কঙ্কাল, গাদাটা ঠেকেছে দেয়ালে। কিন্তু চতুর্দিকের দেয়ালের কঙ্কালগুলো ছড়িয়ে

ছিটিয়ে আছে মেঝেতে। এদিকের দেয়ালটা ফাঁকা। আমরা ওটার ভিতরে একটি চোরকুঠুরী দেখতে পেলাম। হাত চারেক গভীর, আনুমানিক তিন হাত চওড়া, আর উঁচু হবে ছয়-সাত হাত। চোরকুঠুরীটা সম্ভবত মানুষের হাতে তৈরি, তবে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরি না হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ জায়াগাটার দুই পাশে বিশাল দুই পাথুরে স্তম্ভ সেলারের ছাদে গিয়ে ঠেকেছে, ঠেক দিয়ে রাখছে ওটাকে।

চোরকুঠুরীর দেয়ালটা শক্ত, গ্রানিট পাথরের। দেয়ালের ওপরে দুটো লোহার স্টাপল ইংরেজি ইউ অক্ষরের মত, ফুট দুয়েক ব্যবধান দুটো মাঝখানে। দুটোতেই দুটো লম্বা লোহার চেইন ঝুলছে, চেইন দুটোর মাথায় হ্যান্ডকাফের মতো 'রিস্টলক'।

ফরটুনাটো তার প্রায় নিভে যাওয়া মশালটা উঁচু করে ধরল, চোরকুঠুরীর গভীরতা কতখানি দেখতে চাইছে। কিন্তু কাজ হলো না। কারণ আলো খুবই কম।

'এখানে', বললাম আমি। 'এখানেই সেই বিখ্যাত আমোন্টিলাডো এনে রেখেছি আমি। লুচেসি যদি এখন থাকত এখানে...'

'ওই গর্দভটার কথা আর মুখে এনো না!' বাধা দিল আমাকে ফরটুনাটো, টলমল পায়ে এগোল সামনের দিকে। ওকে তৎক্ষণাৎ অনুসরণ করলাম আমি। চোরকুঠুরীর দেয়ালের শেষ মাথায় যেন অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে পৌঁছে গেল সে। কিন্তু দেয়ালে মুখ ঠেকে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো হতভম্ব হয়ে।

মাত্র এক সেকেন্ড সময় লাগল আমার লোহার স্টাপল থেকে চেইনটা টেনে নামাতে, বিদ্যুৎগতিতে আমি চেইন দিয়ে ওর কোমর পেঁচালাম, হাত দুটো আটকে দিলাম লোহার হ্যান্ডকাফে। ফরটুনাটো এতো মাতাল ছিল যে বাধাই দিতে পারল না। আমি গ্রানিটের দেয়ালটার সঙ্গে ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললাম। হাত দুটো 'রিস্টলক;-এ বেঁধে, চাবিটা ফেলে দিয়ে পিছু হটে এলাম।

'হাত দুটো দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরো', বললাম আমি। 'বুঝবে ঠ্যাঙা কাহাকে বলে। এখন নিজেকে মুক্ত করার জন্য চিৎকার করো, কাঁদো, আমার কাছে প্রাণভিক্ষা চাও...চাইবে না ? ঠিক আছে, তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে তোমাকে একটা মজা দেখিয়ে যাব।'

'আমোন্টিলাডো!' চিৎকার করে উঠল ফরটুনাটো। এখনও বিস্ময়ের ভাবটা কাটেনি ওর।

'ঠিক', বললাম আমি। 'আমোন্টিলাডো।'

কথা বলতে বলতে আমি কাজ শুরু করে দিলাম। হাড়গোড়ের গাদটাকে একপাশে সরিয়ে দালান তোলার পাথর আর সিমেন্ট বের করলাম ওখান থেকে। জিনিসগুলো আগেই এখানে রেখে গিয়েছিলাম আমি।

আমার লম্বা জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করলাম পালস্তারা লাগানোর বেলচা। তারপর চোরকুঠুরীর প্রবেশ পথের সামনে দেয়াল তুলতে শুরু করলাম।

পাথরের প্রথম স্তরটা সিমেন্ট মাখিয়ে খুব দ্রুত তুলে ফেললাম। কাজ করতে করতে টের পেলাম ফরটুনাটোর মাতলামি ভাবটা কেটে আসছে। গোঙানির মতো

একটা শব্দ শুনতে পেলাম-তবে ঠিক মাতালের কান্না নয়। তারপর শব্দটা হঠাৎ করেই থেমে গেল। লম্বা নীরবতা নেমে এল। আমি দ্বিতীয় স্তরটা তুলে ফেললাম...তারপর তৃতীয়...এবং চতুর্থটি।

এইসময় ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল লোহার চেইন। অনেকক্ষণ ধরে বাজতেই থাকল। শব্দটা শোনার লোভে হাতের কাজ গুটিয়ে হাড়ের গাদার ওপর চুপচাপ বসে থাকলাম।

শব্দটা থামাল আবার কাজ শুরু করলাম। কোন রকম বাধা ছাড়াই পাথুরে দেয়ালের পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম স্তর পর্যন্ত তুলে ফেললাম। দেয়ালটা এখন আমার প্রায় বুক সমান। কাজে একটু বিরতি দিলাম। মশালটা উঁচু করে ধরলাম যাতে আলোটা চোরকুঠুরীতে গিয়ে পড়ে।

তীক্ষ্ণ এবং তীব্র একটা আর্তচিৎকার ভেসে এলো ভেতর থেকে। এক মুহূর্তের জন্যে কেঁপে উঠলাম, দোটানায় ভুগলাম কয়েক সেকেন্ড। ওর গলা কি বাইরের কেউ শুনতে পাবে ? নাহ্, পরক্ষণে নাকচ করে দিলাম চিন্তাটা। সেরকম কোন চান্সই নেই। কঠিন গ্রানিটের দেয়ালে হাত রাখলাম আমি। সন্তুষ্টি বোধ করলাম মনে মনে।

আবারও চিৎকার করে উঠল ফরটুনাটো। গলা যেন ছিঁড়ে যেতে চাইল ওর, কিন্তু থামলো না। আমিও পাল্টা চিৎকার করলাম, যেন ভেংচি কাটলাম ওর চিৎকারের প্রত্যুত্তরে। আমার গলার জোরে ওর চিৎকার ডুবে গেল। থেমে গেল ফরটুনাটো।

আট, ময় এবং দশ নম্বর স্তরও তুলে ফেললাম আমি দ্রুত। ঘড়ির দিকে তাকালোম। মাঝরাত। কাজটা প্রায় শেষ করে এনেছি আমি। সর্বশেষ অর্থাৎ এগারোতম স্তরটাও এবার তুলে ফেললাম। এখন শুধু ছোট্ট একটি ফোকরের মতো রইল, একটা পাথর বসিয়ে প্লাস্টার করে দিলেই হলো, ব্যস, দেয়ালটার কোথাও কোন ছিদ্র থাকবে না।

এই সময় চোরকুঠুরী থেকে ভেসে এলো নিচু গলার হাসি। আমার ঘাড়ের পেছনের চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল। হাসতে হাসতে কথা বলল ফরটুনাটো, করুণ আর শীতল গলায়। বুঝতে কষ্ট হলো এটাই সেই চির উদ্ধত আর দুর্বিনীত বন্ধু ফরটুনাটোর কণ্ঠ।

'হা! হা! হা!-হি!হি!- দারুণ রসিকতা জানো, হে- দারুণ রসিকতা জানো, হে-দারুণ', ফিসফিস করে বলল ও। 'এই ঘটনাটা নিয়ে আমরা পরে অনেক তামাশা করতে পারব, সত্যি! হি! হি! হি!'

'আমোন্টিলাডো! চিৎকার করে উঠলাম আমি।

'হি! হি! হি!-হ্যাঁ, আমোন্টিলাডো। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে, তাই না ? ওরা সবাই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে-আমার বউ এবং অন্য সবাই। চলো, যাই।'

'হ্যাঁ', বললাম আমি, 'চলো যাই।'

'ঈশ্বরের দোহাই বলছি, মনট্রেসর!'

'হ্যাঁ', বললাম আমি, 'ঈশ্বরের দোহাই বলছি।'

কিন্তু আমার কথার কোন জবাব এলো না। অধৈর্য হয়ে উঠলাম আমি। জোরে ডাকলাম, 'ফরটুনাটো!'

এবারও জবাব এলো না। ছোট্ট ফোকরটা দিয়ে একটা মশাল ফেলে দিলাম চোরকুঠুরীর ভেতরে। শুধু ঘণ্টার টিং টিং শব্দ ভেসে এল।

হঠাৎ বমি পেতে শুরু করল আমার, শরীর কেমন দুর্বল ঠেকল। এটা এই স্যাঁতসেঁতে পরিবেশটার জন্যে। আমি তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করলাম। শেষ পাথরটা বসালাম ফোকরে, প্লাস্টার দিয়ে লাগিয়ে দিলাম ওটা সদ্য নির্মিত দেয়ালের সঙ্গে। তারপর হাড়ের গাদাগুলো দিয়ে ঢেকে দিলাম দেয়ালটা।

গত অর্ধশতাব্দীতে এই কংকালগুলোকে কেউ বিরক্ত করেনি। ওকেও কেউ বিরক্ত করতে আসবে না। শান্তিতে বিশ্রাম নিতে দাও ওকে।

দ্য মার্ডারেস

ম্যাক্স ভ্যান ডারভির

অনেক সয়েছে সে। হ্যারী লোথারিওর আর ক্ষমা নেই। তাকে এবার অবশ্যই মরতে হবে।

মোনা রোপ দোকান থেকে কম দামী একটা হ্যাট কিনল, লিপস্টিক কিনল আরেক দোকান থেকে, আর বেলচাটা কম দামে পেয়ে গেল এক ডিসকাউন্ট স্টোরে। জিনিসগুলো নিয়ে ভাড়া করা সেডানে উঠল মোনা। চেহারায় নিস্পৃহ ভাব ধরে রাখলেও ভেতরে ভেতরে সে খুবই নার্ভাস।

খুব সাবধানে গাড়ি চালাল মোনা যেন অ্যাক্সিডেন্ট না হয়। দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় না। বাণিজ্যিক এলাকা ছাড়িয়ে রিভারভিউ বুলেভার্দের দিকে মোড় নিল মোনা। তার বাঁ দিকে সবুজ ঘাসের প্রশস্ত লন সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অভিজাত বাড়িগুলো। আর ডানের ঢাল মিশেছে নদীর কিনারায়। এদিকে বড় বড় গাছপালার আড়ালে মাঝে মাঝেই চোখে পড়ে বড়লোকদের দামী বাড়ির ছাদ।

বুলেভার্দ থেকে মোড় ঘুরে বার্নহিল্ট ড্রাইভওয়েতে চলে এলো মোনা পাথুরে, সুদৃশ্য একটি বাড়ির ডাবল গ্যারেজের বন্ধ দরজার সামনে ব্রেক কষল। পার্স থেকে দ্রুত চাবি নিয়ে দরজা খুলল সে, সেডানটাকে ভেতরে ঢোকাল, তারপর আবার ফিরে চলল বুলেভার্দের উদ্দেশে। এক সেকেন্ডের জন্য ঘাড় ঘুড়িয়ে বাড়িটার দিকে চাইল মোনা, খঁচ করে ঈর্ষার কাঁটা বিঁধল বুকে। স্যালি লাফহার্টি, তার বাল্য বন্ধু, হিউস বার্নহিল্টকে বিয়ে করে কত সুখে আছে! ওরা দু'জনেই এখন ইউরোপে, সামার বিজনেস ভ্যাকেশন কাটাতে গেছে। যাবার আগে স্যালি তার বাড়ির একগোছা ডুপ্লিকেট দিয়ে গেছে মোনাকে।

'উইকএন্ডে যে কোন সময় চলে আসিস এখানে'বার বার বলেছে স্যালি।

'এটা ফ্রান্সের রিভিয়েরা নয় বটে, কিন্তু এখানে এলে তোর মন ভাল হয়ে যাবে। নদীতে ইচ্ছেমত সাঁতার কাটতে পারবি, পার্টি দিতে পারবি।'

মোনা বুলেভার্দের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে একটা ট্যাক্সি ডাকলো। বিশ মিনিট পরে আবার ডাউন টাউন চলে এল। দুই ব্লক পরে ওর পার্ক করা গাড়িটার দিকে দ্রুত এগুলো। এখন পর্যন্ত সব কিছু প্ল্যান মাফিক ঠিকঠাক চলছে। কপালের ঘাম মুছলো মোনা, ঘামে ভেজা হাতের দিকে চেয়ে ভ্রূ কোঁচকাল, গাড়ির সীটে রাখা বেদিং স্যুট দিয়ে হাতটা পরিষ্কার করল, তারপর স্টার্ট দিল গাড়িতে। বাড়ি ফিরছে মোনা রোপ, যে বাড়িতে হ্যারী রোপের সঙ্গে দীর্ঘ ষোলোটা বছর এক সঙ্গে কাটিয়েছে সে।

তবে আর নয়। আর হ্যারীর সাথে এক সঙ্গে থাকতে রাজি নয় মোনা। নাটকের মঞ্চ তৈরি হয়ে গেছে, এবার ঘটতে শুরু করবে ঘটনা।

অভিজাত এই এলাকায় পুবদিকে বেটিফেয়ার চাইল্ডদের বাড়ি। মোনা, দেখল হলুদ শর্টস পরা বেটি লম্বা একটা কাঁচি নিয়ে তাদের বাগানে কাজ করছে। বাগান থেকে কয়েক গজ দূরে মোনাদের বাসা। নিজের বাসার সামনে গাড়ি দাঁড় করাল সে। বেটি মুখ তুলে চাইল, বলল, 'হাই!'

মোনা গাড়ি থেকে নামতে নামতে কষ্ট করে হাসি ফোটাল ঠোঁটে। 'হাই!'

'আজ খুব গরম পড়েছে, না ? সাঁতার কেটে এলে ?'

মোনা মনে মনে খুশি হয়ে উঠল এই কথায়। মাথা ঝাঁকিয়ে বেদিং স্যুটটা বেটির উদ্দেশ্যে নাড়ল। সব কিছু কি চমৎকার খাপে খাপ মিলে যাচ্ছে। মোনা রোপ যে বুধবার বিকেলটা সুইমিং পুলে কাটিয়েছে তার সাক্ষ্য বেটিই দেবে। বলবে, অফিসার, মোনা ওইদিন যখন বাড়ি ফেরে তখন প্রায় পাঁচটার মতো বাজে। ওর হাতে একটা বেদিং স্যুট ছিল। সে ওটা আমার দিকে তাকিয়ে নেড়েছিল।

মোনা স্বাভাবিক ভঙ্গিতে গ্যারেজে গেল, গাড়িটা যথাস্থানে রাখল, তারপর বাড়িতে ঢুকলো। বেটি ফেয়ারচাইল্ডের চোখের আড়াল হতেই চঞ্চলা হরিণী হয়ে উঠল সে। রান্নাঘরের সিঙ্কে স্যুইম স্যুটটা ডুবিয়ে কিছুক্ষণ পর ওটাকে ইউলিটি রুমের হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখল। রান্না ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো মোনা। বেটি ফেয়ারচাইল্ড আবার ঘাস কাটতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। প্রতিবেশীদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোর বদভ্যাস আছে বেটির। বিশেষ করে মোনার ব্যাপারে আগ্রহ তার প্রবল।

একটা হাইবল তৈরি করে সিগারেট ধরাল মোনা। দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালো। পাঁচটা পনেরো। আরও মিনিট পঁয়তাল্লিশ পর বাসায় ফিরবে হ্যারী। ড্রিঙ্কটা নিয়ে কিচেন টেবিলে বসল মোনা হাঁটু ভাঁজ করে। ওর পা থেকে ঝাঁকি খেলো। জোর করে স্থির হয়ে থাকল মোনা। এয়ারকুলারের থার্মোস্টাটের 'ক্লিক' শব্দে হঠাৎ চমকে উঠল সে। আবার পা ঝাঁকি খেতে শুরু করেছে। মোনা এবার আর ঝাঁকুনি থামাতে চেষ্টা করল না। গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে ঘড়ির দিকে চোখ তুলল। পাঁচটা ষোলো। এখনও চল্লিশ মিনিট। ওর হাতের লোমের গোড়ায় ফুটে উঠেছে স্বেদ বিন্দু। সিঙ্কে গিয়ে মুখ ধুলো মোনা, কলের নিচে হাত মেলে ধরল। ঈশ্বর, এতো ঘামছে কেন সে ? ঘর তো ঠাণ্ডা। নাকি খুনের আগে সব খুনীরই এ রকম অবস্থা হয় ?

আরেকটা হাইবল তৈরি করল মোনা প্রচুর সময় নিয়ে, আগেরটার চেয়ে বড়। হ্যারী নিখোঁজ হলে পুলিশ প্রথমেই তার কারণ জানতে চাইবে। ষোলো বছরের দাম্পত্য জীবনে, বিখ্যাত জুতো তৈরির কারখানা পাইপার-এ যে মানুষটা সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে আঠারো বছর কাজ করে গেছে সে কেন হঠাৎ করে হাওয়া হয়ে যাবে ? হ্যারী রোপের কোনও পাওনাদার নেই, যাদের ভয়ে সে বাড়ি ছেড়ে পালাবে। টাকা পয়সারও অভাব নেই তার। ব্যাংকে মোটা অঙ্কের অর্থ গচ্ছিত আছে, জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট। আছে চমৎকার একটি বাড়ি, দামী আসবাবপত্র, দুটো গাড়ি। হ্যারী রোপ জুয়া খেলে না, মদ্যপ নয়, অসৎ পথে টাকাও ওড়ায় না। প্রতিবেশীদের সঙ্গে হ্যারীর

সম্পর্ক খুবই ভাল। তারা জানে, স্বর্ণকেশী মোনা রোপা চল্লিশোর্ধ্ব বয়সেও যৌবন ধরে রেখেছে শক্ত হাতে এবং স্বামীর প্রতি সে খুবই বিশ্বস্ত।

আচ্ছা, এক মিনিট। হ্যারীর স্ত্রীর ব্যাপারে একটা কথা বলা যাক। মোনা রোপ কি তার স্বামীকে কোন কারণে বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারে ? নাকি এমন কোন কারণ থাকতে পারে যে মোনা হ্যারীকে খুন করে লাশ গুম করে ফেলল, তারপর 'হ্যারী নিখোঁজ' বলে পুলিশকে জানাল ? কিন্তু মোনা তার স্বামীকে খুন করবে কেন ? সেফ ডিপোজিটের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে যে টাকা আছে, ওটার জন্য ? উঁহু, বিশ্বাস হয় না। জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের টাকা দিয়ে মোনা বড়লোক হতে পারবে না। জীবন বীমা ? হ্যারী রোপ জীবন বীমা করেনি। তাহলে দেখা যাচ্ছে স্বামী নিখোঁজ হলে কিংবা মারা গেলে মোনা রোপ কোনদিক থেকেই লাভবান হতে পারছে না।

আয়নায় নিজেকে মুখ ভেঙচাল মোনা, তাকালো বাইরে। বেটি ফেয়ারচাইল্ড ঘাস কাটছে না, কিন্তু এখনও বাগানে আছে। ও কেন ওখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছে বুঝতে কষ্ট হয় না। পঁচিশের কোঠায় বয়স, হালকা পাতলা বেটির মনে রাজ্যের সন্দেহ আর অবিশ্বাস বাসা বেঁধে আছে। মেয়েটাকে দুই চোখে দেখতে পারে না মোনা।

আরও পাঁচ মিনিট পর হ্যারীর কনভার্টিবলটাকে আসতে দেখল মোনা। বেটিদের বাগানের বেড়ার সামনে দিয়ে আসার সময় কি যেন বলল সে বেটিকে। বেটি হাতের হলদে দড়ির ফাঁসটা দুলিয়ে হাসলো। হ্যারী ওর দিকে হাত নেড়ে গাড়ি ঢোকাল গ্যারেজে।

হ্যারী যখন কিচেনে ঢুকলো মোনা ততক্ষণে তার জন্য একটা নতুন ড্রিঙ্ক নিয়ে তৈরি।। হ্যারীর বয়স মোনার সমান হলেও খাটো, রোগা আর মাথায় ছোট চুল বলে ওকে আরও কম বয়েসী দেখায়। কাঁধে কোট, আলগা টাই, জামার বোতাম খুলতে খুলতে হ্যারী মোনার দিকে তাকিয়ে হাসলো। 'হাই, সুইটি। আমার জন্যই ড্রিঙ্কটা বানিয়েছ বুঝি ?'

মাথা দোলাল মোনা।

'তুমি বিকেলে সাঁতার কেটেছ ?'

'হ্যাঁ।'

রান্না ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে হ্যারী বলল, 'ড্রিঙ্কটা বাথটাবে দিয়ে যাও। আমি গোসল করব। ঘেমে একেবারে নেয়ে গেছি।'

এটা হ্যারীর বহুদিনের অভ্যাস। শীত হোক আর গ্রীষ্মই-ঘরে ফেরার পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার গোসল করা চাই-ই।

মোনা হাত মুঠি করল, প্রাণপণে চেষ্টা করল স্বাভাবিক থাকতে। কান পাতলো। কোন সাড়াশব্দ নেই। কপালে ভাঁজ পড়ল মোনার, সাবধানে লিভিং রুমে গেল। ওর বিপরীত দিকে বেডরুম, দরজা খোলা। হ্যারী করছেটা কি ?

এখনও টাবে ঢুকছে না কেন ? এই সময় বাথরুম থেকে পানি পড়ার শব্দ শুনতে পেল সে। ঢিল পড়ল পেশীতে। কিছুক্ষণ পর থেমে গেল শব্দটা। হ্যারী টাবে ঢুকেছে।

রান্না ঘরে ফিরে এলো মোনা, ড্রয়ার খুলে বাঁকানো একটা হাতুড়ি বের করল, জুতো খুলে নিঃশব্দে পায়ে ঢুকলো শোবার ঘরে। বাথরুমের দরজা ভেজানো। গলা ছেড়ে গান গাইছে হ্যারী। একটানে দরজা খুলে ফেলল মোনা। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে ভিজছে হ্যারী, মোনার দিকে পিঠ।

সোজা খুলির ওপর প্রথম আঘাতটা করল মোনা। আঘাতের চোটে সামনের দিকে ছিটকে গেল হ্যারী, কোমর ভেঙে পড়ে গেল বাথরুমের মধ্যে। গলা দিয়ে একটা আওয়াজও বেরুল না। উন্মাদিনীর মতো হাতুড়ি চালাতে লাগল মোনা, হ্যারী মারা গেছে বুঝতে পেরে এক সময় থামলো।

এই সময় গম্ভীর কণ্ঠটা শুনতে পেল মোনা।

'হ্যারী, বাড়ি আছে ?'

মুখ সাদা হয়ে গেল মোনার, শূন্য দৃষ্টিতে চাইল।

'হেই, আমি রয়েস। বাড়িতে আছ নাকি, হ্যারী ?'

রয়েস ফেয়ারচাইল্ড!

কিভাবে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে জানে না মোনা, হঠাৎ দেখল সে চলে এসেছে বেডরুমে। হাতে এখনও হাতুড়ি! স্রেফ জমে গেল মোনা। এ হাতুড়ির কারণে তো সেও মারা পড়বে!

'হ্যারী ?'

মোনা বিদ্যুৎগতিতে হাতুড়িটা বালিশের নিচে চালনা করে দিল। রয়েস ফেয়ারচাইল্ড সম্ভবত ইউটিটি রুমের কাছে চলে এসেছে। জোর করে শক্তি সঞ্চার করল মোনা, বলল, 'আসছি, রয়েস।' টলতে টলতে পা বাড়াল সামনে।

রয়েস ফেয়ারচাইল্ড লম্বা, সুদর্শন এক তরুণ। ওর এক মাথা ঝাঁকড়া কালো চুলের দিকে চাইলেই বুক কেমন শিরশির করে মোনার। রয়েসের সপ্রতিভ উপস্থিতি সব সময়ই তাকে মুগ্ধ করে। রয়েস এই মুহূর্তে ইউটিলিটি রুমের স্ক্রীন ডোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে সে। বিশালদেহী রয়েসের সামনে নিজেকে ক্ষুদ্র মনে হলো মোনার।

'হাই', আন্তরিক গলায় ডাকলো রয়েস।

'আমি বাথরুমে ছিলাম।' হাসার চেষ্টা করল মোনা। 'পানি পড়ার শব্দে তোমার গলা প্রথমে শুনতে পাইনি।'

'আজ রাতে তুমি আর হ্যারী কোথাও যাবার প্ল্যান করেছ ?' জানতে চাইল রয়েস।

'নাহ্', বলল সে। 'আমার আর প্ল্যান করে কোথাও যাওয়া হয় না। তবে সন্ধ্যাবেলায় ডাউন টাউনে যাব ভাবছি। কিছু কেনাকাটা করতে হবে। তারপর নাইটশোতে আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে ছবি দেখব।'

এত ব্যাখ্যার দরকার ছিল না, রয়েসের হাসি আরেকটু প্রসারিত হলো। 'ভেবেছিলাম রাতে হ্যারীর সঙ্গে কার রেস দেখতে যাব।'

'কিন্ত, আমি তো...'

রয়েস ফেয়ারচাইল্ড চকিতে একবার মোনার দ্বিধান্বিত মুখের দিকে তাকালো, লক্ষ করল মোনা কনভার্টিবলটার দিকে চেয়েই চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। 'হ্যারী তো বাসায় আছে, তাই না ? বেটি বলল কিছুক্ষণ আগে নাকি ও বাসায় ফিরেছে। ভাবলাম একবার জিজ্ঞেস করেই যাই ও আমার সঙ্গে যাবে কি-না।'

'কিন্তু হ্যারী তো ওষুধের দোকানে গেছে', অম্লান বদনে মিথ্যে কথাটা বলল মোনা।

'তাই ?' একটু থেমে রয়েস বলল, 'কিন্তু ওকে তো বেরুতে দেখলাম না। ঠিক আছে, ও এলে একবার আমার বাসায় নক করতে বোলো।

'আ-আচ্ছা বলব।' গলাটা হঠাৎই যেন বসে গেল মোনার। দাঁড়িয়ে পড়ল রয়েস।

'এনিথিং রং, মোনা ?' ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল সে।

দুর্বলভাবে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল মোনা, উপযুক্ত শব্দ হাতড়াচ্ছে প্রাণপণে। 'আ-আমি...মানে আমার শরীরটা ঠিক ভাল ঠেকছে না। সুইমিং পুলে সাঁতার কেটে আসার পর থেকে খারাপ লাগছে। যাকগে, এটা এমন কোন ব্যাপার নয়। রয়েস, তুমি...যদি কিছু মনে না করো গ্যারেজের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাবে ?'

'অবশ্যই দেব।'

'মানে বলছিলাম কি, হ্যারীও নেই, আমি বাসায় একা। দরজাটা বন্ধ থাকলেও একটু কম চিন্তা থাকে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' বলল রয়েস ফেয়ারচাইল্ড।

'হ্যারীকে আমার কথা বলতে ভুলো না।'

'ভুলব না।'

গ্যারেজের দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনল মোনা, গা ছেড়ে দিল স্ক্রীন ডোরের কবাটে। ওর বুক ধুকপুক শব্দ করছে, পায়ে কোন জোর নেই। গ্যারেজের দরজা বন্ধ করার যুক্তিটা নিতান্তই খেলো ছিল, বুঝতে পারে মোনা। কিন্তু এই মুহূর্তে নিরাপদে কাজ সারা তার খুবই প্রয়োজন

এখন দ্রুত কাজগুলো করতে হবে মোনাকে। রয়েস আবারও আসতে পারে। ইস্, আজ রাতেই কেন হ্যারীকে নিয়ে রেস দেখার ভূত চাপল ওর মাথায়।

শিউরে উঠল মোনা, ঝোলানো লম্বা কম্বলটার এক প্রান্ত খামচে ধরল। তারপর দৌড়ে গেল বাথরুমে। ছোটখাট হ্যারীর গায়ে এতো ওজন! বাথরুম থেকে ওকে টেনে তুলতে জান বেরিয়ে গেল মোনার। ধপাস করে লাশটা মেঝেতে ফেলল ও, দুটো তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছল তারপর একটা কম্বলে মৃত হ্যারীকে পেঁচাল। জামাকাপড়গুলো এক জায়গায় জড়ো করল। প্যান্টের পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে টাকা গুনল মোনা। মাত্র তেইশ ডলার। টাকাগুলো নিয়ে ওয়ালেটটা যথাস্থানে রেখে দিল সে।

আবার ঘামতে শুরু করেছে মোনা। কিন্তু এখন আগের মতো আর দুর্বল লাগছে না। ধীরে ধীরে হারানো শক্তি ফিরে পাচ্ছে সে। কম্বলে মোড়ানো হ্যারীর লাশটা টানতে টানতে গ্যারেজে নিয়ে এল। গাড়ির পেছনের ট্রাঙ্ক খুলল চাবি দিয়ে। কিন্তু এখন ওকে

ভেতরে ঢোকাবে কি করে ? গোটা লাশ দু'হাতে তোলার শক্তি নেই মোনার। ভয়ানক ভারী হ্যারীর শরীর।

প্রথমে হ্যারীর পা দুটো ধরল মোনা, বাম্পারের ওপর রাখল। লাশটা ডিঙিয়ে ওর পেছন চলে এসে সে ঝুঁকল, দু'হাতের বেড়িতে শক্ত করে কোমর ধরে টান দিল। মেঝে ছেড়ে শুন্যে উঠে গেল হ্যারী, কিন্তু নিতম্ব বেঁধে গেল ট্রাঙ্কের কোনায়। থেতলানো মাথাটা বিশ্রীভাবে ঝুলছে। ঘাড়ের পেছনে হাত নিয়ে এলো মোনা, মাথাটা সোজা করে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিল ভেতরে। ট্রাঙ্কের এক কোনায় বসার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে থাকল নিস্প্রাণ দেহটা। হড় হড় করে ওকে সামনের দিকে টান দিতেই ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল হ্যারী।

ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে মোনার, যেন কয়েক মাইল রাস্তা দৌড় এসেছে। ছেঁড়া জামাকাপড়গুলো দিয়ে লাশটাকে ঢাকলো সে, বন্ধ করল ট্রাঙ্ক। তারপর কম্বলটা আবার ইউটিলিটি রুমের মেঝেতে বিছাল। জিনিসটা ভিজে গেছে, কিন্তু শুকিয়ে যাবে শিগগিরই। এখন আর কোন কাজ নেই। এখন কাজ শুধু কালক্ষেপণ।

অপেক্ষার মুহূর্তগুলো ভারী কষ্টের, যন্ত্রণাদায়ক। মোনা ভাবতে থাকে ফেঁসে যাবার সম্ভাবনা কতটুকু। কিন্তু জোর করে অশুভ চিন্তাগুলো মন থেকে দূর করে দেয় সে। বেহুদা টেনশনে ভুগছে সে। সাজানো প্ল্যানে সামান্য ছন্দপতন ঘটিয়েছে কেবল রয়েস ফেয়ারচাইল্ডের আকস্মিক আবির্ভাব। কিন্তু তার কারণে প্ল্যানটা একেবারে মাঠে মারা যাবে না।

সাতটা বাজার মিনিট কয়েক আগে রয়েস ফোন করল। জানতে চাইল মোনা হ্যারীকে তার কথা বলতে ভুলে যায়নি তো।

'না, রয়েস। ও এখনও ওষুধের দোকান থেকে ফেরেনি। ও বোধহয় গিনোর বারে গেছে। নইলে এতো দেরি হবার তো কথা নয়।'

'ঠিক আছে, আমি হ্যারীকে ওখানেই খোঁজ করছি, মোনা।'

ফোন রেখে দিল মোনা। কাজটা এখন তাকে আরও আধ ঘণ্টা আগে করতে হবে। ভেবেছিল সাড়ে সাতটার আগে বাইরে যাবে না, কিন্তু এখনই না বেরুলে রয়েস আবার হুট করে হাজির হলে বিপদে পড়বে মোনা। দ্বিতীয়বার তার মুখোমুখি হতে চায় না সে। সামাল দিতে পারবে না।

কনভার্টিবলটাকে নিয়ে বেরুচ্ছে মোনা, দেখল রয়েস জানালা দিয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। আতঙ্ক গ্রাস করল ওকে। ইচ্ছে হলো ঝড়ের গতিতে গাড়ি ছোটায়, চোখের পলকে শহর ছেড়ে দূরে চলে যায়।

দাঁতে দাঁত চাপল মোনা। না, আতঙ্কিত হলে চলবে না। আতঙ্ক ওকে ফাঁদে ফেলবে, আর তার নিশ্চিত পরিণাম ডেথ চেম্বার। স্বাভাবিক গতিতে গাড়ি চালিয়ে বার্নহিল্টদের বাড়িতে চলে এলো মোনা। এখানে, ডাবল গ্যারেজের ভেতরে সে ভাড়া করা গাড়িটা রেখে গেছে। হ্যারীর লাশ আর জামাকাপড়ের স্তূপ সেখানে ঢোকাল সে,

ট্রাঙ্কের মধ্যে বেলচাটা রাখল, আর বিকেলে কেনা অন্যান্য জিনিসপত্রগুলোর স্থান হলো কনভার্টিবলে।

এবার ডাউনটাউনে চলে এলো মোনা, বুকের মধ্যে ভয় নিয়ে দোকানগুলোতে ঘুরে বেড়াল, খামোকা এটা ওটার দাম জানতে চাইল। ঘণ্টাখানেক পর একটা ড্রাগস্টোরে সে যখন ঢুকলো, ঘড়িতে তখন সাড়ে আটটা। ওর বন্ধু প্যাট ডডসনের সঙ্গে আরও আধঘণ্টা পর দেখা করার কথা। হয়তো প্যাট ইতোমধ্যে রেডি হয়ে বসে আছে। অপেক্ষা করছে তার জন্য।

একটা বুদ থেকে ফোন করল মোনা প্যাটকে। প্যাট যা বলল শুনে হিম হয়ে গেল সে। 'মোনা আজ রাতের প্রোগ্রামটা ক্যান্সেল করা যায় না ? আমি অনেকক্ষণ ধরে তোমার বাসায় ফোন করছি। কেউ ধরে না। আমার খুব মাথা ধরেছে মোনা। আমি ছবি দেখতে যেতে পারব না, ভাই।'

মোনার পা কাঁপছে থরথর করে। যদি বিশেষ কোন সাক্ষী দরকার হত তাহলে প্যাট ডডসনই হত তার অন্যতম সাক্ষী। 'তু-তুমি ওষুধ খাওনি ?' কথা খুঁজে পাচ্ছে না মোনা। কোনমতে বলল, 'বাইরে বেরুলে ঠাণ্ডা বাতাসে মাথা ধরাটা নিশ্চয়ই ছেড়ে যেত।'

'ঘুম, মোনা, এটাই এখন আমার একমাত্র ওষুধ। আরেকদিন না হয় তোমার সঙ্গে ছবি দেখব। সুস্থ হলে কাল রাতে ?'

'না', ইতস্তত করল মোনা, অনুরোধ করে লাভ হবে না বুঝে বলল, 'আমি আজ রাতেই ছবিটা দেখব, প্যাট, কাল নয়।'

'ঠিক আছে, দেখো তাহলে। যেতে পারছি না বলে আবারও দুঃখিত।'

ড্রাগস্টোর থেকে বেরিয়ে এলো মোনা। শরীর ভয়ানক দুর্বল ঠেকছে। উদ্দেশ্যহীনভাবে সে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করল। চিন্তাভাবনাগুলো সব গিঁট পাকিয়ে গেছে। কিন্তু ধৈর্য হারালে চলবে না, নিজেকে শাসাল ও, ভাবতে হবে। ভেবেচিন্তে প্রতিটি পা ফেলতে হবে। আউল ফাউল না ঘুরে মনস্থির করে ফেলল মোনা। বাঁক ঘুরে সিনেমা হলের দিকে এগোল। হলের সামনে আসতেই চট করে আইডিয়াটা মাথায় খেলে গেল। দ্রুত পায়ে ফিরে এলো পার্ক করা কনভার্টিবলে, বিকালে কেনা জিনিসগুলোর প্যাকেট দুটো নিয়ে সিনেমা হলে ঢুকলো। লিপস্টিকের প্যাকেটটা টিকেট কাউন্টারের জানলার পাশে ফেলে গেটের দিকে তাকালো। কাউন্টারের মেয়েটা বুথের দরজা খুলে ডাক দিল, 'ম্যাম ?'

ঘুরলো মোনা, মেয়েটা ছোট্ট প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরেছে ওর দিকে। হাসলো সে, মেয়েটাকে ধন্যবাদ দিয়ে প্যাকেটটা নিয়ে অন্ধকার প্রেক্ষাগ্রহে প্রবেশ করল। এখন একটু স্বস্তি লাগছে। প্রয়োজনের সময় কাউন্টারের মেয়েটা ওকে অন্তত স্মরণ করতে পারবে।

ছবিটা কমেডি ধাঁচের। অন্যসময় হলে মোনা এই ছবি দেখে হাসতে হাসতে খুন হয়ে যেত, কিন্তু দুই ঘণ্টা পর হল থেকে বেরিয়ে ও আবিষ্কার করল আসলে পর্দার দিকে তাকিয়েছিল শুধু, কিছুই দেখেনি।

সময় কাটানো মোনার জন্য এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা। সে অস্থির হাতে কনভার্টিবলের রেডিওর সুইচ অন করল। রেডিওতে আবহাওয়ার খবর হচ্ছে। আগামী ছয় ঘন্টার মধ্যে প্রবল ঝড় শুরু হতে পারে, সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন সংবাদ পাঠক। তাই নগরবাসীদের সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে। মোনা কপাল কোঁচকাল। আসন্ন ঝড়টা তাকে সাহায্য করবে না বিপদে ফেলবে ?

বাড়ি ফেরার সময় মোনা দেখল ফেয়ারচাইল্ডদের বাড়ির আলোকিত জানালা দিয়ে একটা মুখ তাকে লক্ষ্য করছে। আড়ষ্ট হাসলো মোনা। ভালই হলো বেটি জানল সে কখন ছবি দেখে ফিরেছে। গ্যারেজে গাড়ি রেখে প্যাকেটগুলো নিয়ে ঘরে ঢুকলো মোনা। আধঘন্টা পর সমস্ত বাতি নিভিয়ে অন্ধকার একটা জানালার সামনে এসে বসল। এখান থেকে ফেয়ারচাইল্ডদের বাড়ি স্পষ্ট দেখা যায়। মাঝে মধ্যে বেটির আকৃতি ফুটে উঠতে দেখল সে জানালার কাঁচে। কিন্তু রয়েসকে দেখা গেল না। এখন রাত একটা। বেটি এখনও ঘুমাতে যাচ্ছে না কেন ? হঠাৎ ওর মনে পড়ল বেটি ঝড়বাদল খুব ভয় পায়। ঝড়বৃষ্টি হবে শুনলে সে ঘুমাতে পারে না।

নিয়তি দেখছি আমার সঙ্গে বিরোধিতা শুরু করেছে, ভাবল মোনা। তার বাইরে বেরুবার ব্যাপারটা বেটির চোখে কিছুতেই ধরা পড়া চলবে না। আর ঝড়ঝন্‌ঝার রাতে ফেয়ারচাইল্ডরা নিশ্চয়ই আশা করে না মোনা সব বাতি জ্বালিয়ে রাখবে ?

সময় হয়েছে বুঝতে পেরে সামনের দরজা দিয়ে বেরুল মোনা। তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো ফেয়ারচাইল্ডদের জানালার দিকে, কেউ উঁকি দিচ্ছে কিনা দেখতে। অন্ধকারে চোখ সইয়ে উঠান পেরোল সে, উঠে এলো ফুটপাথে। দ্রুত পা চালাচ্ছে মোনা। হাঁটতে হাঁটতে মুখ তুলে চাইল আকাশের দিকে। তারা জ্বলছে। ঝড় নাও আসতে পারে।

শপিং সেন্টারের ট্যাক্সিস্ট্যান্ড, এখানে সারারাত ট্যাক্সি ভাড়া পাওয়া যায়, একটা ক্যাবে ড্রাইভারকে মুখ হাঁ করে ঘুমাতে দেখল মোনা। দরজা খুলে ব্যাকসীটে বসল সে। আশা করল অন্ধকারে ড্রাইভার তাকে ভালমত লক্ষ্য করতে পারবে না। ড্রাইভার মোনার দিকে প্রায় তাকালোই না, ঘুম ঘুম চোখে মাত্র একবার ঘাড় ঘুরিয়ে চাইল। মোনা তাকে রিভারভিউ বুলভার্ডে যেতে বলল। গন্তব্যে পৌঁছে ড্রাইভারকে ভাড়ার সঙ্গে পঞ্চাশ সেন্ট বকশিশও দিল। তারপর হন হন করে হাঁটতে লাগল একটা অন্ধকার বাড়ি লক্ষ্য করে। খানিকটা এগিয়ে যখন বুঝল ড্রাইভারের চিহ্নও নেই কোথাও ফিরে এলো সে বুলেভার্দে। পার হল রাস্তা, এগিয়ে চলল বার্টলেটদের বাড়ি অভিমুখে।

হ্যারীকে কবর দেয়ার জায়গাও ঠিক করে রেখেছে মোনা। গত রোববার বিকালে ওদিকটা ভাল মতো দেখে যায় সে। হাইওয়ে ছাড়িয়ে একটা সরু মেঠো পথ চলে গেছে গাছপালার মধ্যে দিয়ে, শেষ হয়েছে একটা খাদের মাথায়, ওখানে।

ভাড়া করা সেডানটা নিয়ে মোনা এখন সেদিকেই চলেছে। হেডলাইটের আলো চিরে দিচ্ছে গাঢ় অন্ধকার। মেঠো রাস্তার শেষ মাথায় পৌছে গাড়ি থামাল মোনা, লাইটের সুইচ অফ করল। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল সে বেলচা নিয়ে। গভীর একটা কবর খুঁড়ল ত্রস্ত হাতে, স্বামীর দলা পাকানো লাশ আর পোশাকগুলো ছুঁড়ে ফেলল

গর্তে। দূরে, শহরের সীমানার কালো আকাশে ঝিলিক দিল বিদ্যুৎ, গুরুগুরু আওয়াজ ভেসে এলো কয়েক সেকেন্ড পর। কবরে মাটি ভরাট করার সময় একটা দুশ্চিন্তা মাথায় ভর করল মোনার। বৃষ্টি হলে ভেজা মাটিতে তার গাড়ির চাকার ছাপ থেকে যাবে। সুতরাং বৃষ্টির আগেই হাইওয়েতে ফিরতে হবে তাকে।

এবড়োথেবড়ো রাস্তা দিয়ে গাড়ি ব্যাক করছে মোনা, যান্ত্রিক বাহনটা তীব্র আর্তনাদ করে উঠল। 'আস্তে' নিজেকে পরামর্শ দিল মোনা, সাবধানে চালাও মেয়ে। এমন বিদঘুটে জায়গায় কোন সমস্যায় পড়লে বারোটা বেজে যাবে তোমার।

হাইওয়েতে উঠে আসতেই সশব্দে চেপে রাখা শ্বাস ফেলল মোনা। ঝড় আসছে। একটু বিরতির পরপরই আলো হয়ে যাচ্ছে অন্ধকার আকাশ। নদীর ব্রিজটা সামনেই। ওর সামনে কিংবা পিছনে কোন গাড়ি নেই স্বস্তি পেল মোনা। ব্রিজে উঠে গাড়ি থামাল সে। চট করে নেমে বেলচাটা রেলিং-এর ওপর দিয়ে নদীতে ফেলে দিল। মাইল দুয়েক দূরে শহরের আলোকমালা, ফ্যান্টাসি ছবির মতো জ্বলছে। সন্তুষ্টি বোধ করল মোনা, গাড়ি ছেড়ে দিল-আর তক্ষুণি ওর বুকের ভিতর লাফিয়ে উঠল হৃৎপিন্ড।

সামনে আলো জ্বলছে। অথচ মোনা ভাল করেই জানে এখানে আলো জ্বলার কোন কারণ নেই। সম্ভবত রোড ব্লক, ঘূর্ণায়মান লাল বিকন বাতিগুলো যেন পিশাচের চোখ।

পুলিশ! যেভাবেই হোক ওরা তার কুকীর্তির কথা জানে গেছে আর এখানে অপেক্ষা করছে কখন সে শহরে ফিরবে তার জন্য।

ব্রেকে আলতো একটা পা রাখল মোনা। চোখ দুটো কোন সাইড রোড খুঁজছে।

কিন্তু পুলিশ কি করে এতো তাড়াতাড়ি টের পেল? দ্রুত মাথা হাতড়াল মোনা। নাহ্, টের পাবার কোন প্রশ্নই নেই। নির্ঘাত সামনে কোন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। আর এ জন্যই রোড ব্লক।

ধীরগতিতে গাড়ি চালাল। হেড লাইটের আলোতে ইউনিফর্ম পরা এক পুলিশ অফিসারের আকৃতি পরিস্কার হয়ে উঠল। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে, হাতের লাল আলো দিয়ে সামনে আসতে ইশারা করল মোনাকে, মোনা খেয়াল করল রাস্তার একটা দিক শুধু বন্ধ-যারা শহর ছেড়ে আসছে শুধু তাদের গাড়ি থামানো হচ্ছে। আরেক পুলিশ অফিসার লাল ফ্ল্যাগলাইটের আলো দিয়ে ইঙ্গিত করল-যেতে পারে মোনা। রোড ব্লক পেরিয়ে শহরের রাস্তায় পড়ল মোনা। চিরিক চিরিক ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ। বিকট শব্দে কাছে কোথাও বাজ পড়ল। মোনার গাড়ি থামাতে ইচ্ছে করছে, মন চাইছে প্রাণভরে শ্বাস নিয়ে একটু সুস্থির হতে। কিন্তু এগিয়ে চলল সে, ডাউনটাউন থিয়েটার পার্কিং লটের দিকে গাড়ি ছোটাল। দুই ব্লক পরে কাররেন্টাল এজেন্সি, তার পরেই একটা ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। পার্কিং লটে গাড়ি দাঁড় করল মোনা একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসল। বলল, শপিং সেন্টার কমপ্লেক্স যাবে। বাতাসের ঝাপটায় রাস্তার খড়কুটো উড়তে শুরু করেছে, ভাড়া মিটিয়ে মাত্র ফুটপাথে পা রেখেছে মোনা, বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করল গায়ে। তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো বাড়ির দিকে ছুটল মোনা। তিনটে ব্লক পরেই তার বাড়ি। দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকা মাত্র প্রবল বর্ষণ শুরু হলো। ধপ করে

একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। নিজেকে এতো দুর্বল লাগল, মনে হলো একটা হপ্তা না ঘুমালে সে আর শক্তি ফিরে পাবে না।

কিন্তু ঘুম এলো না। দুশ্চিন্তায় ভার হয়ে থাকল মাথা। অনেক কিছু পিছনে ফেলে এসেছে সে, আরও কত কি সামনে অপেক্ষা করছে কে জানে। অন্ধকারে হাতড়ে রান্না ঘরে ঢুকলো মোনা, জানালা দিয়ে তাকালো বাইরে। ফেয়ারচাইল্ডদের বাড়িতে আলো জ্বলছে। বেটি এখনও ঘুমায়নি? নাকি জেগে থাকার ভান করছে? আলোর সুইচের দিকে হাত বাড়াল মোনা, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলাল। আরেকটু হলেই মস্ত এক ভুল করতে যাচ্ছিল সে। বেটি জেগে থাকলে আলো জ্বললেই সে দেখতে পেত মোনার গায়ে বাইরের পোশাক...।

মোনা কাপড় পাল্টাল। রাতের পোশাক পরল। হঠাৎ বালিশের নিচে রাখা হাতুড়িটার কথা মনে পড়ে গেল। জোর করে নিজেকে স্বাভাবিক রাখল মোনা, হাতুড়িটা নিয়ে রান্না ঘরে গেল, ওটাকে একটা ড্রয়ারে রেখে দিল। তারপর আলো জ্বালল, সিগারেট ধরাল। এখন বেটি ফেয়ারচাইল্ড ওকে ইচ্ছে মতো দেখুক। দেখুক ঝড়ের রাতে তার মতো আরও একজন নির্মম সময় কাটাচ্ছে।

মোনা কফি বানিয়ে নিল। পরবর্তী চারটে ঘন্টা তার কাটল মারিজুয়ানা সেবন করে আর বাইরে ঝড়ো হাওয়ার দাপাদাপি শুনে। সকাল সাতটার দিকে ঝড়ের তান্ডব থেমে গেল, শুধু বর্ষণধারা অব্যাহত রইল। আটটা বাজার কয়েক মিনিট আগে মোনা শুনল গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে রয়েস ফেয়ারচাইল্ড। আরও মিনিট বিশেক কাটিয়ে দিল সে কাপড় পরার কাজে। তারপর বেরিয়ে পড়ল কনভার্টিবলটা নিয়ে। দেখল জানালার পাশে বসে আছে বেটি, ওকে লক্ষ করছে। থিয়েটার পার্কিং সেটে চলে এলো মোনা, ভাড়া গাড়িটা, এজেন্সির কাছে হস্তান্তর করল। ইচ্ছে করলে কাল রাতেই কাজটা করতে পারত সে। কিন্তু তাতে ধরা পড়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। রাত সাড়ে তিনটায় গাড়ি ফেরত দিতে গেলে এজেন্সি সহজেই তাকে চিনে রাখত, কিন্তু সকাল নটা বিশ-এ সেই আশঙ্কাটা নেই।

অ্যাটেনডেন্ট লোকটা লম্বা-চওড়া কিন্তু নোংরা, দেখে মনে হয় 'গোসল' শব্দটার সঙ্গে পরিচিত নয়।

'কাজ শেষ, ম্যাম ?' জিজ্ঞেস করল সে।

শান্ত গলায় জবাব দিল মোনা, 'হ্যাঁ'। ভাড়া চুকিয়ে পা বাড়াল অফিসের বাইরে।

পেছন থেকে ডাক দিল লোকটা, 'শুনুন, শুনুন! গাড়ির হাবক্যাপটা কোথায় ফেলে এসেছেন, ম্যাম ?'

মোনা থমকে দাঁড়াল, ঘুরল। লোকটা সেডানের ডান দিকের হুইলের পাশে দাঁড়ানো, কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে মোনার দিকে। হুইলের ওপর কোনও হাবক্যাপ নেই।

মোনা কোন কথা বলতে পারল না। ওর জিভটা যেন আঠা দিয়ে লেগে আছে টাকরায়। হাবক্যাপটা হারাল কিভাবে ? কোথায় কবরে ? নাকি মেঠো রাস্তাটার কোথাও ? অথবা থিয়েটার পার্কিং লটে।

'আ-আমাকে কি এ জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ?' তোতলাতে তোতলাতে বলল মোনা।

লোকটা মোনার আগাপাশতলা যেন চাটল চোখ দিয়ে। নিজের সঙ্গে বোধ হয় যুদ্ধ করছে। তার পাতলা ঠোঁটজোড়া একদিকে বেঁকে গেল, বিড়বিড় করে বলল, 'না, আপনাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আমাদের বীমা করা আছে।'

কাঠ হয়ে এজেন্সি অফিস থেকে বেরুল মোনা, এগোল কনভার্টিবলের দিকে। গাড়ি নিয়ে শপিং সেন্টার সুপার মার্কেটে চলে এলো ও, খামোকা বেশ কিছু মুদি সওদা কিনল। তারপর ফিরে এলো বাড়িতে। ওর চিৎকার দিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল। কাঁপা হাতে কফি ঢালল কাপে, চুমুক দিল। হাবক্যাপ হারানোর ঘটনাটা ছাড়া আর সবকিছুই এখন পর্যন্ত ঠিক আছে। তবে পুলিশে খবর দেয়ার আগে আরও একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে। এখন দশটা চল্লিশ বাজে। পাইপার-এর নম্বরে ফোন করল মোনা।

পাইপারের যে লোক ফোন ধরল, সে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানাল, না, মি. রোপ এখনও অফিসে পৌঁছেননি। আর এভাবে তিনি কখনোই অনুপস্থিত থাকেন না। অফিসে আগে না জানিয়ে মি. রোপ আজ পর্যন্ত কোথাও যাননি। পাইপার কি এ ব্যাপারে মিসেস রোপকে কোন সাহায্য করতে পারে ?

কিন্তু মোনার কোনও সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

সে এবার পুলিশ ডিপার্টমেন্টে রিং করে মিসিং পারসনস ব্যুরোর নাম্বারটা চাইল। ওধারের লোকটা নিরাসক্ত গলায় বলল তাঁর স্বামী হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসায় ফিরে আসবেন, মিসেস মোনা খামোকা দুশ্চিন্তা করছেন। হয়তো গতকালকের ঝড়ের জন্যে তিনি বেশি মাত্রায় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

'ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, অফিসার।'

'ঠিক আছে, আপনি যদি অন্য কোন আশঙ্কা করে থাকেন, তাহলে আমরা কি এখান থেকে লোক পাঠাতে পারি-'

'সত্যি পাঠাবেন ? প্লীজ!'

ব্যাঙ্কস নামে এক তরুণ সার্জেন্টকে পাঠালো ওরা। লোকটার বয়স খুব বেশি হলে ত্রিশ। সে মোনাকে যারপরনাই বিস্মিত করল। মনে হলো মোনার কষ্ট সে অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পেরেছে। সার্জেন্টকে পছন্দ হয়ে গেল মোনার তার প্রশ্নের ধরণ শুনে। হ্যারি সম্পর্কে বিস্তারিত নোট নিল সে, বলল মোনা যেন তার স্বামীর জন্যে খুব বেশি চিন্তা না করে। আশা করা যায় কিছুক্ষণের মধ্যেই তার স্বামীকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

মিনিট বিশেক পর বিদায় হলো সার্জেন্ট। বেটি ফেয়ারচাইল্ড এলো মোনার সঙ্গে কথা বলতে। রাতে বোধ হয় ঘুমায়নি, চোখ বসে গেছে, কিন্তু তাকে বেশ কৌতুহলী আর উত্তেজিত দেখাল।

'একটু আগে যে গাড়িটা দেখলাম', হড়বড় করে বলল বেটি, 'পুলিশের গাড়ি মনে হলো! কি হয়েছে, মোনা ?'

মোনা ওকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল।

যেন স্তম্ভিত হয়েছে কথাটা শুনে এমনভাবে বেটি বলল, 'হ্যারি কাল রাতে বাসায় ফেরেনি ?'

'অফিস থেকে ফেরার পর আমাকে বলল ওষুধের দোকানে যাচ্ছে। তারপর থেকে ওর আর কোন সংবাদ নেই।'

'কোথায় যেতে পারে, বলো তো ?'

'আমি জানি না, বেটি।'

'অফিসে খোঁজ নিয়েছ ?'

মোনা মনে মনে উল্লাস বোধ করল। 'সকালেই নিয়েছি। কিন্তু ওরা বলল হ্যারি অফিসে যায়নি...'

'হা ঈশ্বর।' শ্বাস টানলো বেটি। 'সব ঘটনা দেখছি এক সঙ্গে ঘটছে! প্রথমে ঝড় এল, তারপর ব্যাঙ্ক ডাকাতি, আর এখন হ্যারি-'

'ব্যাঙ্ক ডাকাতি ?'

'রেডিওতে শোনোনি ? কাল রাতে ডাউনটাউনের একটা ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়েছে। সারা শহরে রোড ব্লক বসানো হয়েছে। আর...'

বেটির কথা কানে ঢুকছে না মোনার। কাল রাতে রোড ব্লকে পড়ে কি রকম আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল মনে পড়তেই পেট ফেটে হাসি এলো ওর। কিন্তু নিজেকে সংবরণ করল ও। বেটি জিজ্ঞেস করল, 'মোনা, হ্যারি হঠাৎ করে এভাবে নিখোঁজ হওয়ার কারণ কি, বলো তো ?'

মোনা কোন জবাব দিল না।

পরদিন আবার এলো সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস। গৎ বাঁধা প্রশ্নগুলো করল। মোনার যখন সমস্ত জবাব ফুরিয়ে গেল, সার্জেন্ট উদাসীন মুখ করে বলল, 'আপনি বোধ হয় জানেন, মিসেস রোপ, আপনার স্বামী পরনারীতে আসক্ত ছিলেন ?'

মোনার আঁতকে ওঠার অভিনয়টা নিখুঁত হলো। 'সবাই যুবতী', বলে চলল সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস। 'ধারণা করা হচ্ছে ওরা প্রত্যেকে পাইপার কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত।'

মোনার চেহারা করুণ হয়ে উঠল।

'এসব কেস-এ আমরা প্রথমেই যে জিনিসগুলো চেক করি তা হচ্ছে আর্থিক অবস্থা, দাম্পত্য সুখ-।'

মোনা রাগের ভান করল। 'আমাদের আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট ভাল।'

'জ্বী ?'

'আর হ্যারী কখনও-'

'আমি দুঃখিত, মিসেস রোপ', বাধা দিল সার্জেন্ট। 'আমরা তদন্ত করে দেখেছি আপনার স্বামীর সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে তরুণী আর যুবতী কয়েকটি মেয়ের অবৈধ সম্পর্ক ছিল।'

মোনা নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করল। সার্জেন্ট চলে যেতেই সে রান্নাঘরে ঢুকলো, কাপে কফি ঢেলে তাতে বুরবন মেশাল, তারপর নীরবে পানীয়টা উৎসর্গ করল তার মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে 'চিয়ারস, হ্যারী লোথারিও রোপ!'

শনিবার, সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস একটা বোমা ফাটালো। পাইপার কোম্পানিতে হ্যারীর কাগজপত্র ঘেঁটে জানা গেছে সে বেশ কিছু অর্থ আত্মসাৎ করেছে।

'ক-কত টাকা পাওয়া যাচ্ছে না ?' জানতে চাইল মোনা।

'দশ হাজার ডলারের মত।'

'আপনাদের কি ধারণা হ্যারী টাকাগুলো নিয়ে পালিয়েছে ?'

'তার সঙ্গে যে সব মেয়ের সম্পর্ক ছিল তারা কেউ পালায়নি, শুধু হ্যারী আর টাকাগুলোর কোন খবর নেই।'

'আচ্ছা! বলল মোনা। এতদিনে বুঝতে পারল হ্যারী মেয়ে মানুষ নিয়ে ফুর্তি করার টাকা কোত্থেকে জোগাড় করত। এই মেয়ে ঘটিত ব্যাপার নিয়ে অনেক ঝগড়া হয়েছে তার হ্যারীর সঙ্গে। কিন্তু হ্যারী তাকে পাত্তাই দেয়নি। শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে মোনা। তারপর...

'সত্যি, এটা খুব হৃদয়বিদারক সংবাদই বটে।'

সার্জেন্ট ব্যাঙ্কসের কথায় চমক ভাঙলো মোনার। চোখ তুলে চাইতেই দেখল মোনা তার দিকে চেয়ে আছে সার্জেন্ট। 'আমি ভাবছিলাম...' ইতস্তত গলায় বলল মোনা। 'ভাবছিলাম কয়েকদিনের জন্যে ধরুন, ধরুন হপ্তাখানেকের জন্যে যদি বাইরে যাই কেমন হয়। এই ব্যাপারটা নিয়ে কাগজে লেখালেখি হবে। বিশেষ করে যেখানে টাকা পয়সার প্রশ্ন জড়িত...আমার আসলে এখন দিন কয়েক কোথাও একা কাটিয়ে আসা দরকার।'

'নির্দিষ্ট কোথাও যেতে চাইছেন, মিসেস রোপ ? আপনার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের প্রয়োজন হতে পারে।'

'লেক চার্লসের নাম শুনেছে ?'

'জ্বী।'

'ওখানে একটা বাড়ি আছে। ওখানে আমি আর হ্যারী একবার...যাকগে, কিছু ভাববেন না। বাড়িটার নাম শেডি ওকস।'

'ঠিক আছে, মিসেস রোপ।'

'তাহলে আমি যেতে পারি ?'

'অবশ্যই পারেন।'

শহর ছেড়ে ওইদিন বিকালেই বেরিয়ে পড়ল মোনা। মাইল বিশেক যাবার পর ওর সন্দেহ সত্যি বলে প্রমাণিত হলো। শেডি ওকসের আশপাশে পুলিশী ছায়া আবিষ্কার করল মোনা। একটি যুবক বয়সের ছেলেকে ওর কাছে পিঠে প্রায়ই ঘুরঘুর করতে দেখল সে।

মঙ্গলবার সকালে অবশ্য যুবক ভণিতা ছেড়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল মোনাকে নিয়ে তার শহরে ফিরতে হবে।

'আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন না হ্যারী তার দশ হাজার ডলারসহ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে ?' তিক্ত গলায় বলল মোনা।

'আপনার স্বামীর খোঁজ পাওয়া গেছে, মিসেস রোপ। আর আমার ধারণা তিনি খুন হয়েছেন।' গম্ভীর গলায় বলল সে।

হেডকোয়ার্টারে দু'জন পুলিশ অফিসার জেরা করল মোনাকে। সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস লেফটেন্যান্ট পোলিং নামে একজন অমায়িক স্বভাবের অফিসারের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল। পোলিং খুব বিনীতভাবে মোনার কাছে জানতে চাইল হ্যারী যেদিন নিখোঁজ হয় সেদিন আসলে কি কি ঘটেছিল। সব বিস্তারিত বর্ণনা দিল মোনা। সপ্রতিভভাবে সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে পেরে নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠল সে। মোনা জানে ওর গল্প খতিয়ে দেখা হবে, পুলিশ ভেরিফিকেশন হবে। বেটি ফেয়ারচাইল্ড জানাবে ঘটনার দিন বিকালে মোনাকে সে মিউনিসিপ্যাল পুল থেকে পাঁচটার সময় সাঁতার কেটে আসতে দেখেছে, আর মোনা কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছে তার সাক্ষী কেট আসতে দেখেছে, আর প্যাট ওডসন বলবে সে কথা দিয়েও বুধবার রাতে মোনার সঙ্গে ছবি দেখতে যেতে পারেনি। সিনেমা হলের টিকেট বিক্রেতা মেয়েটাও মোনাকে স্মরণ করতে পারবে। বলবে হ্যাঁ, এক মহিলা ওইদিন নাইট শোতে ছবি দেখতে এসেছিলেন। ভুলে তাঁর একটা প্যাকেট ফেলে যাচ্ছিলেন কাউন্টারে। আর ছবি দেখে মোনা কখন ফিরেছে সে ব্যাপারেও বেটি সাক্ষী দেবে। জানাবে, যখন ঝড় শুরু হয় ওই সময় সে রোপদের বাড়িতে আলো জ্বলতে দেখেছে।

প্রশ্নপর্ব শেষ হলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল মোনা। লেফটেন্যান্ট পোলিং মোথা ঝাঁকিয়ে নরম গলায় বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, মিসেস রোপ, আপনাকে প্রশ্ন করা আমাদের দরকার ছিল।'

'অবশ্যই। টাকা পয়সার ব্যাপারটাও যেহেতু এর সঙ্গে জড়িত। তবে আমি কল্পনাও করিনি হ্যারী টাকা চুরি করতে পারে।'

'আমরা এ জন্যই আপনাকে লেক চার্লসে যেতে দিয়েছি', বলল সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস।

'আপনারা কি ভেবেছিলেন আমার সঙ্গে হ্যারীর কোথাও সাক্ষাৎ হবে ? আমি টাকার কথা কিছুই জানতাম না, সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস। ব্যাপারটা আমার জন্যে খুবই মর্মবেদনার কারণ ছিল।'

'আমরা ধারণা করতে পারছি টাকাটা বেশিরভাগই কোথায় ব্যয় হয়েছে', বলল লেফটেন্যান্ট পোলিং।

'মানে...হ্যারীর সঙ্গে যে সব মেয়ের সম্পর্ক ছিল তাদের কথা বলছেন ?'

মাথা ঝাঁকালো লেফটেন্যান্ট। 'আমাদের আরও সন্দেহ ওদেরই কেউ হাতুড়ির বাড়িতে মাথা ফাটিয়ে খুন করেছে হ্যারীকে।'

পাথর হয়ে গেল মোনা।

'আপনি নৃশংস ঘটনাটা শুনবেন, মিসেস রোপ ?'

মোনা জানে না সে সায় দিয়েছে কিনা, কিন্তু লেফটেন্যান্ট পোলিং গল্পটা বলতে শুরু করল আমাদের ধারণা বুধবার রাতে আপনার স্বামী ওষুধের দোকানের কথা

বললে বেরিয়ে পড়েন। হয়তো আগেই কথা হয়েছিল, কিংবা এও হতে পারে পথে মেয়েটার সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। তারা সন্ধ্যাটা একত্রে কাটায়। তারপর সন্ধ্যারই কোন এক সময় মেয়েটা আপনার স্বামীকে ভারী এবং ভোঁতা কিছু দিয়ে মাথায় আঘাত করে। সম্ভবত হাতুড়ি জাতীয় কিছু হবে। মেয়েটাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারছি না। তারপর সে লাশটাকে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে কবর দেয়। কবর খুঁড়ে আমরা যখন লাশটা বের করি, মুর্দার পরনে কোন কাপড় ছিল না। কিন্তু তার জামা কাপড়গুলো কবরের মধ্যেই পাওয়া গেছে। আর তার ওয়ালেট। ওটাও খালি ছিল।'

'লে-লেফটেনান্ট', তোতলাচ্ছে মোনা, 'আ-আপনি কিন্তু এখনও বলেননি কিভাবে...কিভাবে আপনার হ্যারীর খোঁজ পেয়েছেন।'

'একটা বাচ্চার কৌতুহলের কারণে', মুখ অন্ধকার করে বলল লেফটেন্যান্ট পোলিং। 'একটা হাবকাপ ছিল তার কৌতুহলের কারণ। ছেলেটা ওখানে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একটা খাদের পাশে, ঝোপঝাড়ের মধ্যে চকচকে হাবক্যাপটা তার নজর কেড়ে নেয়। খাদটার পাশে স্তূপ করা মাটি দেখে তার নতুন কবর বলে সন্দেহ হয়। হাত দিয়ে কবরটা খুঁড়তে শুরু করে। থামলো যখন নগ্ন পা জোড়া চোখে পড়ল, তখন। স্বাভাবিকভাবেই প্রচন্ড ভয় পেয়েছিল সে।'

'একটা...হাবক্যাপ ?' বিড়বিড় করে বলল মোনা।

'এখন সেই গাড়িটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যেটা থেকে জিনিসটা খসে পড়েছে', বলল পোলিং।

'পা-পারবেন ?'

'সেটাই তো এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা, মিসেস রোপ। এ যেন খড়ের গাদায় সূঁচের সন্ধান করছি আমরা।'

'যদি...যদি আপনারা খোঁজ পান ?'

'তাহলে বুঝবো আমরা খুনি মেয়েটাকে পেয়ে গেছি।'

অবিশ্বাস্য মন্থর গতিতে কাটতে লাগল দিন। খবরের কাগজে ফলাও করে হ্যারীর খুনেররহস্য ছাপা হচ্ছে। পুলিশ হন্যে হয়ে হাবক্যাপবিহীন গাড়ির সন্ধানে ব্যস্ত। তারপর বেটি আর রয়েস ফেয়ারচাইল্ডদের অদম্য কৌতূহল তো আছেই। আর যতদিন যাচ্ছে, টের পাচ্ছে মোনা, ওর চারপাশে পুলিশী প্রহরার সংখ্যাও বাড়ছে। তবে পুলিশ খুনীর কোন সন্ধানই করতে পারছে না। মোনা মাত্র নিজেকে নিরাপদ ভাবতে শুরু করেছে- এই সময় মূর্তিমান আতঙ্কের মতো হাজির হলো লোকটা।

সেদিন সন্ধ্যায় মোনার দোরগোড়ায় চওড়া কাঁধের লম্বা এক লোক উপস্থিত হলো। তার পরনে নোংরা, জীর্ণ পোশাক, মুখে কৃত্রিম হাসি, ঠোঁটে সিগারেট। তার পেছনে একটি গাড়ি, ড্রাইভওয়েতে পার্ক করা।

মোনা আগন্তুককে না চেনার ভান করল। 'কি চাই ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ভণিতা রাখুন, ম্যাম', বলল লোকটা। 'আমি ফ্রেড টেলর। আমাকে আপনি ভাল করেই চেনেন। আমার পেছনের গাড়িটাকেও।'

নিমিষে মোনার মুখের রক্ত সরে গেল।

'দেখুন, আমি পুলিশের কাছে যেতে পারতাম। বলতে পারতাম এক মহিলাকে আমি চিনি, যিনি আমাদের একটা গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে হাবক্যাপ ছাড়া ওটাকে ফিরিয়ে এনেছেন।'

'মি. টেলর, আমি-'

'আপনার ছবি খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে, মিসেস রোপ। এছাড়াও হাবক্যাপ হারানোর ঘটনাসহ আপনার স্বামীর দশ হাজার ডলার নিয়ে পলায়নের ঘটনাও বেশ রসিয়ে বর্ণনা করেছে ওরা।'

ফ্রেড টেলর মোনাকে প্রায় ঠেলে ভেতরে ঢুকলো, একটা চেয়ার টেনে বসল। 'বসে পড়ো, খুকি', ভদ্রতার মুখোশ খুলে ফেলল সে। দাঁত বের করে বলল, 'বসো। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।'

'কিসের কথা ?' চেঁচিয়ে উঠল মোনা।

'হারানো দশ হাজার ডলার সম্পর্কে, হানি। ওখান থেকে আমাকে পাঁচ দিলেই আমি একেবারে বোবা হয়ে যাব। বেশি চাইনি কিন্তু। মাত্র অর্ধেক।' সিগারেট টানতে টানতে টেলর বলল, 'দেখো, আমি খুব ভাল করেই জানি এসব ঘটনা কিভাবে ঘটে। স্ত্রী স্বামীকে প্ররোচনা দেয় তার অফিস থেকে টাকা মারতে। দু'জনে মিলে প্ল্যান প্রোগ্রাম করে। তারপর কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে স্ত্রী বলে, 'চলো, দক্ষিণ আমেরিকাটা একবার ঘুরে আসি। কিন্তু স্বামী বেচারার আর দরজার বাইরে পা রাখার সৌভাগ্য হয় না। স্ত্রী তার চোদ্দটা বাজিয়ে দেয়। তারপর সে একাই মজা করতে থাকে।'

'বাহ্, দারুণ গপপো ফাঁদতে জানো দেখছি।' বলল মোনা।

'তাই কি ?' হাসলো ফ্রেড টেলর, তবে চেহারায় কোন ভাব ফুটল না। হঠাৎ তার মুখ কঠোর হয়ে উঠল। 'হানি, আমি এখানে গপপো মারতে আসিনি। আমি পাঁচ হাজার ডলার চাই নতুবা পুলিশের কাছে যেতে বাধ্য হব।'

'মি. টেলর, প্লীজ...' অন্ধের মতো শব্দ হাতড়াচ্ছে মোনা। কি বলবে বুঝতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত এই ছিল তার কপালে। 'মি. টে-টেলর', ঢোক গিলে বলল সে, 'তোমাকে...তোমাকে কি একটা ড্রিঙ্ক দেব ? টাকাটা...ইয়ে মানে, আমাকে জোগাড় করতে হবে।'

ফ্রেড টেলরকে বিস্মিত দেখাল, কিন্তু কথাটা তার মনে ধরেছে বোধ হয়। মোনার সর্বাঙ্গে দ্রুত একবার নজর বোলাল সে, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, মিসেস রোপ, তোমার কথায় ভরসার গন্ধ পাচ্ছি। তুমি বন্ধু হতে চাইছ বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আমারও তাতে আপত্তি নেই।'

মোনা রান্নাঘরে ঢুকলো। তাকে অনুসরণ করল ফ্রেড টেলর। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে মোনা। কিন্তু একই সঙ্গে ঝড়ের গতিতে মাথা চলছে। এই মূর্তিমান আতঙ্কটার হাত

থেকে তাকে রক্ষা পেতেই হবে। সে এক বোতল বুরবন বের করল। ফ্রেড মন্তব্য করল, 'ভাল মাল।' কাবার্ড থেকে দুটো গ্লাস বের করল মোনা, ফ্রিজ খুলল। আইস কমপার্টমেন্টে বরফের কিউবগুলো ট্রের সঙ্গে শক্তভাবে লেগে আছে। মোনা কিউবগুলো ছোটাতে চেষ্টা করছে, টের পেল ফ্রেড অশ্লীলভাবে তার শরীরের সঙ্গে গা ঠেসে ধরেছে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে ইচ্ছে করল মোনার। কিন্তু ফ্রেড বলল, 'দেখি, আমি কিউবগুলো নিচ্ছি।' সিধে হয়ে গেল মোনা, কিন্তু ফ্রেড ওর কাঁধ চেপে ধরল, চোখে চিকচিক করছে কামনা। ঝুঁকল ফ্রেড, চুমু খাবে। ঝট করে মুখ সরিয়ে নিল মোনা। এক মুহূর্তের জন্যে ফ্রেডের মুখ ছুঁয়ে গিয়েছিল মোনার চিবুক, বোঁটকা একটা গন্ধ পেল মোনা। বিদ্যুৎগতিতে হাতটা ওপর দিকে উঠে এল, ঠাস করে ফ্রেডের গালে চড় কষাল সে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল ফ্রেড, কিন্তু মোনাকে অবাক করে দিয়ে ছেড়ে দিল। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ফ্রেড মোনার দিকে, ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে।

'ঠিক আছে, খুকী। তোমার বন্ধুত্ব তাহলে স্রেফ ভান! যাকগে, টাকাটা আমার এক্ষুণি চাই! বের করো শিগগির।'

মোনা হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে আছে, এদিক ওদিক মাথা নাড়ল।

আবার কাঁধ চেপে ধরল ফ্রেড ভয়ানক ঝাঁকি দিতে লাগল। 'মাগী! টাকা কোথায় রেখেছিস শিগগির বল!' গর্জে উঠল সে।

'গা-গাড়িতে!' ফুঁপিয়ে উঠল মোনা।

ঝাঁকুনি বন্ধ করল ফ্রেড, তীক্ষ্ণ চোখে চাইল মোনার দিকে। মোনা যন্ত্রমানুষের মতো হাঁটতে শুরু করল, ফ্রেড, ওর সঙ্গে এগোল। গ্যারেজে চলে এলো দু'জনে। মোনা সব কাজ যেন করছে একটা ঘোরের মধ্যে। জানে না কিসের জন্যে সে গ্যারেজে এসেছে, আসলে অবচেতনভাবে ও একটা অস্ত্র খুঁজছিল পশুটাকে শায়েস্তা করতে, ওর হাত থেকে রক্ষা পেতে। গ্যারেজে কি সে রকম কিছু নেই ?

শূন্য দৃষ্টিতে চারপাশে চোখ বোলাচ্ছে মোনা, পাশে দাঁড়ানো ফ্রেড টেলর বলল, 'এই গাড়িতেই তো, নাকি ?'

'না ট্রাঙ্কে', পকেট হাতড়ে চাবি বের করল মোনা, ট্রাঙ্ক খুলল। খোলা ট্রাঙ্কটা মুখ ব্যাদান করল মোনার দিকে চেয়ে, ওঠার মধ্যে জ্যাক আর টায়া রেন্টটা পড়ে আছে।

'খুকী...'

কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল ফ্রেড। দেখল মোনা ট্রাঙ্কের মধ্যে কি যেন খোঁজাখুঁজি শুরু করেছে। এবার কি একটা ধরে টানতে শুরু করল মোনা, ছোটাতে পারছে না।

ফ্রেড মোনার কোমরে হাত রাখল, প্রায় ছুঁড়ে ফেলল গ্যারেজের দরজার ওপরে।

'টাকাটা এখানে আছে, খুকী ?' কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল সে। 'লাইনিং- এর পেছনে ?'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মোনা।

ফাঁদে পা দিল ফ্রেড টেলর। ট্রাঙ্কের মধ্যে উঁকি দিল সে, হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকলো, লাইনিং ছিঁড়তে শুরু করল। টায়ার রেঞ্চটা মোনার সাহায্যে আসার জন্যেই

যেন অদূরে অপেক্ষা করছিল। সামনে বাড়ল মোনা, ঝট করে তুলে নিল লোহার ভারী অস্ত্রটা, শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে মরণ-আঘাত হানল ফ্রেডের মেরুদন্ডে। আর্তনাদ করে উঠল সে, প্রবল ঝাঁকি খেল শরীর। ট্রাঙ্কের ডালায় প্রচন্ড জোরে থেতলে গেল মাথা। এবার রেঞ্চটা ঘুরিয়ে ফ্রেডের উরুর পিছনে মারল মোনা। গলা চিরে চিৎকার বেরিয়ে এলো ফ্রেডের, মাথাটা ট্রাঙ্ক থেকে বের করেছে মাত্র, তৃতীয় আঘাতটা করল মোনা ওর মুখে। তারপর যেন খুনের নেশা পেয়ে গেল ওকে। একের পর এক বাড়িতে ফ্রেডের মাথাটা চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলল।

রেঞ্চটা লাশের গায়ে ফেলে ট্রাঙ্ক বন্ধ করল মোনা, হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগল। ফোঁপানির মতো শ্বাস বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে, শরীরে সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। তবে কাজটা করতে পেরেছে মোনা। ট্রাঙ্কের ভেতরে লোকটা আর কখনও তাকে বিরক্ত করতে আসবে না।

টলমল পায়ে ঘরে ফিরল মোনা। জট পাকানো চিন্তা-ভাবনাগুলো গোছাতে চেষ্টা করল। ফ্রেড টেলরের লাশটা কোথাও ফেলতে হবে। নদীতে ফেলা যায়। কিন্তু তেমন কোন নির্জন জায়গা মিলবে কি ?

হঠাৎ দরজায় কলিংবেলের আওয়াজ! ভয়ানক চমকে উঠল মোনা, দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে গেল শরীর। ওঠার শক্তি পাচ্ছে না। আবার বেল বাজল। পারব না, কাঁপতে কাঁপতে ভাবল মোনা, আমি আর পারব না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়াল, গভীর শ্বাস টানল একটা, দাঁতে দাঁত চেপে পা বাড়াল সামনের দরজার দিকে। দরজা খুলতেই শিঁরদাড়া বেয়ে শীতল একটা স্রোত নামতে শুরু করল। চিৎকার দিতে যাচ্ছিল, শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামাল দিল ও। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সার্জেন্ট ব্রাঙ্কস।

সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস চোখ কুঁচকে, বলল, শুভ সন্ধ্যা, মিসেস রোপ। কোন সমস্যা ?'

স্বাভাবিক থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে মোনা। 'না', জবাব দিল সে। কণ্ঠ ভাঙা শোনাল। 'মানে-' মাঝ পথে থেমে গেল সে। তারপর বলল, 'মানে আপনাকে এই সময়ে ঠিক আশা করিনি। ভেবেছিলাম ওই লোকটাই আবার এলো কিনা!'

'আচ্ছা ?' প্রশ্নবোধক চোখে চাইল ব্যাঙ্কস।

ড্রাইভওয়েতে পার্ক করা গাড়িটাকে আঙুল দিয়ে দেখাল মোনা। 'একটা লোক এসেছিল কিছুক্ষণ আগে। একজন সেলসম্যান। লোকটা ভাল না। আমি ওকে বের করে দেই। আর আপনি যখন বেল বাজালেন, ভাবলাম...ইয়ে মানে ওই লোকটাই বুঝি আবার এসেছে। ওকে আরও কড়া কিছু কথা শোনাবার ইচ্ছে নিয়েই দরজা খুলেছিলাম আমি।'

'হয়তো লোকটা কাছে পিঠে কোথাও থাকতে পারে', বলল সার্জেন্ট। 'তবে ওখানে গাড়ি পার্ক করা তার উচিত হয়নি।'

'সম্ভবত তাড়াহুড়োয় কাজটা করেছে সে।' বলল মোনা। ''থাকগে, আপনার জন্যে কি করতে পারি, বলুন ?'

'তেমন কিছুই না। এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি খাওয়ালে কৃতার্থ হব, মিসেস রোপ।'

'এক্ষুণি দিচ্ছি।'

সার্জেন্টকে রান্নাঘরে নিয়ে এলো মোনা, তার এহেন অদ্ভুত অনুরোধে খানিকটা হতচকিত সে। গ্লাসে পানি ঢাললো মোনা। এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করল সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস, মোনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে চলে এল। ড্রাইভওয়েতে গাড়িটার দিকে আবার চাইল সার্জেন্ট। 'আমি কি ওই সেলসম্যানকে খুঁজে বের করে বলব গাড়িটা এখান থেকে সরিয়ে নিতে ?'

'না', মোনার মনে হলো সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। 'থাক, যার গাড়ি সেই সময়মত নিয়ে যাবে। আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।'

'ঠিক আছে, মিসেস রোপ। গুড নাইট, সার্জেন্ট।'

সার্জেন্ট ব্যাঙ্কসকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করল মোনা। সার্জেন্ট গাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, দরজা খুলল। রেজিস্ট্রেশন বুকের ওপর চোখ বোলাল, তারপর রাস্তায় উঠল। এদিক ওদিক বার দুই তাকালো সবশেষে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে একটা কালো সেডানে চড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এখন মোনার করণীয় কাজ একটাই। কনভার্টিবল গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়া। সার্জেন্ট যদি মোনার কল্পিত সেলসম্যানের জন্যে কোথাও অপেক্ষা করতে থাকে তাহলে সে মোনাকে অনুসরণ করবে না। সে শুধু ড্রাইভওয়েতে পার্ক করা গাড়িটার দিকে নজর রাখবে। হয়তো সারারাত সে এখানেই থাকবে। ভাড়া করা সেডানও নড়বে না। পরদিন সহজেই মোনার গল্পটা বিশ্বাসযোগ্যতা পাবে। এক সেলসম্যান তার ড্রাইভওয়েতে গাড়িটা পার্ক করে তার বাসায় এসেছিল। কিন্তু লোকটাকে পছন্দ হয়নি বলে সে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মোনা ভেবেছে সেলসম্যান হয়তো পড়শীদের কারও বাড়িতে গেছে। না, মোনা জানে না, লোকটা কেন তার গাড়ি নিতে আর ফিরে আসেনি।

মোনা কনভার্টিবলটাকে গ্যারেজ থেকে বের করল, মূল রাস্তায় উঠতে যাচ্ছে, হঠাৎ কালো সেডানটা যেন মাটি ফুঁড়ে সামনে এসে দাঁড়াল, মোনা বাধ্য হলো ব্রেক কষতে।

সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস ওর কাছে এল। খোলা জানালায় ঝুঁকে বলল, 'আপনার বয়ফ্রেন্ডটি কোথায়, মিসেস রোপ ?' সার্জেন্টের চেহারা পাথরের মতো কঠিন।

মোনা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরল স্টিয়ারিং হুইল, সাদা হয়ে গেল আঙুলের গাঁট। 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না, সার্জেন্ট।'

'আপনাদের এখানে কোন সেলসম্যান আসেনি, মিসেস রোপ। আর আপনার উঠানে ওটা একটা ভাড়া করা গাড়ি। আমার ধারণা আপনার বাড়িতে একটা লোক লুকিয়ে রয়েছে। অবৈধ সম্পর্ক শুধু পুরুষরাই করে না, কথাটা নিশ্চয়ই জানেন। এটা কি সম্ভব নয় যে আপনিও অনেকদিন ধরে কারও সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করে যাচ্ছেন ? এটাও কি সম্ভব নয় যে আপনি আর আপনার প্রেমিক দু'জনে মিলেই আপনার স্বামীর হত্যা পরিকল্পনা করেছেন ? আর এটাও বা অসম্ভব কি যে সেই পরিকল্পনাটির সফল

বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে আপনার প্রেমিক প্রবর ? এই প্রশ্নগুলো আমাকে ভীষণ তাড়া করছে, মিসেস রোপ।'

'সার্জেন্ট! খাবি খেল মোনা। 'এসব আপনি কি বলছেন ? আমি আজই আপনার বসের সঙ্গে কথা বলব। জানেন আমি তা পারি।'

'জ্বী, মিসেস রোপ', বলল সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস। 'তা আপনি পারেন। ঠিক আছে, লেফটেন্যান্ট পোলিংকে ফোন করুন আর বলুন-'

'ওহ্ সার্জেন্ট, দিস ইজ অ্যাবসার্ড!' ঝট করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল মোনা।

'আপনার গাড়ির চাবি, প্লীজ।'

'কি ?' চিৎকার করে উঠল মোনা।

সার্জেন্ট বাঙ্কস তীক্ষ্ণ চোখে কিছুক্ষণ কনভার্টিবলটাকে পরীক্ষা করল। মোনার হার্টবিট বেড়েই চলল। ট্রাঙ্ক বেয়ে রক্ত পড়ছে না তো ? মোনা মনে করতে পারল না ফ্রেডকে হত্যা করার সময় ওর শরীর রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল কিনা...

'চাবি, মিসেস রোপ ?' হাত বাড়াল সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস, অপেক্ষা করছে।

হতবুদ্ধি মোনা এদিক ওদিক মাথা নাড়ল। 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'হতে পারে আপনি আপনার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে পালিয়ে যাবার প্ল্যান করেছেন', বলল সে। 'হতে পারে সে ট্রাঙ্কে লুকিয়ে আছে। ট্রাঙ্কটা তাই আমাকে খুলে দেখতে হবে।'

গলা চিরে আর্তনাদ বেরিয়ে এলো মোনার, ঘুরে দাঁড়াল, দৌড় দেবে। কিন্তু সার্জেন্ট বাঙ্কস ওর চেয়ে অনেক ক্ষিপ্র। খপ করে সে মোনার কব্জি ধরে ফেলল, গাড়ির সঙ্গে ওকে ঠেসে ধরে সমস্ত ওজন চাপিয়ে দিল গায়ে। খোলা জানালার দিকে হাত বাড়াল সার্জেন্ট, একটানে ইগনিশন সুইচ থেকে খুলে আনল চাবির গোছা, মোনাকে চেপে ধরে নিয়ে এলো গাড়ির পেছনে। গোছা থেকে সঠিক চাবিটা বের করে ট্রাঙ্কের তালায় লাগাল ব্যাঙ্কস। তারপর একটানে ডালাটা তুলে ফেলল ওপরে।

ভেতরের দৃশ্যটা দেখে আঁতকে উঠল সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস, আর একই সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল মোনা রোপ।

এ হোম অ্যাওয়ে ফ্রম হোম

রবার্ট ব্লচ

স্টেশনে পৌঁছুতে অনেক দেরি করে ফেলেছে ট্রেন। ন'টার বেশি বাজে। হাই টাওয়ার স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে নাটালি। একা।

বন্ধ হয়ে গেছে স্টেশন। এটা স্রেফ একটা ওয়ে স্টপ। এদিকে শহর-টহর চোখে পড়ছে না। কী করবে বুঝতে পারছে না নাটালি। ড. ব্রেসগার্ডলের স্টেশনে আসার কথা। লন্ডন ছাড়ার আগে চাচাকে সে চিঠি লিখেছে। বলে দিয়েছে কখন পৌঁছুবে। কিন্তু ট্রেন লেট করায় সব ভন্ডুল হয়ে গেল। চাচা বোধহয় এসেছিলেন। অপেক্ষায় থেকে শেষে চলে গেছেন।

চারপাশে একবার নজর বোলাল নাটালি অস্বস্তি নিয়ে। হঠাৎ দেখতে পেল একটা টেলিফোন বুম। এবার নাটালির সমস্যার সমাধানের উপায় পাওয়া গেছে। ড. ব্রেসগার্ডলের লেখা সর্বশেষ চিঠিটা আছে ওর পার্সে। তাতে ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার দুইই দেওয়া। বুদের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ব্যাগ হাতড়ে কাগজটা বের করল নাটালি।

লাইন পেতে সমস্যা হলো। অপারেটর কানেকশনই দিতে পারছে না। অনেকক্ষণ বিজবিজ, হুঁশহাশ নানা বিচিত্র শব্দ হলো লাইনে। বুদের কাঁচের দেয়াল থেকে স্টেশনের পেছনে জাহাজের সারি নজরে এলো নাটালির। লাইন পাবার সমস্যার কারণ বোঝা গেল। শত হলেও এটা পশ্চিমা দেশ, মনে মনে বলল নাটালি। ব্যবস্থাপনা খানিকটা সেকেলে তো হবেই-

'হ্যালো, হ্যালো!'

এক মহিলার কণ্ঠ ভেসে এলো ফোনে, তারস্বরে চিল্লাচ্ছে। এখন আর অদ্ভুত বিজবিজ শব্দটা শোনা যাচ্ছে না। বরং কতগুলো অস্পষ্ট গলা শুনতে পাচ্ছে নাটালি। মাউথ পিস মুখে চেপে কথা বলতে শুরু করল সে।

'নাটালি রিভারস বলছি', জানাল ও। 'ড. ব্রেসগার্ডেল আছেন ?'

'কী নাম বললেন ?'

'নাটালি রিবারস। আমি ডক্টরের ভাতিঝি।'

'ডক্টরের কী, মিস ?'

'ভাতিঝি', কথাটা আবার বলল নাটালি। 'আমি চাচার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই, প্লিজ।'

'একটু ধরুন।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। ফোন লাইনে মিশ্রিত কণ্ঠস্বর উচ্চকিত হয়ে উঠল, তারপর গম্ভীর একটা গলা ভেসে এল, অন্য স্বরগুলো থেকে আলাদা।

ড. ব্রেসগার্ডল বলছি। মাইডিয়ার নাটালি, তোমাকে আমি আশাই করিনি!'

‘আশা করেননি ? কিন্তু আমি তো আপনাকে বিকেলেই লন্ডন থেকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি।’ অধৈর্য্য শোনাল নাটালির কণ্ঠ। ‘পাননি ?’

‘ডাক বিভাগের সার্ভিস এখানে খুব একটা ভাল নয়।’ ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসলেন ডক্টর। ‘না ডিয়ার, তোমার টেলিগ্রাম আমার কাছে পৌছেনি। কিন্তু তুমি পৌছে গেছ’, আবার হাসলেন তিনি। ‘তুমি কোথায়, ডিয়ার ?’

‘হাই টাওয়ার স্টেশনে।’

‘জায়গাটা ঠিক বিপরীত দিকে।’

‘বিপরীত দিকে ?;

‘পিটার কিকের বাড়ির বিপরীত দিকে। তুমি ফোন করার আগে আগে ও ফোন করছিল। অ্যাপেনডিক্স সমস্যা। বলেছিলাম যাব ওকে দেখতে।’

‘এখনও এসব সাধারণ চিকিৎসার জন্যে ওরা আপনাকে ডাকে ?’

‘ইমার্জেন্সি, মাই ডিয়ার। এদিকে ডাক্তার আরও আছেন। তবে তাদের ভাগ্যে রোগী খুব কমই জোটে।’ আবার হাসতে শুরু করলেন ড. ব্রেসগার্ডল, তারপর থেমে গেলেন। ‘শোনো। তুমি স্টেশনেই থাকো। আমি মিস প্লুমারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমাকে নিয়ে আসার জন্যে। তোমার সাথে লাগেজ কি বেশি ?’

‘শুধু আমার ট্রাভেল ব্যাগ। বাকি জিনিসপত্র বোটে আসছে।’

‘বোট ?’

‘চিঠিতে বোটের কথা লিখিনি আমি ?’

‘ও হ্যাঁ। লিখেছ। ঠিক আছে। কোন সমস্যা নেই। মিস প্লুমার ওয়াগন নিয়ে সোজা তোমার কাছে চলে যাবে।’

‘আমি প্ল্যাটফর্মের সামনে থাকব।’

‘কী বললে ? জোরে বলো। শুনতে পাচ্ছি না।’

‘বললাম যে প্ল্যাটফর্মের সামনে থাকব।’

‘আচ্ছা’, আবার খিক খিক হাসলেন ডক্টর। ‘এখানে পার্টি চলছে কিনা। তাই গোলমালে-’

‘আমি গেলে কোন অসুবিধা হবে না তো ? না, মানে, আপনি তো জানতেন না যে আমি আসব।’

‘আরে না! কোন অসুবিধা হবে না। তুমি আসার আগেই হয়তো ওরা চলে যাবে। তুমি প্লুমারের জন্যে অপেক্ষা করো।’

ফোন নামিয়ে রাখার শব্দ পেল নাটালি। ফিরে এলো প্ল্যাটফর্মে। অল্পক্ষণের মধ্যে চলে এলো একটা স্টেশন ওয়াগন। ট্রাকের কোনায় স্কিড করে দাঁড়িয়ে পড়ল। লম্বা, পাতলা ধূসর চুলের এক মহিলা, গায়ে কোঁচকানো সাদা ইউনিফর্ম, বেরিয়ে এলো ওয়াগনের দরজা খুলে। ইশারায় ডাকল নাটালিকে।

‘চলে আসুন’, বলল সে। ‘আমি এটা পেছনে তুলে দিচ্ছি।’

ট্রাভেল ব্যাগটা সে ওয়াগনের পেছনে ছুঁড়ে ফেলল। ‘উঠে পড়ুন- আমরা এখুনি রওনা হব।’

নাটালির দিকের দরজা বন্ধ না হতেই মিস প্লুমার স্টার্ট দিল ইঞ্জিন, গাড়ি এক লাফে উঠে এলো রাস্তায়।

দ্রুত স্পিড উঠে গেল সত্তরে। ভয়ে সিটিয়ে গেল নাটালি। মিস প্লুমার আড়চোখে দেখল তাকে।

'দুঃখিত', বলল সে। 'ডাক্তার কলে গেছেন। তাই আমার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা দরকার।'

'ও হ্যাঁ। চাচা বলেছে আমাকে। বলেছে তার বাসা ভর্তি লোক।'

মিস প্লুমার চৌমাথায় এসে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল, ক্যাঁচ করে উঠল টায়ার রাস্তার সাথে ঘষায়। কিন্তু মহিলা স্পিড কমাল না। রাস্তার দিকে না তাকিয়ে কথা বলে যাবে ঠিক করল নাটালি। তাতে ভয় কম লাগবে।

'আমার চাচা মানুষ কেমন ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'দেখেননি তাঁকে আগে ?'

'না, খুব ছোট বেলায় বাবা মা আমাকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া চলে যায়। ইংল্যান্ডে এই প্রথম এসেছি। বলা উচিত, ক্যানবেরা ছেড়ে এই প্রথম কোথাও বেরুলাম আমি।'

'আর কেউ আসেনি আপনার সঙ্গে ?'

'বাবা-মা মাস দুই আগে মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে', বলল নাটালি। 'চাচা বলেনি আপনাকে ?'

'নাহ্। আসলে অনেকদিন ওনার সঙ্গে দেখা হয়নি আমার।' হঠাৎ খ্যাঁক করে উঠল মিস প্লুমার। গাড়িটা প্রবল একটা ঝাঁকুনি খেল। 'মোটর অ্যাক্সিডেন্ট, অ্যাঁ ? কিছু লোক আছে গাড়ি চালাতেই জানে না। তবুও গাড়ি চালাতে যায়। ডক্টর মাঝে মাঝে বলেন কথাটা।'

মাথা ঘোরাল সে, পিট পিট করে তাকালো নাটালির দিকে।

'এখানে কি থাকতে এসেছেন ?'

'জ্বী। আমার অভিভাবক বলতে এখন শুধু এই চাচাই। অথচ চাচার চেহারাই দেখিনি আজ পর্যন্ত। চিঠি পড়ে তো আর মানুষের সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায় না।' সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল মিস প্লুমার। নাটালি খানিকটা ইতস্তত করে বলল, 'সত্যি বলতে কি, আমার একটু অস্বস্তিই লাগছে। কারণ এর আগে কোন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে পরিচয় হয়নি আমার।'

'হয়নি, না ?' বলল মিস প্লুমার। 'তা হলে আপনাকে সৌভাগ্যবতী বলতে হবে। আমার সাথে কয়েকজনের পরিচয় হয়েছে। ওদের মধ্যে ড. ব্রেসগার্ডলই সেরা। আপনার চাচার রোগীর অভাব নেই। প্রচুর পয়সা কামিয়েছেন তিনি। বাড়িও কিনে ফেলেছেন।' বলতে বলতে একটা বিশাল ড্রাইভওয়ে দিয়ে ঘেরা বাড়িটি। বাড়ির জানালায় হালকা আলোর রেখা দেখতে পেল নাটালি। ওটাই ওর চাচার বাড়ি বুঝতে পারল সে।

'এহ্হে', বিড়বিড় করল নাটালি।

'কী হলো ?'

'আজ শনিবার-চাচার গেস্টরা এসেছে। আর আমি অনাহুতের মত-'

'ও নিয়ে আর কথা বলবেন না তো', বলল মিস প্লুমার। 'এখানে কোন ফর্মালিটির ব্যাপার নেই। এখানে আসার আগে ডাক্তার তাই বলেছিলেন আমাকে। এটাকে নিজের বাড়ি বলে ভাবুন।'

খ্যাঁক করে উঠল মিস প্লুমার। একই সাথে চেপে ধরেছে ব্রেক। কালো একটা লিমোজিনের পেছনে দাঁড়িয়ে পড়ল স্টেশন ওয়াগন।

'নেমে পড়ুন', মিস প্লুমার পেছনের সীট থেকে ব্যাগ নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। ঘাড় ঘুরিয়ে ইশারা করল নাটালিকে তার পেছন পেছন আসতে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল প্লুমার। চাবি খুঁজছে। 'কড়া নেড়ে লাভ হবে না', বলল সে। 'কেউ শুনতে পাবে না।' খুলে গেল দরজা। ফোনে অস্পষ্ট যে কণ্ঠ শুনতে পেয়েছিল নাটালি এখন সেই স্বরগুলোকে মনে হলো তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল নাটালি। ইতস্তত করছে ভিতরে যেতে। মিস প্লুমার ঢুকে গেছে ভেতরে।

'চলে আসুন! চলে আসুন! ডাকল সে।

অনুগতের মতো তার পেছন পেছন গেল নাটালি। দরজা বন্ধ করে দিল মিস প্লুমার। ঘরে প্রচুর আলো। চোখ ঝলসে যায়।

লম্বা, নির্জন একটা হলওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে নাটালি। ঠিক তার সামনে প্রকান্ড সিঁড়ি; রেলিং এবং দেয়ালের মাঝখানে একটি ডেস্ক এবং একখানা চেয়ার। বামে কালো, সরু দরজা-ড. ব্রেসগার্ডলের প্রাইভেট অফিস ওটা। দরজার মাথায় ছোট পেতলের প্লেটে লেখা নাম দেখে বোঝা গেল। নাটালির ডানে বিশাল, খোলা বৈঠকখানা। জানালার ভারী পর্দা ঝুলছে। বন্ধ। ওদিক থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে আসছে শব্দ।

হল পার হয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল নাটালি। আড়চোখে তাকালো বৈঠকখানার দিকে। বড় একটা টেবিল ঘিরে বসেছে জনা কয়েক মানুষ। কথা বলছে, একজন আরেকজনের প্রতি বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করছে। টেবিল টপে সার বাঁধা অনেকগুলো মদের বোতল। হঠাৎ কী কারণে হো হো করে হেসে উঠল একজন।

প্রবেশ পথ পার হয়ে গেল নাটালি আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। কেউ ওর দিকে না তাকালেই হয়। কারও মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায় না নাটালি। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল মিস প্লুমার ওর ব্যাগ নিয়ে আসছে কিনা। আসছে। তবে প্লুমারের হাত খালি। সিঁড়িতে পা রাখতেই বলে উঠল প্লুমার, 'ওপরে যাবেন নাকি ? তারচে' এদিকে আসুন। অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই।'

'মুখ হাত ধুয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে নেব ভাবছিলাম।'

'আগে আপনার ঘর ঠিক করি। তারপর যাবেন। ডক্টর আগে থেকে কিছুই বলেননি, জানেনই তো।'

'শুধু মুখ হাত ধুয়ে নিলেই চলত-'

'ডক্টর যে কোন মুহূর্তে চলে আসবেন। তার জন্যে অপেক্ষা করুন', বলে নাটালির হাত চেপে ধরল মহিলা। ঠিক এরকমভাবে গাড়ি চালাবার সময় হুইল ধরেছিল সে। নাটালিকে প্রায় টানতে টানতে আলোকিত ঘরটির দিকে নিয়ে চলল।

'ইনি আমাদের ডক্টরের ভাতিঝি', ঘোষণার সুরে বলল মিস প্লুমার। 'মিস নাটালি রিভারস, অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন।' প্রায় সবগুলো মাথা ঘুরে গেল নাটালির দিকে। খাটো, মোটা, হাসিখুশি চেহারার এক লোক তার আধখালি মদের গ্লাসটা নাড়ল নাটালিকে উদ্দেশ্য করে।

'সোজা অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন, অ্যাঁ ?' গ্লাসটা এগিয়ে দিল সে। 'আপনার নিশ্চয়ই তেষ্টা পেয়েছে। নিন, এটা পান করুন। আমি আরেকটা নিচ্ছি।' নাটালি কিছু বলার আগেই সে ফিরে গেল টেবিলে, যোগ দিল সঙ্গীদের সাথে। 'মেজর হ্যামিলটন', ফিসফিস করে বলল মিস প্লুমার। 'মজার মানুষ। তবে আজ সামান্য মাতাল হয়ে পড়েছেন।'

চলে গেল মিস প্লুমার। হাতের গ্লাসটার দিকে অস্বস্তি নিয়ে তাকালো নাটালি। এটা কোথায় রাখবে বুঝে উঠতে পারছে না।

'আমার কাছে দিন', লম্বা, ধূসর-চুলের, মোচঅলা অভিজাত চেহারার এক লোক এগিয়ে এল। নাটালির হাত থেকে নিয়ে নিল গ্লাস।

'ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই। মেজরকে ক্ষমা করে দেবেন পার্টির মেজাজে আছেন বুঝতেই পারছেন।' তিনজন পুরুষ এবং একজন সুন্দরী নারী দল বেঁধে গল্প করছিল। তাদের উদ্দেশ্য করে নড করল লম্বা মানুষটি। 'আর যেহেতু এটা একটা বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান-'

'অঃ আপনি এখানে।' মেজর হ্যামিলটন নাচতে নাচতে এগিয়ে এলো নাটালির কাছে। হাতে মদের নতুন গ্লাস। লালচে মুখে তাজা হাসি। 'আবার চলে এলাম', ঘোষণা করল সে। 'বুমেরাং-এর মত, তাই না ?'

দুলে দুলে হাসতে হাসতে লাগল মেজর। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, 'অস্ট্রেলিয়া তো বুমেরাং-এর রাজ্য তাই না ? গ্যালিপোলিতে আপনার মতো কয়েকজন অসির সাথে পরিচয় হয়েছিল। অবশ্য সে অনেক আগের কথা।'

'প্লিজ, মেজর', লম্বা লোকটি হাসলো নাটালির দিকে তাকিয়ে। তার উপস্থিতির মধ্যে নিরাপদ একটা ব্যাপার আছে, আর মানুষটাকে কেন জানি চেনা চেনাও লাগছে। একে আগে কোথাও দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না নাটালি। দেখল লম্বা লোকটি মেজরের কাছে গিয়ে তার হাত থেকে ড্রিঙ্কের গ্লাসটি নিয়ে নিল।

'দেখুন দিকি' কথা বলার সময় থুথু ছিটল মেজরের মুখ থেকে।

'অনেক গিলেছেন, ওল্ড বয়। এখন যাবার সময় হয়ে গেছে।'

মেজর চারপাশে নজর বুলাল, শরীরের পাশে দুলছে হাতজোড়া।। 'সবাই দেখছি মদ গিলছে!' জড়ানো গলায় বলল সে। নিজের গ্লাসের জন্য হাত বাড়ালো। কিন্তু লম্বা

মানুষটি এড়িয়ে গেল তাকে। ঘাড় ঘুরিয়ে নাটালির দিকে তাকিয়ে হাসলো সে, তারপর মেজরকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে নিচু গলায় কী যেন বলতে লাগল। মাতাল মেজর সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে দ্রুত মাথা ঝাঁকাল।

ঘরের চারদিকটা একবার দেখল নাটালি। কেউ তাকে লক্ষ করছে না শুধু এক পৌঢ় মহিলা ছাড়া। সে একটা পিয়ানো সামনে টুলে বসে আছে একা। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল নাটালির দিকে। নাটালির ভারী অস্বস্তি হতে লাগল। যেন বিশাল রঙ্গমঞ্চে অনাহুতের মতো ঢুকে পড়েছে। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল নাটালি। আবার চোখ চলে গেল কাঁধ খোলা ব্লাউজ পরা সেই সুন্দরী মহিলার দিকে। মিস প্লুমারকে খুঁজল নাটালি। কিন্তু কোথাও দেখতে পেল না।

হলঘরে ফিরে এলো নাটালি, উঠতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে।

'মিস প্লুমার।' ডাকলো সে।

জবাব নেই।

এমন সময় চোখের কোণ দিয়ে দেখল হলঘরের ওপাশের রুমটির আধ ভেজানো দরজাটি এখন খোলা। রুমটি থেকে বেরিয়ে এলো মিস প্লুমার। হাতে একজোড়া কাঁচি। নাটালি তাকে ডাকার আগেই সে দ্রুত অন্য দিকে চলে গেল।

এখানকার লোকগুলো যেন কেমন, ভাবছে নাটালি। অবশ্য সব পার্টিতেই অদ্ভুত লোকজনের আগমন ঘটে। মিস প্লুমারের পেছন পেছন যাবে ভাবছিল নাটালি। এ জন্য সিঁড়ি বেয়ে নেমেও এসেছিল। কিন্তু খোলা দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এটা তার চাচার কনসালটেশন রুম। চাচার কনসালেটেশন রুম দেখার খুব শখ ছিল নাটালির। সে কৌতুহল নিয়ে দেখতে লাগল। আরামদায়ক একটা ঘর। ঘর বোঝাই বই। বইয়ের শেলফের সামনে চামড়া মোড়ানো আসবাব। ডক্টরের কাউচ বা আসনটি ঘরের এক কোণে, দেয়ালের কাছে। ওটার কাছে বড় মেহগনি ডেস্ক। ডেস্কের উপরের অংশ খালি। ওখানে ফোন রাখা হয়। তবে ডেস্কে ফোন নেই। আছে বাদামী রঙের ফোন কর্ডের সরু একটা ফাঁস।

ফাঁসটা দেখে অস্বস্তির ভাবটা আবার ফিরে এলো নাটালির মাঝে। নিজের অজান্তে ই ঘরে ঢুকে পড়ল ও। তাকালো ডেস্কটপ এবং বাদামী কর্ডের দিকে।

ঠিক তখন নাটালি বুঝতে পারল কেন তার অস্বস্তি লাগছে। ফোনের তারের শেষ মাথা দেয়ালের কাছ থেকে নিখুঁতভাবে কেটে ফেলা হয়েছে।

'মিস প্লুমার!' বিড় বিড় করল নাটালি। মনে পড়ে গেল একটু আগে মিস প্লুমারকে কাঁচি হাতে এ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে সে। কিন্তু ফোনের তার কাটবে কেন সে?

ঘুরে দাঁড়াল নাটালি। একই সাথে ভিতরে ঢুকে পড়ল অভিজাত চেহরার সেই লম্বা মানুষটি।

'ফোনের কোন প্রয়োজন হবে না', এমনভাবে কথাটা বলল সে যেন নাটালির মনের কথা পড়তে পারছে। 'আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি ওটা একটা বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান।' কথা শেষ করে খিকখিক হাসলো সে।

লোকটিকে এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো খুব চেনা চেনা লাগল নাটালির কাছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল সব কথা। এই কণ্ঠই সে শুনেছে স্টেশনের ফোনে। একই রকম ভঙ্গিতে হেসেছে লোকটি।

'আপনি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন', চেঁচিয়ে উঠল নাটালি। 'আপনি ড. ব্রেসগার্ডল নন ?'

'না, মাই ডিয়ার', নাটালির পাশ দিয়ে যাবার সময় মাথা নাড়ল সে এদিক-ওদিক। 'তোমাকে এখানে কেউ আশা করেননি', আপনি চট করে তুমিতে চলে এলো লোকটা। 'আমরা যাই যাই করছি এমন সময় তুমি এলে। কাজেই বানিয়ে অনেক কিছুই বলতে হয়েছে।'

এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর নাটালি জানতে চাইল, 'আমার চাচা কই ?'

'ওই যে ওখানে।' আঙুল তুলে দেখাল লম্বা লোকটি। কাউচ এবং দেয়ালের মাঝখানে যেদিকে ইঙ্গিত করেছে সে সেখানে মানুষ নয়, রক্তাক্ত একটা মাংস পিন্ড পড়ে রয়েছে।

'পরিষ্কার করার সময় পাইনি আমরা', ব্যাখ্যা করল লোকটা। 'হঠাৎ করেই ঘটনাটা ঘটে গেল। তারপর সবাই মদ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল- ।'

তার গমগমে কণ্ঠ প্রতিধ্বনি তুলছে ঘরে। অন্য সমস্ত কোলাহল হঠাৎ করেই থেমে গেছে। মুখ তুলে চাইল নাটালি। দোরগোড়ায় ভিড় করেছে সবাই। হঠাৎ ভাগ হয়ে গেল ভিড়টা, ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো মিস প্লুমার। দ্রুত ঢুকলো ঘরে। সাদা ইউনিফর্মের উপর বেমানান একটা ফারকোট চাপিয়েছে সে।

'ওহ্ মাই!' আঁতকে উঠল সে, 'তুমি তা হলে দেখে ফেলেছ ওকে!'

মাথা ঝাঁকাল নাটালি। এক পা বাড়াল সামনে। 'কিছু একটা করুন', আকুল গলায় বলল সে। 'প্লিজ!'

'তুমি তো এখনও অন্যদেরকে দেখোইনি।' বলল মিস প্লুমার। 'কারণ ওরা সবাই দোতলায়। ডাক্তারের কর্মচারীরা। সে আরও ভয়ঙ্কর দৃশ্য।'

ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছে নারী-পুরুষের দলটা। দাঁড়িয়েছে প্লুমারের পেছনে। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে নাটালির দিকে।

নাটালি কাতর গলায় বলল, 'এ নির্ঘাত কোন পাগলের কাজ।' চিৎকার করে উঠল ও। 'আর পাগলইবা এখানে আসবে কেন ? পাগল তো থাকবে পাগলা গারদে!'

'মাই ডিয়ার চাইল্ড', বিড়বিড় করল মিস প্লুমার, চট করে বন্ধ করে দিল দরজা। দলটা নিঃশব্দে এগিয়ে আসতে লাগল ওর দিকে। সবার চোখে কেমন ক্ষুধার্ত দৃষ্টি। 'এটা তো পাগলা গারদই...!'

সাবরিনা
ডন উলফসন

প্রেক্ষাগৃহ হিসেবে ব্যবহার করা হয় বেলমন্টকে। শহরের ঘিঞ্জি, নোংরা এলাকায় ভবনটি। ওখানে এখন লাইভ শো চলছে। গায়ক, নর্তকী এবং কৌতুকাভিনেতারা নানা কসরৎ দেখাচ্ছে। কেউ ক্যাবারে নাচে, কেউ বা জাদু দেখায়। আমি আমার দুই প্রিয় বন্ধু উইনস্টন এবং জোয়ি-কে নিয়ে শো দেখতে এসেছি। আমরা সবাই সমবয়েসী-চৌদ্দ। আজ শনিবার, বিরক্তিকর একটা বিকেল। রাস্তায় কাঁহাতক হেঁটে বেড়ানো যায়। শেষে ঠিক করলাম বেলমন্টে যাব। ম্যাটিনি শো'র টিকেট দুই ডলার মাত্র। একটু মজা পেতে দু'ডলার খরচে আমাদের কারও আপত্তি নেই।

আমরা বেলমন্টে এসেছি প্রাণ খুলে হাসতে। টিকেট কাউন্টারের লোকটাকে দেখেই হাসি পেয়ে গেল। লাল টকটকে চোখ, নাকটাও লাল পচা গাজরের মত। ক্লাউন টাইপের চেহারা।

তবে লোকটার যে জিনিসটি দেখে আমাদের সবচে' হাসি পেল তা হলো নকল দাঁত। কথা বলার সময় মুখ থেকে খুলে আসছিল ওগুলো। লোকটা জিভ দিয়ে আবার দাঁতগুলো চালান করে দিল মুখের ভেতরে। ক্লাউনটা টিকেটের দাম রেখে ভাঙতি পয়সা আর টিকেট এগিয়ে দিল কাউন্টারের ফোকর দিয়ে।

'উদ্ভট সৃষ্টিটাকে দেখলে ?' জিজ্ঞেস করল উইনস্টন। হাসির চোটে নাক দিয়ে সর্দি বেরিয়ে এল।

আমি উইনস্টনের চেয়েও জোরে হাসছি, জবাবই দিতে পারলাম না।

আর জোয়ি এমন উন্মাদের মতো হাসছে যেন হাসির দমকে পড়েই যাবে। ওকে একরকম কাঁধে তুলে ক্লাউন টিকেট চেকারের পাশ দিয়ে নিয়ে এলাম। লোকটা সাদা একটা টুক্সেডো পরেছে। মানায়নি একদম।

'এত হাসাহাসি ভাল নয়', আমাদের টিকেট ছিঁড়তে ছিঁড়তে মন্তব্য করল গেটে দাঁড়ানো লম্বা লোকটা। দরদর করে ঘামছে।

'জী।' মাথা দোলাল উইনস্টন, নাক দিয়ে ঘোঁত জাতীয় শব্দ বেরোল। হাসি চেপে রাখার বৃথা চেষ্টা।

তারপর তিনজনে মিলে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। নাকে ধাক্কা মারল পুরানো কার্পেট, এবং বাসী পপকর্ন-এর মিশ্রিত বিদঘুটে একটা গন্ধ। চারপাশে চোখ বুলালাম। লোকজন নেই বললেই চলে। যে কোনও জায়গায় বসা চলে।

মঞ্চের কাছে জুৎ হয়ে বসলাম আমরা। শো শুরু হবার অপেক্ষা করছি। কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হবার কথা। তবে কখন শুরু হয় কে জানে। বিরক্ত হয়ে জোয়ি গেল পপকর্ন কিনতে। ও ফিরে এসেছে, প্রেক্ষাগৃহের আলো আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে

এল। একটা স্পটলাইটের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল স্টেজ। পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এক লোক।

'গুড আফটারনুন, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন', শিস দেয়ার মতো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে শব্দ বেরিয়ে আসছে তার। 'বেলমন্ট ভ্যারাইটি শোতে স্বাগতম! আজ আপনাদের বিনোদনের জন্য রয়েছে-'

কিন্তু লোকটার কথা আমি শুনছি না। দেখছি তাকে। এ সেই নকল দাঁতঅলা টিকেট বিক্রেতা।

'অ্যাই', বন্ধুদেরকে ফিসফিস করে বললাম আমি। 'এ লোকটার দেখছি প্রতিভার শেষ নেই। সে টিকেট বিক্রি করছে, আবার শো'র অ্যানাউন্সও করছে!'

'হুঁ।' মাথা ঝাঁকাল উইনস্টন। 'সম্ভবত সবগুলো খেলা সে একাই দেখাবে।'

হেসে উঠলাম তিনজনে একযোগে। হি হি হা হা চলতেই লাগল লাল পর্দা স্টেজের ওপরের দিকে উঠে না যাওয়া পর্যন্ত। কাউবয়ের পোশাক পরা এক লোক চলে এলো স্টেজে। সে কৌতুক শোনাতে লাগল। প্রথমে হাসি পেলেও পরে আর হাসি পেল না।

'ভেগে পড়ো, কাউবয়!' সামনের সারি থেকে হাঁক ছাড়ল এক দর্শক। 'দুধ দুইতে যাও!'

লোকটার জোকস শুনে দর্শক যতটা না হেসেছে তার চেয়ে দ্বিগুণ হাসিতে ফেটে পড়ল এ কথায়।

'সাবরিনাকে নিয়ে এসো!' পেছনের সারি থেকে চেঁচাল আরেক দর্শক।

কাউবয়-কমেডিয়ান ওই দুই দর্শককে নিয়ে মশকরা করে কিছু কথা বলল। ওরা দু'জন ছাড়া বাকি দর্শক ফেটে পড়ল হাসিতে। দুই দর্শককে নাস্তানাবুদ করা গেছে, চেহারায় এমন সন্তুষ্টির ভাব ফুটিয়ে স্টেজ ছাড়লো কাউবয়। সবাই হাততালি দিল তাকে অভিনন্দন জানাতে নয়, সে চলে গেছে বলে।

আমি জোয়ি'র আনা হাজার বছরের পুরানো পপকর্ন চিবুচ্ছি বিরস বদনে, এমন সময় আরেক লোকের আবির্ভাব ঘটলো মঞ্চে।

'ওহ্, না', গুঙিয়ে উঠলাম আমি। 'এ দেখছি সেই গেটম্যান। অ্যার্কিডিয়ান বাজাতে এসেছে!'

যে লোকটা গেটে টিকেট ছিঁড়ে আমাদের ভেতরে ঢুকতে দিয়েছে সে এবার ট্যাপ-ডান্সারের ভূমিকা নিল। অ্যাকর্ডিয়ানের তালে মেঝেতে পা ঠুকতে লাগল লোকটা। মুখে কৃত্রিম হাসি। গেটে দাঁড়িয়ে লোকটা যেমন ঘামছিল, এখন তারচেয়ে বেশি ঘামছে। তার নাচ দেখে হে হে করে হাসতে লাগল দর্শক। তাকে উদ্দেশ্য করে সরস মন্তব্য করছে। ঘেমে গোসল হয়ে গেছে লম্বু।

লোকটার জন্য আমার মায়াই লাগল। তবে প্রেক্ষাগৃহের সবাই ঠাট্টা করছে ওকে নিয়ে। লোকটা যেন শাওয়ার থেকে বেরিয়েছে। নাচের তালে ঘামের ফোঁটা ছিটকে পড়ছে দর্শকের গায়ে। যেন বাগানের পিচকারি দিয়ে পানি ছিটানো হচ্ছে।

'কারও কাছে ছাতা আছে, ভাই ?' গলা ফাটাল জোয়ি।

'আমরা সাবরিনাকে চাই!' দুই দর্শক হাঁক ছাড়ল। তারপর সুর করে বলতে লাগল, 'সাবরিনাকে চাই! সাবরিনাকে চাই!' ঘর্মাক্ত ট্যাপ-ডান্সার স্টেজ ত্যাগ না করা পর্যন্ত থামলো না।

আমি দর্শকদের ওপর একবার নজর বুলালাম। অল্প ক'জন দর্শকের সবাই 'সাবরিনা! সাবরিনা!' বলে চেঁচাতে শুরু করেছে। কে এই সাবরিনা ? ভাবলাম আমি। নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কেউ।

স্টেজে কারও দেখা নেই। শূন্য। অধৈর্য দর্শক এবারে মেঝেতে পা ঠুকতে লাগল। তাদের চেঁচামেচিতে কানের পর্দা ফেটে যাবার জোগাড়, এমন সময় ঘামে ভেজা শরীর নিয়ে সেই অ্যাকর্ডিয়ান প্লেয়ার হাজির হলো মঞ্চে। ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম ঝরছে এখনও হাসি ফুটল লোকটার মুখে। 'এবার আসছে সে, যার জন্য এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে আছেন। 'আপনাদেরকে আনন্দ দিতে আসছে মিষ্টি সাবরিনা এবং জঘন্য রোবট রোন্ডা।'

নিভু নিভু হয়ে এলো মঞ্চের আলো। একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম দর্শকদের মধ্যে। সবাই নড়েচড়ে বসেছে। কারও মুখে কথা নেই। পর্দা নেমে এলো স্টেজে। ব্যাক স্টেজ থেকে শোনা গেল পায়ের শব্দ। তারপর ওপরের দিকে উঠে গেল পর্দা, দেখলাম স্টেজে এক তরুণী বসে আছে। কোলে ভেন্ট্রিলোকুইস্ট-এর ডামি।

তরুণী, মানে সাবরিনাকে দেখে দম বন্ধ হয়ে গেল আমার। তার চুলের রঙ সোনালি-পিঙ্গল। ফর্সা ত্বকে একটা দাগও নেই, নরম বাদামী একজোড়া চোখ। আমি জীবনেও এতো সুন্দর মেয়ে দেখিনি। বয়স বড় জোর আঠারো হবে, একটু বেশিও হতে পারে। আমি মেয়েটির ওপর থেকে চোখ সরাতে পারলাম না।

সাবরিনার কোলে শুয়ে আছে রোবট রোন্ডা। সে একখানা জিনিস বটে। এমন ভয়ঙ্কর চেহারা! লম্বায় বড় জোর দু'ফুট হবে, মোটা বেঢপ শরীর। শরীরের তুলনায় চৌকোনা মাথাটা প্রকান্ড। স্টেজ থেকে বেশ খানিকটা পেছনে বসা থাকলেও পরিষ্কার দেখতে পেলাম রোন্ডার টাক মাথায় ক'গাছি চুল আঠার মতো লেপ্টে আছে। তার সারা মুখ এবং হাতে বড় বড় কুৎসিত আঁচিল।

'হ্যালো, বন্ধুরা', ভারী মিষ্টি গলায় বলে উঠল সাবরিনা।

'রোন্ডা এবং আমার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই।'

'আহ্, চুপ করো!' খরখরে গলায় দাবড়ানি দিল রোন্ডা।

'দর্শক তোমাকে দেখতে আসেনি। এসেছে আমাকে দেখতে।'

'রোন্ডা, ডিয়ার', নরম গলা সাবরিনার। 'অমনভাবে বলে না। উপস্থিত ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহোদয়াগণের সঙ্গে যখন কথা বলব দয়া করে চুপ করে থেকো।'

'আমার একটা কৌতুক মনে পড়েছে!' সাবরিনাকে অগ্রাহ্য করল রোন্ডা। 'খুব ভাল জোকস। কাজেই তুমি চুপ করে থাকো।'

রোন্ডা জোকস বলছে, আমি সামনের দিকে ঝুঁকে এলাম। তবে ওর কথা কানে যাচ্ছে না আমার, সমস্ত মনোযোগ সাবরিনার দিকে। সাবরিনার সুন্দর মুখখানা বন্ধ, তবে লক্ষ করছি রোন্ডার সঙ্গে কথা বলার সময় ওর ঠোঁট নড়ছে। তার ডান হাত রোন্ডার পিঠে। আমি বুঝতে পারছি ওই হাত দিয়ে সে রোন্ডাকে কন্ট্রোল করছে। কোনও যন্ত্রপাতির বোতাম হয়তো টিপছে, সেই সঙ্গে রোন্ডার মুখ খুলছে এবং বন্ধ হচ্ছে। মাথাটা ঝাঁকি খাওয়ার ভঙ্গিতে ঘুরছে, নাড়াচ্ছে মোটা হাত-পা।

দর্শক রোন্ডা ও সাবরিনার নাটক যে খুব উপভোগ করছে তা তাদের হাততালি দেখে বোঝা গেল। রোন্ডাও তার মোটা মোটা হাত দিয়ে তালি বাজাচ্ছে। তারপর সাবরিনার লম্বা গ্রীবা জড়িয়ে ধরল।

'ধন্যবাদ, রোন্ডা', মধুমাখা গলায় বলল সাবরিনা। 'মোর গল্প বলা শেষ হলে এবারে আমি দর্শকদের একটি গান শোনাতে চাই।'

কাঠের কুৎসিত ডামিটা ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়ল। সাবরিনা গান ধরেছে, কটমট করে তাকিয়ে থাকল সে মেয়েটির দিকে। কোনও যন্ত্রসঙ্গীত বাজছে না। স্রেফ সাবরিনার স্ফটিক-স্বচ্ছ অপূর্ব কণ্ঠের ঝংকারে ভরে গেল প্রেক্ষাগৃহ। চমৎকার একটি গান গাইল সে। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলাম তার গান।

শো শেষ হয়েছে সেই কখন, এখনও আমার কানে বাজছে সাবরিনার মধু মাখা কণ্ঠ। চোখের সামনে ভাসছে ওর গান গাইবার দৃশ্য। বিছানায় শুয়ে আছি আমি, দৃষ্টি ছাদে। বাবা ডাক দিলেন নিচ থেকে, জানতে চাইছেন তাঁর সঙ্গে ছবি দেখব কি না। ছবি ভাড়া করে এনেছেন বাবা। প্রায়ই আনেন।

'আমার খুব ক্লান্ত লাগছে', বললাম আমি। 'দেখব না।' আমি এখন শুধু সাবরিনার কথা ভাবব।

'ও তো সিনেমা না দেখে থাকার ছেলে নয়', শুনলাম মা বলছেন বাবাকে। 'দেখতে যখন চাইছে না, থাক। শরীর বোধহয় ভাল ঠেকছে না।'

'কী জানি।' বললেন বাবা। 'বলল তো ক্লান্ত।'

আমি কল্পনায় সাবরিনাকে দেখতে পাচ্ছি। সে রোন্ডাকে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে সিধে হয়েছে। দর্শকদেরকে উদ্দেশ্য করে বো করল। ঝপ করে নেমে এলো পর্দা। একটু পরে আবার খুলল। নতুন করে শুরু হয়ে গেল সাবরিনার শো।

'তুই সত্যি ছবি দেখবি না?' বাবার ডাকে কল্পনার সুতোটা ছিঁড়ে গেল। এমন রাগ লাগল!

'না!' ঘর ফাটিয়ে চেঁচালাম আমি।

'আহ্, দেখতে যখন চাইছে না ওকে খামোকা ডাকছ কেন?' মা'র গলা।

বাবা জবাবে কিছু একটা বললেন। কিন্তু শুনতে পেলাম না। আমি বাব-মা'র গলা আর শুনতে চাই না। আমার মন এখন ভেসে চলেছে অন্য কোথাও। সাবরিনার কাছে। সাবরিনা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছি না আমি।

পরদিন উইনস্টন ফোন করল আমাকে। সান্ডারসন পার্কে যেতে বলল। বেসবল খেলা হবে। প্রতি রোববার খেলি আমরা। বললাম অসুস্থ। যেতে পারব না।

'ঠিক আছে। সুস্থ হয়ে ওঠো', বলল উইনস্টন। 'পরে খেলা যাবে।'

আমি বেসবল খেলতে যাব না, কারণ শহরে যাব। বেলমন্টে। রোববারের ম্যাটিনি শো দেখতে। সাবরিনাকে দেখব।

বুঝতে পারছি সাবরিনার প্রেমে পড়ে যাচ্ছি আমি। এখন প্রতি উইকএন্ডে শনি ও রোববার ম্যাটিনি শো আমার দেখা চাই-ই। এমনকী শুক্রবার রাতের শোতেও যাই। কখনও যাই বন্ধুদের সঙ্গে, তবে বেশিরভাগ সময় একা। সাবরিনার কোনও ভাগীদার আমি চাই না।

সাবরিনার সমস্ত আচার-আচরণ এখন মুখস্থ আমার। ওর গানগুলো ঠোঁটস্থ। রোন্ডার জোকস, সে কী বলবে, কখন হাত-পা নাড়বে সব বলে দিতে পারি এখন।

সাবরিনার শো'র ব্যাপারে আমাকে আপনারা এখন এক্সপার্ট বলতে পারেন। ওর ছোটখাটো কোনও বিষয়ও আমার চোখ এড়ায় না। সাবরিনা সবসময় সুন্দর সুন্দর পুরনো ফ্যাশনের পোশাক পরে আসে। এগুলোর গলা উঁচু, লেসের কাজ করা। সে সবসময় পা মুড়ে বসে। তার প্রতিটি আচরণে মার্জিত নারীর ভব্যতা ফুটে ওঠে। আর সবসময় মিষ্টি করে হাসে সাবরিনা। সব সময় তার বাঁ হাত থাকে কোলের ওপর, ডান হাত ডামির পিঠে।

রোন্ডা ঠিক তার বিপরীত। কর্কশ, বদমেজাজী। তার চেহারায় সবসময় বিরক্তির ভাব। সাবরিনার দিকে তাকিয়ে থাকে কটমট করে এবং হাতের নখ আঁচিল বা জড়ুল নিয়ে খেলা করে।

ওরা দু'জনে বিপরীত মেরুর বাসিন্দা বলেই খেলাটা জমে ওঠে। একজন অপূর্ব সুন্দরী, অপরজন বেজায় কুৎসিত। আমি শো দেখার সময় মাঝে মাঝে ভাবি সাবরিনা এরচেয়ে সুন্দর একটা ডামি জোগাড় করতে পারলে খুব ভাল হত। ওরকম ভয়ঙ্কর, সৃষ্টি ছাড়া ডামির সঙ্গে সাবরিনাকে মেনে নিতে খুব কষ্ট হয় আমার। তা ছাড়া বেলমন্ট থিয়েটারের মতো বিশ্রী একটা জায়গায় কাজ করার যোগ্যতা ওর আছে।

বন্ধুরা বলে আমি নাকি সাবরিনার জন্য পাগল হয়ে গেছি। ওদের আগের মতো সঙ্গ দিই না বলে অভিযোগ করে।

'তুমি একটা ভেনট্রিলোকুইস্টের প্রেমে পড়লে কীভাবে ?' জোয়ি সবসময় ঠাট্টা করে আমাকে। 'মেয়েটা সুন্দর হতে পারে, কিন্তু কাজ তো করে একটা ভূতুড়ে জায়গায়।'

'তা ছাড়া মেয়েটা তোমার চেয়ে বয়সেও বড়', বলে উইনস্টন। 'আর খুব বেশি সুন্দরী। সে তোমার মতো খোকাবাবুর সঙ্গে প্রেম করতে যাবে কোন্ দুঃখে ?'

এসব প্রশ্নের জবাব দেই না আমি। জানি আমার বয়স খুব কম এবং সাবরিনা কোনওদিনই আমার গার্লফ্রেন্ড হতে চাইবে না। কিন্তু তবু সাবরিনার কথা না ভেবে

থাকতে পারি না। আমার বার বার মনে হয় সাবরিনার মতো মিষ্টি মনের মেয়ে কাউকে আঘাত দিতে পারে না। আমাকেও না। আমি যে প্রতিদিন শো দেখতে যাই, সাবরিনা সেটা লক্ষ করেছে।

আমার সঙ্গে তার মাঝে মাঝে চোখাচোখি হয়। তবে সাবরিনাকে খুব কাছে থেকে দেখতে চাই আমি। ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই। ওর মুখোমুখি হতে চাই। এবং জানি কাজটা আমি শিগগিরি করব।

আজ শুক্রবার। আজ সাবরিনার সঙ্গে দেখা করব আমি। সারাদিনই ক্লাসে সাবরিনার কথা মনে পড়েছে আমার। ছুটির ঘণ্টা বাজতেই রওনা দিলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে। বাবা-মা'কে কীভাবে ভজিয়ে শো দেখতে যাব সে পরিকল্পনাই সাজাচ্ছি মনে মনে। বলব উইনস্টনের বাসায় আজ আমি আর জোয়ি থাকব। বাবা-মা উইনস্টনের বাসায় রাত্রিযাপনে নিষেধ করেন না। ও আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়। ওকে নিয়ে মাঝে মাঝে ক্লাস-নোট করি। তখন রাতটা থেকে যাই ওর বাড়িতে।

উইনস্টনকে অবশ্য আগেই বলে রেখেছি রাতে বাবা-মা ফোন করলে যেন পরিস্থিতি সামাল দেয়। উইনস্টনের সঙ্গে পরীক্ষার নোট করব শুনে বাবা-মা ওদের বাসায় যেতে মানা করলেন না। আমিও দেরি করলাম না। ছুটলাম শহরে। সাবরিনাকে দেখতে।

শো দেখার সময় নার্ভাস হয়ে থাকলাম আমি। সিঁটিয়ে আছি ভয়ে, কারণ বাবা-মা যদি বুঝে যান তাঁদেরকে মিথ্যা কথা বলেছি আমি! ভয় লাগছে উইনস্টন যদি উল্টোপাল্টা কিছু বলে ধরা খাইয়ে দেয় আমাকে। তবে শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে ঠিক এসব কারণে নয়। শো শেষে যে পরিকল্পনা করেছি সেভাবে কাজ হবে কি না ভেবে শঙ্কা কাজ করছে আমার মধ্যে। আমি ব্যাক স্টেজে গিয়ে সাবরিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। হয়তো তার অটোগ্রাফ নিতে পারব, কথা বলার সুযোগও হয়ে যেতে পারে।

শেষ হয়ে গেল শো। জ্বলে উঠল প্রেক্ষাগ্রহের আলো। সকল দাঁতঅলা ঘোষক রুটিন মাফিক বলল, 'আসার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ।' লোকজন বেরিয়ে যেতে লাগল প্রেক্ষাগৃহ থেকে। আমি গেলাম না। দাঁড়িয়ে থাকলাম ছায়ায় নিজেকে আড়াল করে। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম স্টেজে। বিশাল লাল পর্দার ভাঁজে লুকিয়ে থাকলাম।

একটু পর পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। ব্যাক স্টেজ থেকে একটা করিডরে নেমে এলাম। নগ্ন আলো জ্বলছে ভূতুড়ে করিডরে। মোড় ঘুরতেই ড্রেসিং রুমের দরজা চোখে পড়ল। সারি সারি দরজা। আমি একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। এ দরজার গায়ে একটি কাগজ সাঁটা। কাগজে বড় বড় অক্ষরে কালো কালিতে লেখা **সাবরিনা**।

'এখানে কী করছ তুমি?' পেছন থেকে ঘেউ করে উঠল একজন।

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালাম। সেই দরদরে ঘামে ভেজা গেটম্যান। পরনে অ্যান্ডার সার্ট এবং টুক্সেডো প্যান্ট। দুটোই ঘামে ভিজে সেঁটে রয়েছে গায়ে।

'সাবরিনার অটোগ্রাফ নিতে এসেছি', বললাম আমি, ভয়ে আছি কখন কানে মোচড় খাই।

কিন্তু লোকটা কান ধরে মোচড় দিল না, হলুদ দাঁত বের করে হাসলো। দরজায় একটা ঘুসি দিল।

'অ্যাই, তোমার একজন ভক্ত এসেছে!'

'কে ?' ভেতর থেকে সাবরিনার মিষ্টি কণ্ঠ ভেসে এল।

'একটা বাচ্চা', দীর্ঘ বিরতি।

'ছোঁড়াকে ভেতরে নিয়ে এসো!' খ্যাঁক করে উঠল রোন্ডা।

'হ্যাঁ, ভেতরে এসো', বলল সাবরিনা নরম গলায়।

'যাও, খোকা', বলল ঘর্মাক্ত লোকটা। ধাক্কা মেরে খুলল দরজা। বুড়ো আঙুল দিয়ে আমাকে ইঙ্গিত করল ভেতরে যেতে।

'তুমি ওর প্রেমে পড়ে গেছ, না ?' চোখ টিপল সে। 'অবশ্য এ জন্য তোমাকে দোষ দিতে পারি না। মেয়েটা সত্যি সুন্দরী।'

ড্রেসিংরুমটা বেশ বড়সড়, অন্ধকার। বেলমন্ট থিয়েটার-এর নাম লেখা সবুজ নিয়ন জ্বলছে জানালার বাইরে। সে আলোর খানিকটা প্রতিফলনে ঘরের অন্ধকার সামান্যই দূর হয়েছে। ঘরের কিনারে, জানালার নীচে ছেঁড়া একটা সোফায় বসেছে সাবরিনা। হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তার ডান হাত যথারীতি রোন্ডার পিঠের নীচে। রোন্ডা তার পাশে বসা, বিরক্তিতে কোঁচকানো মুখ, হাতের জড়ুল নিয়ে খেলায় ব্যস্ত।

'হাই!' বললাম আমি। আমার কণ্ঠ ভাঙা এবং অদ্ভুত শোনাল। আমি এক পা দিয়ে আরেক পা কচলাতে কচলাতে যোগ করলাম, 'আ-আমার একটু নার্ভাস লাগছে।' কেন এ কথা মুখ ফস্কে বেরিয়ে এলো নিজেও জানি না।

'তোমার নাম কী ?' এমন নরম গলায় প্রশ্ন করল সাবরিনা!

আমি আমার নাম বললাম। তারপর বোকার মতো নিজের বয়সটাও বলে ফেললাম।

হেসে উঠল রোন্ডা। 'তা হলে তোমার চোখে সাবরিনা খুব সুন্দরী, না ? ওকে পছন্দ করো ?'

'হ্যাঁ', স্বীকার করলাম আমি। তারপর লজ্জিত চেহারা নিয়ে ফিরলাম সাবরিনার দিকে। 'আমি আপনার সবগুলো শো দেখেছি। আমার কথা শুনে হয়তো আপনার মনে হতে পারে আমি একটা বোকা। তবে আপনাকে আমার দারুণ লাগে। আপনি দেখতে এতো সুন্দর-'

'হুঁ', ঘোঁতঘোঁত করল রোন্ডা। 'তুমি সত্যি একটা বোকা ছেলে।'

আমার মুখ লাল হয়ে গেল।

সাবরিনা হাসলো। 'বেশ', বলল সে। 'আমার মনে হয় তুমি ছেলে মন্দ নও।' চোখ পিটপিট করল সে। 'তুমি আমার শো দেখো এবং আমাকে দেখতে এখানে পর্যন্ত চলে এসেছ, আমি খুশি হয়েছি।'

আমার চেহারায় আরও রঙ ধরল।

রোভা সাবরিনার পাশ থেকে ফোড়ন কাটল। 'ছেলেটাকে যদি তোমার এতই পছন্দ হয়ে থাকে তা হলে ওকে একটা চুমু উপহার দিচ্ছ না কেন ?'

হাতের ঝাপটায় বাতি জ্বেলে দিল সাবরিনা। আমাকে অবাক করে দিয়ে সোফা ছাড়ল, হেঁটে আসতে লাগল আমার দিকে। আমি আতঙ্ক বোধ করলাম। আমাকে কি ও সত্যি চুমু খাবে ?

'প্রেমকাতর ছোঁড়াকে দ্যাখো!' খনখন করে উঠল রোভা।

সাবরিনা হেঁটে আসছে আমার দিকে, আমি সরে যেতে লাগলাম, কুৎসিত ডামিটার দিকে এগোচ্ছি, ওটা এখনও বসে আছে জীর্ণ সোফায়।

'কী হলো, লাভার বয় ?' ঠাট্টা করল রোভা। চৌকোনা মাথাটা একপাশে কাত করল সে, খুদে পা জোড়া দিয়ে লাথি কষাল সোফার পাশে। সাবরিনার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম আমি, তাকালোম রোভার দিকে। প্রথমে ব্যাপারটা ধরতে পারলাম না। কিন্তু তারপর ব্যাপারটা মাথায় ঢুকলো আমার। যা দেখছি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। রোভা পা নাড়ে কীভাবে ? সে কথাই বা বলে কীভাবে ? তার ঠোঁট নড়ছে কীভাবে ? সাবরিনা তার পাশে নেই, তাকে পরিচালনাও করছে না, তা হলে রোভা এসব করছে কী করে ?

সাবরিনা ঘুরল আমার দিকে। মুখে হাসি ধরে এগিয়ে আসতে লাগল।

'স্বপ্ন কন্যাকে কেমন লাগছে তোমার ?' ঘোঁতঘোঁত করল রোভা।

আমি রোভার হাতের দিকে তাকিয়ে আছি। যেগুলোকে এতদিন আঁচিল বা জড়ুল ভেবে এসেছি ওগুলো আদৌ তা নয়। কালো কালো জিনিসগুলো আসলে বোতাম!

একটা বোতাম টিপল রোভা... থেমে গেল সাবরিনা।

'বুঝতে পারলে তো রোবট কীভাবে কাজ করে ?' খ্যাঁকখ্যাঁক করে উঠল রোভা। মাথায় ঢুকলো কিছু ?' আঁচিল সদৃশ আরেকটা বোতাম টিপল সে।

'হ্যালো, বন্ধুরা', বলল সাবরিনা। 'আমার এবং রোভার পক্ষ থেকে আমাদের শোতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই।'

আমি হেঁটে গেলাম সাবরিনার কাছে। ওর নিখুঁত, সুন্দর মুখ স্পর্শ করলাম হাত দিয়ে। সিনথেটিক মনে হলো... বরফের মতো ঠাণ্ডা।

শুনলাম হা হা করে হেসে উঠল কেউ।

রোভা আরেকটি কন্ট্রোল বাটনে চাপ দিল। সাবরিনার শরীরের ভেতরে টেপ ঘোরার শব্দ শুনতে পেলাম।

'না!' ককিয়ে উঠলাম আমি।

'হ্যালো, বন্ধুরা', বলল সাবরিনা। 'আমার এবং রোভার পক্ষ থেকে আমাদের শোতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই।'

আমি কাঁদতে কাঁদতে ছুটলাম দরজার দিকে। করিডর ধরে ছুটলাম, কানে বিস্ফোরণের মতো বাজছে হাসির শব্দ। কাউবয়-কমেডিয়ান, নকল দাঁতঅলা টিকেট বিক্রেতা, ঘামে জবজবে হয়ে থাকা গেটম্যান, ওরা দেখছে আমাকে ছুটে পালাতে... হাসছে ওরা হাহা করে, যেন এমন হাসি জীবনে হাসেনি।

ম্যানড্রাগোরা

রোজমেরী টিম্পারলি

দোকানের ধুলো পড়া কাঁচের দরজা দিয়ে তাকে দেখতে পেল মাইকেল। ভেতরে নানা রঙ আর চেহারার ফ্লাওয়ার ভাস, মূর্তি, নস্যির কৌটা সহ টুকিটাকি আরও হরেক জিনিস। সে বসে রয়েছে একটা চেয়ারে। মাথাটা সামান্য ঝুঁকে আছে সামনের দিকে, কোলের ওপর ভাঁজ করা হাত জোড়া, তার গোটা অবয়ব থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সৌন্দর্য আর আভিজাত্য। এতো সুন্দর মেয়ে জীবনেও দেখেনি মাইকেল। খুব ইচ্ছে করছে ভেতরে ঢুকে ভাল করে দেখে মেয়েটিকে। তবে লজ্জাও লাগছে। মাইকেল অবশ্য এমনিতেই খুব লাজুক স্বভাবের, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে ঘেমে আড়ষ্ট হয়ে যায়। তোতলাতে থাকে। এ জন্যেই বেচারা জীবনে প্রেম করতে পারল না।

তবে দোকানের মেয়েটি সাংঘাতিক টানছে মাইকেলকে। যেভাবে চুম্বক আর্কষণ করে লোহাকে। সম্মোহিতের মতো এগিয়ে গেল মাইকেল। খুলল দরজা। ঢুকলো ভেতরে। সাথে সাথে দোকানের মধ্যে মিষ্টি শব্দে বেজে উঠল ঘন্টা। মেয়েটির মধ্যে কোন ভাবান্তর হলো না। সে যেমন ছিল বসে রইল একই ভঙ্গিতে। এ দোকানের সেলস গার্ল নয়, ভাবল মাইকেল। বোধ হয় অপেক্ষা করছে কারও জন্যে।

রোগা-পাতলা এক লোককে দেখতে পেল মাইকেল, কাউন্টারের পেছনের একটা দরজা খুলে ঢুকলেন ভেতরে। ভদ্রলোক বয়সে প্রৌঢ়, মাথায় কাঁচাপাকা চুল। মুখখানা শুকনো, ফেকাসে। যেন রক্তশূন্যতায় ভুগছেন। মাইকেলের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি, 'বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি?'

ভদ্রলোক ঘরে ঢোকার পরেও মেয়েটি স্থির বসে আছে, আড়চোখে লক্ষ করল মাইকেল।

'না, কিছু করতে হবে না', জবাব দিল ও। 'আমি এমনি এসেছি। দোকানটা একটু একটু ঘুরে দেখব।'

'অবশ্যই। দেখুন।'

মাইকেল তাকগুলো দেখার ভান করে আস্তে আস্তে এগোতে লাগল মেয়েটির দিকে। মেয়েটির ঝলমলে চুল কোমর ছুঁয়েছে। নিয়ন বাতির আলোতে ঝলকাচ্ছে। তার গায়ের চামড়া যেন মোম দিয়ে তৈরি। পরনে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা কালো একটা ড্রেস। ধবধবে শরীরের সঙ্গে দারুণ মানিয়ে গেছে। ওহ, কী সুন্দর!

মেয়েটির খুব কাছে চলে এসেছে মাইকেল। একটা স্টাফ করা পাখির মূর্তি দেখার জন্য ঝুঁকলো, হাতটা ঘষা খেল মেয়েটির বাহুর সঙ্গে। সরি, বলে ঘুরল মাইকেল। এবং এই প্রথম সরাসরি তাকালো মেয়েটির মুখের দিকে। প্রচন্ড ধাক্কা খেল একটা। সুন্দরী এই নারী কোন জ্যান্ত মানবী নয়, লাইফ-সাইজ একটা মূর্তি!

'ঈশ্বর! হাঁপিয়ে ওঠার মতো শব্দ বেরুল মাইকেলের গলা দিয়ে। 'আমি ভেবেছিলাম এ মানুষ।'

হাসলেন দোকানের মালিক। 'দোকানে ঢুকে এ ভুলটা অনেকেই করে। অবশ্য তাদের দোষ নেই। খুব কাছ থেকে না দেখলে বোঝার উপায় নেই এ মানুষ না মূর্তি।'

মাইকেল এখনও হতবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে নারী-মূর্তিটির দিকে। ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'একে কি বিক্রি করবেন?'

'না, মাথা নাড়লেন প্রৌঢ়।' কিন্তু মূর্তিটা কিনতে চাইছেন কেন?

মন্ত্রমুগ্ধ স্বরে জবাব দিল মাইকেল, 'কারণ একে আমার চাই। এ আমার স্বপ্নের নারী। সুন্দরী-ভদ্র শান্ত। ওকে দেখেই প্রেমে পড়ে গেছি আমি।'

'বেশ', বললেন দোকানের মালিক। 'তাহলে আপনি ওকে নিয়ে যেতে পারেন। আপনার চোখের দৃষ্টি দেখেই বুঝতে পেরেছি আপনার কাছে ভালই থাকবে ম্যানড্রাগোরা।'

'ম্যানড্রাগোরা ?' প্রতিধ্বনি তুলল মাইকেল।

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকালেন অপরজন। 'এটাই ওর নাম।'

মাইকেল পাঁজাকোলা করে বুকের মধ্যে তুলে নিল ম্যানড্রাগোরাকে। মুগ্ধ চোখে দেখছে অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানাকে। ওকে নিয়ে বেরিয়ে এলো দোকান থেকে। একটা ট্যাক্সি ক্যাব ডেকে উঠে বসল তাতে। পেছন ফিরলে দেখতে পেত প্রৌঢ় দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাকিয়ে আছেন ওদের দিকেই। চিকচিক করছে তাঁর চোখের কোণ।

মাইকেল শহরতলীতে, একতলা একটা বাড়িতে থাকে। একা। বাবা-মা-ভাই-বোন কেউ নেই। প্রচন্ড নিঃসঙ্গ জীবনে এই প্রথম কারও আর্বিভাব ঘটলো। ম্যানড্রাগোরাকে সে পরম যত্নে একটা আর্মচেয়ারে বসাল, ভেলভেটের একটা কুশনে এলিয়ে দিল মাথা। হাতজোড়া আড়াআড়ি ভাবে রাখল ওপরে, অবিন্যস্ত স্কার্টের ভাঁজগুলো সমান করে দিল আঙুলের চাপে।

'আমার বাড়িতে সুস্বাগতম, প্রিয়তমা', মৃদু গলায় বলল মাইকেল।

পরদিন বোরবার। সারাদিন কোথাও বেরুল না মাইকেল। উপভোগ করল ম্যানড্রাগোরার সঙ্গ। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলল ও। মনে হলো ম্যানড্রাগোরা মনোযোগ দিয়ে শুনছে ওর কথা। সন্ধ্যার পরে ক্যাসেট প্লেয়ারে চোপিন নকট্রনের বাজনা ছেড়ে দিল। ম্যানড্রাগোরা যেন চুপচাপ শুনতে লাগল মিষ্টি যন্ত্রসঙ্গীত। মেয়েটি মাইকেলের যথার্থ সঙ্গিনী। এতদিন যে রকম সঙ্গিনীর স্বপ্ন দেখে এসেছে মাইকেল, ঠিক তেমনটি। অফিসের মেয়েগুলোকে পছন্দ নয় মাইকেলের। ওরা সারাক্ষণ বকবক করে আর খাই খাই করতে থাকে। সুন্দরী কলিগদের কারও প্রতি কোন রকম দুর্বলতা নেই মাইকেলের। নিজে সারাক্ষণ চুপচাপ থাকতে পছন্দ করে। এ জন্যে আড়ালে ওকে 'রাম গড়ুরের ছানা' ডাকা হয়, জানে মাইকেল। মনে কষ্ট পেলেও মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলে না সে। মাইকেল শুধু স্বপ্ন দেখে আসছিল, এমন কেউ একজন তার জীবনে

আসবে সব দিক থেকেই যে হবে মনের মত। অবশেষে স্বপ্ন পূরণ হয়েছে মাইকেলের। ম্যানড্রাগোরাকে পেয়েছে সে।

সোমবার সকালে অফিসে যাবার সময় সে বলল, 'গুডবাই, ম্যানড্রাগোরা। সন্ধ্যে বেলায় দেখা হবে।' মূর্তির গালে চুমু খেল ও। ভারী মসৃণ আর নরম চামড়া। অবিকল মানুষের মত।

সেদিন অফিসে বসে সারাক্ষণ ম্যানড্রাগোরার কথাই ভাবলো মাইকেল। কি দিয়ে বানানো হয়েছে ম্যানড্রাগোরাকে ? মোম, ধাতব, প্লাস্টিক কিংবা সিল্ক নয়। তবে কি ও কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি নয়? ও কি- সত্যিই কি তা সম্ভব?

সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে ম্যানড্রাগোরার গা থেকে আস্তে আস্তে কাপড়টা খুলে ফেলল মাইকেল। ওর শরীরে কোন খুঁত নেই, শুধু দুটো দাগ আছে, বাম কাঁধে ছোট্ট একটা আঁচিল আর অ্যাপেনডিক্স অপারেশনের অস্পষ্ট শুকানো একটা ক্ষতচিহ্ন।

মাইকেলে'র মনে পড়ল প্রৌঢ়ের দোকানে স্টাফ করা নানা রকম মূর্তি দেখেছে সে। বইতে পড়েছে মৃত পশু বা পাখির চামড়ার মধ্যে খড়-কুটো ভরে স্টাফ করে রাখা হয়। অবিকল জীবন্ত লাগে। একে বলে ট্যাক্সিডামি। আর যারা এ কাজ করেন তাঁরা হলেন ট্যাক্সিডামিস্ট। ভদ্রলোক তাহলে এদেরই একজন!

কিন্তু এমন সুন্দর একটি মেয়েকে স্টাফ করলেন কেন তিনি? একে পেলেনই বা কোথায়? ম্যানড্রাগোরার ব্যাকগ্রাউন্ড কি? এ সব প্রশ্নের জবাব না পেলে অস্থির হয়ে থাকবে মন। পরদিন, লাঞ্চ ব্রেকে মাইকেল গেল ভদ্রলোকের দোকানে। তিনি মাইকেলকে দেখেই চিনে ফেললেন। সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন,'কেমন আছে ম্যানড্রাগোরা ?'

'আমি জানতে এসেছি ম্যানড্রাগোরা কে?' প্রশ্ন করল মাইকেল।

'স্বর্গের সবচে' সুন্দরী নারী', হাসি মুখে জবাব দিলেন প্রৌঢ়। 'যার জন্যে দেবতা-দানব মানুষ সবাই পাগল ছিল।'

'আমি আপনার ম্যানড্রাগোরার কথা বলছি। সে এমন ভরা বয়সে মারা গেল কিভাবে?' কাটা কাটা গলা মাইকেলের।

হাসিটা মুছে গেল প্রৌঢ়ের মুখ থেকে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, 'মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীন রক্তক্ষণে মারা গেছে 'ম্যানড্রাগোরা', চোখ তুলে তাকালেন মাইকেলের দিকে। 'আপনি তাহলে বুঝে গেছেন ও কোন পুতুল নয়। ব্যাকরুমে চলুন। ম্যানড্রাগোরার গল্প শোনাব আপনাকে।'

পেছনের ঘরে মাইকেলকে নিয়ে ঢুকলেন তিনি। সুসজ্জিত ঘর। জানালেন এ দোকান আসলে তাঁর বাড়ির একটা অংশ। তারপর শুরু করলেন, ম্যানড্রাগোরা আমার স্ত্রী। একে অন্যকে খুব ভালবাসতাম আমরা। একদিন শপিং করে ফেরার পথে একটা ট্যাক্সি পেছনে থেকে ধাক্কা দেয় ম্যানড্রাগোরাকে। ম্যানড্রাগোরা ছিটকে পড়ে যায় ফুটপাতে। মাথাটা প্রচন্ড জোরে বাড়ি খায় একটা লাইট পোস্টে। অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ম্যানড্রাগোরাকে। ব্রেন হেমারেজে কোমা'র মধ্যে চলে

গিয়েছিল। তার লাশ আমি চুরি করি। কফিনে আরেকটা ডামি ভরে রেখে দিই। তারপর কাজ শুরু করে দিই।'

'কি কাজ?' জানতে চাইল মাইকেল।

'আমি ট্যাক্সিডামি নিয়ে পড়াশোনা করেছি। আমি একজন পেশাদার ট্যাক্সিডামিস্ট। দেশের বিভিন্ন জাদুঘরে আমার কাজের প্রচুর নমুনা রক্ষিত আছে। বেশিরভাগই পশু-পাখির স্টাফ করা মূর্তি। অনেকের ব্যক্তিগত কাজও আমি করে দিয়েছি। কারও পোষা বেড়াল বা কুকুর মারা গেলে আমার কাছে আসতো। আমি তাদের পোষা প্রাণীগুলোকে স্টাফ করে দিতাম। ট্যাক্সিডামি কারও কারও কাছে গা ঘিনঘিনে একটা ব্যাপার, কিন্তু আমার কাছে নয়। আমি আমার জীবনের সমস্ত দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছি ম্যানড্রাগোরাকে স্টাফ করার সময়। ও আমার মাস্টারপীস। ম্যানড্রাগোরার পরে ট্যাক্সিডামির কাজটা আমি ছেড়ে দিই। তারপর এ দোকানটা খুলে বসি। এখানে যে সব স্টাফ করা মূর্তি আপনি দেখেছেন, সব আগে বানানো।'

একটু বিরতি দিলেন ভদ্রলোক, তারপর আবার বলতে লাগলেন, 'ম্যানড্রাগোরাকে নিয়ে ভালই ছিলাম আমি। আমার বয়স বাড়ছিল। যদিও ম্যানড্রাগোরার বয়স এক জায়গায় থেমে আছে। কিছুদিন আগে জানতে পেরেছি আমার ব্লাড ক্যান্সার হয়েছে। লাস্ট স্টেজ। ডাক্তাররা বলে দিয়েছেন আর বেশিদিন আয়ু নেই আমার।'

'সরি', বিড়বিড় করল মাইকেল।

'সরি হবার কিছু নেই। মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। ভয় পাচ্ছিলাম মৃত্যুর পরে আমার ম্যানড্রাগোরার কী হবে ভেবে। কারণ আমি মরে গেলে ওকে কে দেখবে? তখন ওকে দোকানে এনে বসাই আমি। এমন এক তরুণকে খুঁজছিলাম যার চোখে ম্যানড্রাগোরা স্রেফ কোন মূর্তি বলে বিবেচিত হবে না। দয়াবান, হৃদয়বান যে যুবক ভালবাসবে আমার ম্যানড্রাগোরাকে, রক্ষকের ভূমিকা পালন করবে। তারপর একদিন মিরাকলের মতো এলেন আপনি। ম্যানড্রাগোরার দিকে যেভাবে গভীর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন, দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম ম্যানড্রাগোরা আপনার কাছে নিরাপদে থাকবে। ওকে ভালবাসবেন আপনি।'

'হ্যাঁ। বাসব', বলল মাইকেল।

'ধন্যবাদ। আমার বিশ্বাস আমার চেয়েও বেশি ভালবাসতে পারবেন ম্যানড্রাগোরাকে।'

এমন সময় বেজে উঠল দোকানের ঘন্টা। খদ্দের এসেছে। উঠে দাঁড়াল দু'জনেই। মাইকেল চলে গেল। অপরজন ব্যস্ত হয়ে পড়ল খদ্দের নিয়ে।

কয়েক দিন পরে ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে মাইকেল, দেখল প্রৌঢ়ের দোকান বন্ধ। পাশের দোকানদার জানালো মারা গেছেন ভদ্রলোক। মাইকেলের মধ্যে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো। মনে হলো অবশেষে ম্যানড্রাগোরা সত্যি তার হয়ে গেছে। মেয়েটির জন্য সে জীবনও দিতে পারবে।

তারপর থেকে পাগলামিতে পেয়ে বসল মাইকেলকে। ম্যানড্রাগোরা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না সে। অফিস কামাই শুরু করল। ফলে চাকরিটা হারাতে হলো ওকে। ম্যানড্রাগোরা খেতে পারে না বলে সে-ও একটা পর্যায়ে বন্ধ করে দিল খাওয়া-দাওয়া। আমার ভালবাসার মানুষ না খেলে আমি খাই কি করে? নিজেকে যুক্তি দিয়ে বোঝাল সে।

সারা দিন ঘরে বসে দিন কাটে মাইকেলের ম্যানড্রাগোরার মুখের দিকে তাকিয়ে। সন্ধ্যাবেলায় মাঝে মাঝে বেরোয়। ফুল কিনে আনে ম্যানড্রাগোরার জন্যে। এভাবে তার জমানো টাকাও শেষ হয়ে গেল।

ম্যানড্রাগোরার প্রতি মাইকেল'র ভালবাসা স্বর্গীয়। এর মধ্যে কামনা-বাসনার কোন স্থান নেই। ম্যানড্রাগোরাকে সে স্পর্শও করে না। শুধু সাবধানে গোসল করিয়ে দেয়, ফ্যান চালিয়ে শুকোয় গা এবং চুল। তারপর স্কার্ট পরিয়ে বেঁধে দেয় চুল। মাইকেল উত্তেজিত হয়ে লক্ষ করে ওর যত্নে আর ভালবাসায় যেন ধীরেধীরে প্রাণ ফিরে পাচ্ছে ম্যানড্রাগোরা। চুলের রঙ চকচক করছে, চামড়ার ফেকাসে ভাবটা চলে গিয়ে ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, পাতলা ঠোঁটে ধরেছে রঙ।

ম্যানড্রাগোরার জন্য উন্মাদ মাইকেলের নিজের প্রতি বিন্দুমাত্র খেয়াল ছিল না। সে বুঝতে পারছিল না এই উন্মাদনা নিজের ধ্বংস ডেকে আনছে। ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ছে শরীর। কিন্তু ব্যাপারটাকে পাত্তাই দিল না সে। বাইরে যাওয়া বাদ দিল মাইকেল, আর খাওয়া-দাওয়া একেবারেই বন্ধ। ভূতের মতো সে নিজের ঘরে পায়চারি করে, কথা বলে ম্যানড্রাগোরার সঙ্গে, প্রেমের কবিতা লেখে ম্যানড্রাগোরাকে নিয়ে। পড়ে শোনায়।

না খেতে খেতে দুর্বলতার চরম সীমায় পৌঁছে গেল মাইকেল। একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরল, হামাগুড়ি দিয়ে এগোল আর্মচেয়ারের দিকে। বহু কষ্টে উঠে বসল। এই প্রথমবারের মতো চুমু খেল ম্যানড্রাগোরার ঠোঁটে।

পরের মুহূর্তে মারা গেল মাইকেল।

ঘরটা এখন অদ্ভুত নীরব। তারপর দ্রুত এবং হালকা-প্রশ্বাসের শব্দ ভেসে এল, গভীর এবং ঘন হয়ে উঠল আওয়াজ। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ম্যানড্রাগোরা, কোমরে গোঁজা সাদা সিল্কের রুমালটা দিয়ে ঢেকে দিল লাশের মুখ।

ম্যানড্রাগোরার গালে রঙ ধরল, ফাঁক হয়ে গেল কমলাকোয়া অধর, মৃদু একটা ঝাঁকি দিতেই খোপা খুলে পিঠময় ছড়িয়ে পড়ল কালো কুচকুচে চুলের বন্যা। নাচের ভঙ্গিতে বার কয়েক পা ফেলল সে ঘরের মেঝেতে, তারপর এগোল দরজার দিকে। দোর খুলতেই সূর্যের সোনালি আলোয় উদ্ভাসিত হলো ম্যানড্রাগোরার ফর্সা শরীর। বুক ভরে শ্বাস নিল সে।

আহ্, আবার বেঁচে ওঠা কি আনন্দের!

ম্যান ফ্রম দ্য সাউথ
রোল্ড ডাহ্‌ল

প্রায় ছ'টা বাজে। একটা বিয়ার কিনে সুইমিংপুলের ধারে বসে সূর্যাস্ত উপভোগ করলে মন্দ হয় না।

বার-এ গিয়ে বিয়ার কিনলাম আমি। বাগান পার হয়ে পা বাড়ালাম সুইমিংপুলের দিকে।

বাগানটি খুব সুন্দর। লম্বা লন, অ্যাজালিয়াসের ঝড় আর নারকেল বীথির সমন্বয়ে চমৎকার লাগছে দেখতে। জোরাল হাওয়ার দুলছে নারকেল গাছের পাতা, আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে সবুজ ডাব।

সুইমিংপুলের চারপাশে কয়েকখানা ডেক-চেয়ার, বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়ানো। সাদা টেবিল, ওপরে ঝলমলে ছাতা। তার নিচে বেদিং সুট পরে বসে আছে নারী-পুরুষের দল। পুলে একটা রাবার বল নিয়ে খেলা করছে একটা দল। খেলা মানে বল নিয়ে লোফালুফি।

পুলের ধারে দাঁড়িয়ে ওদেরকে দেখছিলাম। মেয়েগুলো ইংরেজ। এ হোটেলেই থাকে। ছেলেগুলোকে চিনতে পারলাম না। তবে উচ্চারণ শুনে মনে হলো আমেরিকান। নেভাল ক্যাডেট হতে পারে। আজ সকালেই আমেরিকান একটা ট্রেনিং শিপ নোঙর ফেলেছে বন্দরে।

একটা হলুদ ছাতার নিচে গিয়ে বসলাম। চারটে খালি চেয়ার। অন্য কেউ নেই। বিয়ারের ক্যানে চুমুক দিতে দিতে একটা সিগারেট ধরালাম।

বিয়ার খেতে খেতে, সিগারেট হাতে সুইমিংপুলের ধারে বসার মজাই আলাদা। সবুজ পানিতে তরুণ-তরুণীদের উচ্ছ্বসিত দাপাদাপি দেখেও বেশ আনন্দ পাচ্ছি।

আমেরিকান ক্যাডেটগুলো ইংরেজ মেয়েগুলোর সঙ্গে জমিয়েছে ভালই। ডাইভ দিয়ে পড়ছে পানিতে, একজন আরেকজনের পা ধরে ডিগবাজি খাওয়াচ্ছে। সেই সাথে চলছে হাহা হিহি।

হঠাৎ লোকটাকে চোখে পড়ল আমার। ছোটখাট, বুড়ো মানুষ। বেশ দ্রুত হেঁটে আসছে পুলের পাশ দিয়ে। সাদা, নিভাঁজ সুট পরনে তার, হাঁটছে না যেন ছোট ছোট লাফ দিচ্ছে। মাথায় ক্রীম কালারের বড় পানামা হ্যাট। পুলের লোকজন দেখতে দেখতে আসছে সে।

আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। হাসলো। বেরিয়ে পড়ল অমসৃণ, ইঁদুরে দাঁত। প্রত্যুত্তরে আমিও হাসলোম।

'মাফ করবেন, বসতে পারি?

'অবশ্যই, বললাম আমি। বসুন না।'

চেয়ারের পেছনটা দেখল সে সর্তক দৃষ্টিতে, তারপর নিশ্চিত হয়ে বসল পা জোড়া আড়াআড়ি ভাবে রেখে। তার সাদা হরিণের চামড়ার জুতোর সব জায়গায় ছোট ছোট ছিদ্র। বাতাস ঢোকার জন্যে।

'ভারি সুন্দর সন্ধ্যা', বলল সে।

'জ্যামাইকাতে অবশ্য সব সন্ধ্যাই সুন্দর।' লোকটার উচ্চারণ শুনে ঠিক বুঝতে পারলাম না সে কোন দেশের। স্প্যানিশ বা ইটালিয়ান হতে পারে। তবে দক্ষিণ আমেরিকার হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। লোকটার বয়স সত্তুরের কাছাকাছি হবে।

'হ্যাঁ, সায় দিলাম আমি।' এখানকার সবগুলো সন্ধ্যাই সুন্দর।'

'কিন্তু এরা কারা?' পুলের সাঁতারুদের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'দেখে তো মনে হচ্ছে না হোটেলের বাসিন্দা।'

'ওরা আমেরিকান সেইলর', 'জানালাম আমি। 'মানে নাবিক হবার ট্রেনিং নিচ্ছে।'

'আমেরিকানদের দেখেই বোঝা যায়। ওরা ছাড়া এতো হল্লা কে করবে? আপনি নিশ্চই আমেরিকান নন, তাই না?

'না, বললাম আমি।' আমি আমেরিকান নই।'

হঠাৎ আমেরিকান ক্যাডেটদের একজন পুল ছেড়ে চলে এলো আমাদের টেবিলের সামনে। গা বেয়ে পানি ঝরছে। তার সঙ্গে একটি ইংরেজ মেয়ে এসেছে।

'এ চেয়ারগুলো কি দখল হয়ে গেছে?' জানতে চাইল আমেরিকান তরুণ।'

'না', জবাব দিলাম আমি। '

'বসা যাবে ? '

'যাবে। '

ধন্যবাদ, বলল সে। ছেলেটির হাতে একটি তোয়ালে। চেয়ারে বসে তোয়ালের ভাঁজ খুলে সিগারেটের প্যাকেট এবং লাইটার বের করল। মেয়েটিকে সিগারেট দিল। নিল না মেয়েটি। খাবে না। আমাকে অফার করল একটা নিলাম। বুড়োকে দিতে যাচ্ছিল। সে বলল। ধন্যবাদ। আমার কাছে সিগারেট আছে। কুমিরের চামড়ার একটা কেস খুলে সে একটা ছুরি দিয়ে সিগারেটের গোড়াটা কেটে ফেলল।

'আসুন, ধরিয়ে দিই', লাইটার এগিয়ে দিল তরুণ।

'এমন বাতাসে আগুন ধরাতে পারবে না', বলল বুড়ো।

'অবশ্যই পারব। জোর বাতাসেও আমার লাইটার ধরানো যায়। সব সময় যায়।'

মুখ থেকে সিগারেট সরাল লোকটা, মাথাটা একদিকে কাত করে তাকালো আমেরিকানের দিকে।

'সবসময় যায়? তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্নটা করল সে।

'অবশ্যই। কখনোই ব্যর্থ হইনি আমি।

এখনও এক পাশে মাথা কাত করে ছেলেটিকে দেখছে বুড়ো। 'বেশ! বেশ! তুমি বলছ এই বিখ্যাত লাইটার কখনও আগুন ধরাতে ব্যর্থ হয় না। তাই তো বলতে চাইছ তুমি?'

'অবশ্যই, বলল আমেরিকান। 'তাই বলতে চাইছি আমি।' ছেলেটির বয়স বড় জোর কুড়ি হবে। সারা মুখে ফুটকি, নাকটা পাখির ঠোঁটের মত। ধারাল। বুকেও ফুটকির চিহ্ন, সামান্য লালচে পশমও রয়েছে। ডান মুঠিতে ধরে আছে লাইটার। কখনও ব্যর্থ হয় না। হাসছে সে, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। 'গ্যারান্টি দিয়ে বলছি।'

'এক মিনিট, প্লিজ, সিগারেট ধরা হাতটা ট্রাফিক সিগনাল দেয়ার ভঙ্গিতে ওপরে উঠে গেল। এক মিনিট। 'নরম ভাবলেশশূন্য গলায় বলল বুড়ো, এক দৃষ্টিতে লক্ষ করছে ছেলেটিকে।' এ ব্যাপারে একটা বাজি ধরলে কেমন হয়? হাসলো সে।

'তোমার লাইটার সত্যি জ্বলে কিনা তা নিয়ে একটা বাজি ধরতে পারি না?'

'অবশ্যই পারি', বলল ছেলেটি। 'কেন নয় ?'

'বাজি ধরবে ?'

'অবশ্যই। অবশ্যই ধরব।'

বুড়ো সিগারেটের দিকে চোখ নামাল। ভাবছে কি যেন। সত্যি বলতে কি, লোকটার হাবভাব ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না আমার। মনে হচ্ছিল এ সব করে ছেলেটিকে সে বিব্রতকর কোন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলতে চাইছে। একই সাথে মনে হচ্ছিল লোকটার মধ্যে রহস্যময় কিছু একটা আছে, কোন কিছু গোপন করছে সে।

বুড়ো আবার তাকালো ছেলেটির দিকে। ধীর গলায় বলল, বাজি ধরতে আমিও পছন্দ করি। এ নিয়ে এক দান ভাল বাজি হয়ে যাক না। মোট অঙ্কের বাজি?

'দাঁড়ান, দাঁড়ান', বলে উঠল ছেলেটি। 'মোটা অঙ্কের বাজি ধরতে পারব না আমি। বড় জোর এক ডলার বাজি ধরতে পারি।'

লোকটা ট্রাফিক পুলিশের মতো আবার হাত নাড়াল। 'শোনো। আমরা একটা মজা করব। আর এই মজায় একটা বাজি ধরব। তারপর আমার রুমে যাব। ওখানে কোন বাতাস নাই। তুমি তোমার বিখ্যাত লাইটার পরপর দশবার জ্বালাতে পারবে না।'

'অবশ্যই পারব', বলল ছেলেটি।

'বেশ। তাহলে বাজি ধরা যাক।'

'যাক। আমি এক ডলার বাজি ধরছি।'

'না। না। আমি খুব ভাল বাজি ধরব। আমি খুব ধনী মানুষ। আর খেলুড়ে মানুষতো বটেই। শোনো। হোটেলের বাইরে আমার গাড়ি আছে। খুব সুন্দর, দামী গাড়ি। আমেরিকান গাড়ি। তোমাদের দেশের ক্যাডিলাক-'

'আরে দাঁড়ান। দাঁড়ান।' ছেলেটা হেসে উঠে হেলান দিল ডেক চেয়ারে। 'অত বড় বাজি ধরার ক্ষমতা আমার নেই। এ তো স্রেফ পাগলামি।'

'এটা কোন পাগলামী নয়। তুমি পরপর দশবার তোমার লাইটার জ্বালাতে পারলেই গাড়িটি তোমার হয়ে যাবে। তোমার ক্যাডিলাকের মালিক হতে ইচ্ছে করে না?

'অবশ্যই করে', ছেলেটা হাসছে এখন।

'বেশ। বেশ। তাহলে বাজি ধরা যাক। আমি আমার ক্যাডিলাক বাজি ধরছি।'

'আর আমি কি বাজি ধরব?'

লোকটা গভীর মনোযোগে ছেলেটার লাইটের লাল রঙের ব্যান্ডটাকে দেখছিল। বলল, বন্ধু, তোমাকে এমন কোন বাজি আমি ধরতে বলব না যা তোমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। বুঝতে পেরেছ?

'তাহলে আপনিই বলে দিন কি বাজি ধরতে পারি?'

'ছোটটো একটি জিনিস তোমাকে বাজি ধরতে হবে। বাজি হারলে ওটা দিতে আপত্তি করবে না তো?

'জিনিসটা কি?'

'ধরো, তোমার বাম হাতের কড়ে আঙুল।

'আমার কি?' হাসি মুছে গেল ছেলেটির মুখ থেকে।

'সহজ কথা। বাজি জিতলে তুমি গাড়ি নিবে। হারলে আমি তোমার আঙুল নিব।

'বুঝলাম না। আঙুল নেবেন মানে?'

'আমি ওটা কেটে নিব।'

'বলে কি এই লোক! এ তো পাগলামী। না। না। এসব বাজির মধ্যে আমি নেই। আমি বড় জোর এক ডলার বাজি ধরতে পারি।'

বুড়ো শরীর এলিয়ে দিল চেয়ারে, রাগ করল। 'বেশ। বেশ। তুমি তাহলে বাজি ধরতে চাও না। তাহলে ব্যাপারটা ভুলে যাওয়া যাক। কেমন?'

আমেরিকান ক্যাডেট কোন জবাব দিল না। অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পুলের দিকে। হঠাৎ মনে পড়ল এখনও সিগারেট জ্বালানো হয়নি। দুই ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট গুঁজল সে, দু'হাতের চেটো দিয়ে লাইটারটাকে আড়াল করে চাকা ঘোরাল। জ্বলে উঠল পলতে, স্থির হয়ে জ্বলতে লাগল হলদে ছোট্ট শিখা। এমনভাবে লাইটারটাকে ধরে রেখেছে সে, বাতাস লাগলই না ওটার গায়ে।

'আমার সিগারেটটা জ্বালাতে পারি?' বললাম আমি।

'সরি। ভুলেই গেছিলাম।'

লাইটারের জন্যে হাত বাড়ালাম, কিন্তু উঠে দাঁড়াল ছেলেটি। এগিয়ে এলো আমার কাছে। ধরিয়ে দিল সিগারেট।

'ধন্যবাদ, বললাম আমি। ফিরে গেল সে নিজের জায়গায়।

'কেমন কাটছে সময়? জিজ্ঞেস করলাম।

'ভালই', জবাব দিল সে। 'খুব সুন্দর জায়গা।'

'কিছুক্ষণের জন্যে নীরবতা নেমে এল। তবে বুঝতে পারছিলাম বুড়োর প্রস্তাব ভাবিয়ে তুলেছে ছেলেটিকে। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছে সে চেয়ারে, বোঝাই যাচ্ছে টেনশন করছে। একটু পরে গা মোচড়ামুচড়ি শুরু করল। বুক চুলকাচ্ছে, ঘাড়ের কাছটা ঘষছে, শেষে আঙুল দিয়ে হাঁটুতে তবলা বাজাতে শুরু করল।

'আপনার বাজি নিয়ে আরেকটু কথা বলতে চাই, অবশেষে বলল সে।' আপনি বলছেন আপনার ঘরে গিয়ে যদি এই লাইটার পরপর দশবার জ্বালাতে পারি তাহলে

আপনার ক্যাডিলাকটা আমাকে দিয়ে দেবেন। আর বাজি হারলে আমার বাঁ হাতের আঙুলটা আপনাকে কেটে দিতে হবে। এই তো?

'ঠিক তাই। ওটাই বাজির শর্ত। তবে আমার মনে হচ্ছে তুমি ভয় পেয়েছ।'

'আমি হেরে গেলে কি করতে হবে? যাতে আঙুল কেটে নিতে পারেন সে জন্যে হাত বাড়িয়ে দিতে হবে?

'না। না। তাতে কোন লাভ হবে না। আঙুল কাটার সময় তুমি হাত সরিয়ে নিতে পারো। খেলা শুরু হবার আগে তোমার একটা হাত আমি টেবিলের সঙ্গে বেঁধে রাখব। বাজিতে হারলেই তোমার একটা আঙুল কেটে নেব।'

'আপনার ক্যাডিলাকটা কোন সালের?'

'বুঝতে পারলাম না!'

'কোন সালের-মানে কত হয়েছে ক্যাডিলাকের বয়স ?'

'বয়স? আরে। ওটা আমি নতুন কিনেছি। গত বছরে। একদম নিউ কার। তবে তুমি বাজি ধরবে বলে ভরসা পাচ্ছি না। আমেরিকানরা খুব ভীতু হয়।

এক মুহূর্তে কি যেন ভাবল ছেলেটা, ইংরেজ মেয়েটার দিকে তাকালো, তারপর আমার দিকে। 'রাজি' তীক্ষ্ণ গলায় বলল সে। 'আপনার সঙ্গে আমি বাজি ধরতে রাজি।'

'গুড!' হাততালি দিয়ে উঠল বুড়ো। 'এখনই বাজিটা ধরব আমরা। আর আপনি, স্যার', আমার দিকে ফিরল সে, 'আপনি আমাদের ইয়ে হবেন, কি বলে- রেফারী।'

'কিন্তু এ রকম উদ্ভট বাজিতে রেফারী হবার কোন ইচ্ছে আমার নেই, বললাম আমি। 'খেলাটা পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

'আমারও', এই প্রথম কথা বলল ইংরেজ মেয়েটি। 'এটা হাস্যকর, বোকার মতো একটা বাজি ধরা হয়েছে।'

'এ ছেলে হেরে গেলে আপনি সত্যি ওর আঙুল কেটে নেবেন?' জানতে চাইলাম আমি।

'অবশ্যই। আর জিতলে সে ক্যাডিলাক পাবে। চলো। আমার ঘরে যাই।

উঠে দাঁড়াল ছেলেটি।

'এ বেশেই যাবে? জিজ্ঞেস করল বুড়ো। 'কাপড় পরে নিলে হতো না?'

'না', বলল ছেলেটি। 'এভাবেই যাব আমি।' আমার দিকে ঘুরল সে। 'স্যার, আপনি যদি দয়া করে রেফারীর দায়িত্বটা নিতেন-'

'ঠিক আছে,; বললাম আমি। 'এত করে বলছ যখন সবাই, নেব আমি রেফারীর দায়িত্ব। তবে আবারও বলছি তোমাদের বাজির ধরন পছন্দ হয়নি আমার।'

'তুমিও চলো না', ছেলেটি বলল মেয়েটিকে। তুমি দর্শকের ভূমিকায় থাকবে।'

কি ভেবে রাজি হয়ে গেল মেয়েটি। লোকটা আমাদের ছোট দলটাকে নিয়ে বাগানের মাঝ দিয়ে হোটেলের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল। বুড়োকে এখন বেশ উত্তেজিত লাগছে, হাঁটার গতি বেড়ে গেছে, রীতিমত ঘোড়ার মতো লাফাচ্ছে।

'আমি ওই দিকে থাকি', হাত তুলে দেখাল বুড়ো। 'আগে আমার গাড়িটাকে দেখবেন? আছে এখানেই।

হোটেলের সামনে ড্রাইভওয়েতে নিয়ে গেল সে আমাদেরকে। দাঁড়িয়ে পড়ল। পার্ক করা চকচকে, ম্লান-সবুজ রঙের একটি ক্যাডিলাকের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাল।

'সুন্দর গাড়ি', মন্তব্য করল ছেলেটি।

'তাহলে এবার আমার রুমে চলো। দেখা যাক গাড়িটা জিততে পারো কিনা।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম ওপরে। দরজা খুলল বুড়ো। ডাবল একটা বেডরুমে ঢুকে পড়লাম সবাই। বিছানার এক কোণে মহিলাদের একটা ড্রেসিং গাউন ঝুলতে দেখলাম।

'প্রথমে', বলল সে। 'আমরা সবাই মার্টিনি পান করব।'

ঘরের দূর প্রান্তে ছোট একটা টেবিল, তাতে ড্রিংকস সাজানো। শেকার, বরফ, গ্লাস সবই আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। মার্টিনি বানাতে শুরু করল বুড়ো, একটু পরে বেল টিপ দিল। দরজায় নক্ করে ভেতরে ঢুকলো এক কৃষ্ণাঙ্গী মহিলা। জিনের বোতল নামিয়ে রেখে পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল লোকটা, এক পাউন্ডের একটা নোট বাড়িয়ে দিল মহিলার দিকে। 'এটা তুমি রাখো। আমরা এখানে একটা খেলা খেলব। সেজন্যে কিছু জিনিস দরকার।'

তিনটা জিনিস-কয়েকটা পেরেক, একটা হাতুড়ি আর মাংস কাটার চাপাতি। আনতে পারবে?'

'চাপাতি!' ঢোক গিলল মহিলা। 'মাংস কাটার চাপাতি?

'হ্যাঁ। হ্যাঁ। ওটাই আমার দরকার। আনতে পারবে কিনা বলো।'

'পারব, স্যার।' বলে চলে গেল বিস্মিত মহিলা।

সবার হাতে একটা করে মার্টিনির গ্লাস ধরিয়ে দিল বুড়ো। আমরা দাঁড়িয়েই মার্টিনির গ্লাসে চুমুক দিতে লাগলাম। লক্ষ করলাম সুন্দরী ইংরেজ মেয়েটা গ্লাসের ওপর থেকে বার বার তাকাচ্ছে ছেলেটির দিকে। আর বুড়ো নীল বেদিং স্যুট পরা মেয়েটিকে দেখছে। বুড়োর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে বাজির ব্যাপারে সে খুবই সিরিয়াস। ছেলেটি যদি বাজিতে হেরে যায় তাহলে কি ঘটবে ভেবে শিউরে উঠলাম আমি। লোকটা সত্যি ওর আঙুল কেটে ফেলবে? তাহলে বুড়োর ক্যাডিলাকে করেই ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

'বাজির ব্যাপারটা তোমার কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছে না?' ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'না। বরং মজার বাজি মনে হচ্ছে', জবাব দিল সে। ইতিমধ্যে বড়সড় একটা মার্টিনি গিলেছে।

'আমার কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছে', বলল মেয়েটি। 'তুমি হেরে গেলে কি হবে?'

'কিছুই হবে না। বাম হাতের কড়ে আঙুল মানুষের কোন কাজে লাগে নাকি? হাত বাড়িয়ে দেখাল ছেলেটি। 'এই যে আমার কড়ে আঙুল। আজ পর্যন্ত এটা কোন কাজে লেগেছে? লাগেনি। কাজেই এটাকে নিয়ে বাজি ধরতে ক্ষতি কি? বরং মজাই লাগছে।'

হাসলো বুড়ো। শেকার এনে আবার ভরে দিল সবার গ্লাস।

'খেলা শুরুর আগে', বলল সে, আমি রেফারীকে গাড়ির চাবি দিয়ে দিচ্ছি। সে পকেট থেকে একটা চাবি বের করে আমাকে দিল।' আর কাগজপত্র, মানে গাড়ির কাগজপত্র এবং ইনসিওরেন্স পেপার্স গাড়ির পকেটে আছে।'

সেই কৃষ্ণাঙ্গী মহিলা আবার ঢুকলো ঘরে। তার এক হাতে ছোট এক চাপাতি, কসাইরা মাংস কাটতে এ ধরনের চাপাতি ব্যবহার করে, অন্য হাতে একটা হাতুড়ি এবং কয়েকটা পেরেক। 'গুড! সব জোগাড় করেছ দেখছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এখন তুমি যেতে পারো। মহিলা দরজা বন্ধ করে যাওয়া পর্যন্ত সে সবুর করল, তারপর জিনিসপত্রগুলো রাখল বিছানার এক কোণে। বলল, 'এবার প্রস্তুত হওয়া যাক, কি বলেন? ফিরল ছেলেটির দিকে। একটু সাহায্য করো প্লিজ। এই টেবিলটা একটু সরাতে হবে।

টেবিল মানে হোটেলের রাইটিং ডেস্ক, দৈর্ঘ্য-প্রস্থে চার ফুট বাই তিন ফুট। তাতে ব্লটিং প্যাড, কালি, কলম, কাগজ ইত্যাদি রয়েছে। দেয়ালের কাছ থেকে টেবিলটা সরিয়ে নিল ওরা, লেখার সরঞ্জাম রাখল আরেক জায়গায়।

'এবার', বলল বুড়ো। 'একটা চেয়ার। একটা চেয়ার রাখল টেবিলের পাশে। চটপটে আছে বুড়ো। বাচ্চাদের মতো মহা উৎসাহে কাজ করছে। 'এখন পেরেকগুলো নিয়ে এসো। টেবিলে পেরেক মারতে হবে। ছেলেটি পেরেক নিয়ে এল। টেবিলে ঠকঠাক হাতুড়ি মেরে পেরেক বসিয়ে ফেলল বুড়ো।

মার্টিনির গ্লাস হাতে বুড়োর কান্ড দেখেছি আমরা। ছয় ইঞ্চি ব্যবধানে পাশাপাশি দুটো পেরেক ঠুকছে সে টেবিলে। পরীক্ষা করে দেখল শক্ত ভাবে পেরেক বসানো হয়েছে কিনা।

বুড়োর গতি দেখে যে কেউ বুঝতে পারবে এ কাজ সে আগেও বহুবার করেছে। তার কাজে কোথাও কোন ছন্দপতন নেই।

'এখন দরকার কিছু রশি', বলল সে। রশি খুঁজেও আনল। বেশ। এতক্ষণে প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো। দয়া করে টেবিলের এপারে বসবে? বলল সে ছেলেটিকে।

গ্লাস রেখে টেবিলের পাশের চেয়ারে বসল আমেরিকান ক্যাডেট।

'এখন পেরেকের মাঝখানে তোমার বাম হাতখানা রাখো। পেরেক পুঁতছি ওগুলোর সাথে তোমার হাত রশি দিয়ে বাঁধব বলে। যাতে তুমি হাত নড়াচড়া করতে না পারো।'

ছেলেটির কব্জিতে রশি পেঁচাল বুড়ো, তারপর শক্ত করে পেরেকের সঙ্গে বাঁধল রশি। এতই শক্ত করে বাঁধল যে ছেলেটি কোন ভাবেই তার হাত নাড়াতে পারবে না। তবে আঙুল নাড়াতে পারছিল।

'বেশ। এবার হাত মুঠো করো কড়ে আঙুলটি বাদে। কড়ে আঙুলটি খোলা থাকবে, পড়ে থাকবে টেবিলের ওপর। বেশ! বেশ! এবার আমরা রেডি। তোমার ডান হাত দিয়ে এবার লাইটার জ্বালাবে। তবে এক মিনিট, প্লিজ।'

লাফ মেরে বিছানায় উঠল বুড়ো নিয়ে এলো চাপাতি। চাপাতি হাতে দাঁড়াল টেবিলের পাশে।

'আমরা সবাই রেডি?' বলল সে। 'মি. রেফারী, আপনি বললেই খেলা শুরু হয়ে যাবে।'

ইংরেজ মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটির চেয়ারের পেছনে। মুখে কোন কথা নেই। ছেলেটি ডান হাতে লাইটার নিয়ে বসে আছে নিশ্চুপ, দৃষ্টি চাপাতির দিকে। আর বুড়ো তাকাচ্ছে আমার দিকে।

'তুমি রেডি?' জিজ্ঞেস করলাম ছেলেটিকে।

'রেডি।'

'আর আপনি?' বুড়োকে প্রশ্ন করলাম।

'পুরো রেডি', বলে চাপাতি শূন্যে তুলল সে, নামিয়ে আনল ছেলেটির হাতের ঠিক দু'ফুট ওপরে, কোপ মারার জন্য প্রস্তুত। ছেলেটি তাকালো ওদিকে। তবে চেহারায় কোন ভাব ফুটল না। শুধু ভুরু কুঁচকে রাখল।

'বেশ', বললাম আমি। 'শুরু করা যাক।'

ছেলেটি বলল, 'আমি লাইটারের জ্বালানোর সময় আপনি জোরে জোরে গুনবেন।'

'আচ্ছা', বললাম আমি। 'গুনব।'

বুড়ো আঙুল দিয়ে লাইটারের ঢাকনি খুলল সে, চাকায় জোরে মোচড় দিল। ঝিক করে উঠল চকচকি পাথর, আগুন ধরে গেল সলতেতে, জ্বলে উঠল ছোট্ট হলুদ শিখা। 'এক!' ঘোষণা করলাম আমি।

আগুন নেভাল না ছেলেটি, ঢাকনি নামিয়ে রাখল। পাঁচ সেকেন্ড পরে আবার জ্বালল লাইটার।

'দুই!'

কেউ কিছু বলছে না। লাইটার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ছেলেটি। হাতে চাপাতি নিয়ে বুড়োও তাকিয়ে রয়েছে ওদিকে।

'তিন!'

'চার!'

'পাঁচ!'

'ছয়!'

'সাত!' বোঝাই যাচ্ছে এটি খুব ভাল লাইটার। ঝিক করে ওঠে চকমকি পাথর, সলতে ছোট শিখা নিয়ে স্থির ভাবে জ্বলতে থাকে। আমি শুধু দেখছি ছেলেটির বুড়ো আঙুলের কারসাজি। বুড়ো আঙুল দিয়ে সে লাইটার জ্বালাচ্ছে, নেভাচ্ছে। দম নিলাম আমি, আট বলার জন্যে প্রস্তুত। বুড়ো আঙুলে ঘুরল চাকা। ঝিকিয়ে উঠল চকমকি-পাথর। জ্বলে উঠল ছোট্ট শিখা।

'আট!' মাত্র বলেছি আমি, তক্ষুনি ঝড়াং করে খুলে গেল দরজা। সবাই ঘুরে তাকালোম। দোরগোড়ায় হাজির হয়েছে এক মহিলা। মাথা ভর্তি কালো চুল।

দু'সেকেন্ডের ওখানে দাঁড়িয়ে রইল সে, তারপর 'কার্লোস! কার্লোস!' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ভেতরে ঢুকলো। কব্জি চেপে ধরল সে বুড়োর, ছিনিয়ে নিল চাপাতি, ছুঁড়ে ফেলল বিছানার ওপর, তারপর লোকটার কোটের ল্যাপেল ধরে ভয়ানক ঝাঁকাতে শুরু করল। সেই সাথে ঝড়ের বেগে তুবড়ি ছুটল মুখে। বকছে সে বুড়োকে। ভাষাটা সম্ভবত স্প্যানিশ। এতো জোরে বুড়োকে ধরে ঝাঁকাচ্ছে যে চেহারাটাই চেনা যাচ্ছিল না।

আস্তে আস্তে কমে এলো ঝাঁকির বেগ, বুড়োকে এক ধাক্কা মেরে বিছানার ওপর পাঠিয়ে দিল মহিলা। বিছানার কোণে বসে চোখ মিটমিট করতে লাগল বুড়ো, মাথা হাতড়ে দেখছে ঘাড়ের ওপর ওটা ঠিকঠাক মতো আছে কিনা।

'দুঃখিত, বলল মহিলা', এ রকম একটা ঘটনার জন্যে আমি সত্যি দুঃখিত। প্রায় নিখুঁত ইংরেজিতে কথাগুলো বলল সে। 'দোষ আমারই। চুল ধুতে দশ মিনিটের জন্যে বাইরে গেছি, অমনি সেই কান্ড ঘটিয়ে বসেছে কার্লোস। মহিলার চেহারা করুণ আর বিমর্ষ দেখাল।

ছেলেটি দড়ির বাঁধন খুলছে। আমি আর ইংরেজ মেয়েটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

'কার্লোসের আসলে মাথার ঠিক নেই', বলে চলল মহিলা।

আমরা আগে যেখানে থাকতাম সেখানে সে বাজি ধরে বিভিন্ন লোকের হাত কেটে সাতচল্লিশটা আঙুল যোগাড় করেছে। আর বাজিতে হেরে হারিয়েছে এগারোটা গাড়ি। শেষে সবাই হুমকি দিল ওকে নিয়ে পাড়া ছাড়তে হবে। এরপর ওকে নিয়ে এখানে চলে আসি আমি।

'আমরা তো ছোট্ট একটা বাজি ধরেছিলাম মাত্র', বিছানার ওপর বসা বুড়ো মিন মিন করে বলল।

'তোমার সঙ্গেও নিশ্চয়ই বাজি ধরেছিল? জিজ্ঞেস করল মহিলা।

'হ্যাঁ', জবাব দিল ছেলেটি। 'একটা ক্যাডিলাক।'

'ওর কোন গাড়ি নেই। ওটা আমার।' জানলো মহিলা। ওর বাজি ধরার মতো কিছু নেই তবু বাজি ধরে। যা ঘটেছে তার জন্যে আমি সত্যি দুঃখিত।' মহিলাকে খুব লজ্জিত দেখাচ্ছে।

'এই নিন আপনার গাড়ির চাবি', টেবিলের ওপর চাবিটা রাখলাম আমি।

'আমরা তো ছোট্ট একটা বাজি ধরেছিলাম মাত্র', আবার বিড়বিড় করল লোকটা।

'কার্লোসের বাজি ধরার মতো কিছু নেই', বলল মহিলা। 'এ পৃথিবীতে ওর কিছু নেই। কিচ্ছু নেই। ওর যা ছিল অনেক আগেই আমি তার মালিক হয়েছি। তবে এতে প্রচুর সময় লেগেছে আমার, অনেক কষ্টও করতে হয়েছে। শেষে পেয়েছি সব কিছুই।'

ছেলেটির দিকে তাকিয়ে হাসলো সে। করুণ, ম্লান হাসি। এগিয়ে এলো সে টেবিলের সামনে, হাত বাড়াল গাড়ির চাবিটি নেয়ার জন্যে।

তখন আমি দেখতে পেলাম মহিলার হাতে বুড়ো আঙুল নেই। সবগুলো আঙুল কাটা।

রুম উইথ এ ভিউ

হ্যাল ড্রেসনার

দুর্বল শরীরটা চাপা পড়ে আছে দামী কম্বলের নিচে, ছ'টা মোটা বালিশ ছড়ানো বিছানার চারপাশে। জ্যাকব বম্যান বিষ দৃষ্টিতে দেখলেন তাঁর বাটলার চার্লস ঘরে ঢুকছে। একটা ট্রে বিছানার ওপর। তারপর টেনে দিল জানালার পর্দা। সকালের ঝকঝকে আলোয় ভরে গেল ঘর।

'জানালাটা খুলে দেব, স্যার?' জিজ্ঞেস করল চার্লস।

'চাও নাকি আমার ঠাণ্ডা লাগুক?'

'না, স্যার। আচ্ছা, আর কিছু লাগবে, স্যার?'

মাথা নাড়ালেন জ্যাকব। কিছু লাগবে না। ন্যাপকিন বিছালেন পেটের ওপর। হাত বাড়ালেন নাস্তার প্লেটের ঢাকনি সরাতে, থেমে গেলেন হঠাৎ। চার্লস। এখনও দাঁড়িয়ে আছে জানালার পাশে প্রভুভক্ত রক্ষীর মত।

'বকশিশের জন্যে দাঁড়িয়ে আছ?' কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করলেন জ্যাকব।

'জ্বি না, স্যার। অপেক্ষা করছি মিস নেভিনসের জন্যে। ড. হোমস বলেছেন আপনাকে কখনও একা রেখে যাওয়া চলবে না, স্যার।'

'যাও। যাও', বললেন জ্যাকব। 'আমি যদি মনস্থির করি পাঁচ মিনিটের মধ্যে মরব, তখন তোমাকে ডাকব'খন। এখন দূর হও।'

চার্লস চলে যাচ্ছে, তাকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করলেন জ্যাকব। যাবার সময় দরজা বন্ধ করে গেল বাটলার। জ্যাকব এবার রূপোর প্লেটের ঢাকনি সরালেন। একটা ডিম পোচ, এক টুকরো টোস্ট, যৎসামান্য মোরব্বা আর এক কাপ ফিকে রঙের চা। ব্যস, এই হলো নাস্তার মেন্যু। থু! বিতৃষ্ণা নিয়ে প্লেটের খাবারগুলো দেখলেন জ্যাকব, তারপর ঘুরলেন জানালার দিকে। বাইরে চমৎকার একটি দিন। ব্যমান ম্যানসনের বিশাল সবুজ লন সূর্যালোকে ঝলমল করছে, বাগানের শ্বেতপাথর আর ব্রোঞ্জের ছোট-বড় নানা মূর্তি থেকে যেন জেল্লা ছিটকে বেরুচ্ছে। সবগুলোই গৃহকর্তার রুচি এবং আভিজাত্যের পরিচয় দিচ্ছে। ড্রাইভওয়েটা বেঁকে গেছে ঘোড়ার খুরের নালের মত, বাম প্রান্তের শেষ মাথায় ইটের ছোট একটা কটেজ। কেয়ারটেকার থাকে। কেয়ারটেকার কভেনি ঝুঁকে একটা অ্যাজালিয়া বেড (azalea bed) দেখছে। ড্রাইভওয়ের ডান দিকে ছুঁচাল লোহার গেটের সামনে দোতলা সমান গ্যারেজ। গ্যারেজের দরজা খোলা। জ্যাকব দেখলেন তাঁর শোফার মিসেস ব্যমানের ঝকঝকে নীল কনভার্টিবলটাকে ন্যাকড়া দিয়ে মুছছে। সেই সাথে বকবক করে চলেছে জ্যাকবের নতুন নার্স মিস নেভিনসের সাথে। গেট ছাড়িয়ে আউটার লন সোজা গিয়ে মিশেছে রাস্তার সাথে। জ্যাকবের ঘর থেকে রাস্তা অনেক দূর। দৃষ্টি পৌছায় না অত দূরে।

বেচারা জ্যাকব নম্যান, মনে মনে ভাবলেন তিনি। তাঁর জীবনে ভাল জিনিসগুলো বড় দেরিতে এসেছে। অবশেষে বিশাল এক বাড়ির মালিক হবার আনন্দ উপভোগ করতে ব্যর্থ জ্যাকব। চোখ ঘুরিয়ে দেয়ার মতো অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণীকে অবশেষে বিয়েও করতে পেরেছেন তিনি। কিন্তু বয়সের পার্থক্য তাঁকে এমন চুপসে দিয়েছে যে চোখ ঝলসানো রূপসী স্ত্রীর কাছ থেকে সুখ পাবার মতো অবস্থা তাঁর নেই। মানুষের মনের কথা বুঝতে পারার মতো অবিশ্বাস্য ক্ষমতারও অধিকারী হয়েছেন তিনি অবশেষে। কিন্তু সারাক্ষণ চাকর-বাকর পরিবৃষ্ট হয়ে থাকেন যিনি, তাঁর এ ক্ষমতা থেকেই বা কি লাভ?

বেচারা জ্যাকব ব্যমান, আবার মনে মনে দুঃখ প্রকাশ করলেন তিনি নিজেকে নিয়ে। সম্পদ, ভাগ্য এবং জ্ঞান পেয়ে কি লাভ হলো?

এ ঘরের চৌহদ্দিতে তাঁকে সারাক্ষণ বন্দী থাকতে হয়। কোথাও যেতে পারেন না তিনি। যাবার ক্ষমতাও নেই।

ঘড়ির দিকে তাকালেন জ্যাকব। ন'টা বেজে ছয়। ঘড়ির চারপাশে অজস্র ওষুধের বোতল। ঘন্টায় ঘন্টায় ঘড়ি ধরে তাঁকে ওষুধ গিলতে হয়। তবে এ কাজটা ভাড়া করা নার্সরাই করে। তিনি আবার চোখ ফেরালেন জানালায়। সাদা ইউনির্ফম পরা নার্স ঘড়ির দিকে তাকালো বিরক্তি নিয়ে, তারপর শোফারকে চুমু খেয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটা দিল। মেয়েটা স্বর্ণকেশী, সুঠামদেহী। হাঁটার ভঙ্গি চমৎকার। শক্তি যেন ফুটে বেরুচ্ছে গা থেকে প্রতিটি পদক্ষেপে। আর এই শক্তিরই বড় অভাব জ্যাকব বম্যানের। মেয়েটিকে ঝুল-বারান্দার ছাদের নিচে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলেন তিনি। নাস্তার প্লেটে মনোনিবেশ করলেন জ্যাকব। মেয়েটি রাঁধুনী এবং মেইডকে সুপ্রভাত জানাবে, মনে মনে ভাবলেন তিনি। তারমানে ডিম পোচ এবং টোস্ট শেষ করার সাথে সাথে দরজার কড়া নাড়বে নার্স।

টোস্টের শেষ টুকরোটা চিবুচ্ছেন জ্যাকব, এমন সময় নক শুনলেন দরজায়। তিনি বললেন, 'দূর হও।' দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো নার্স হাসিমুখে।

'গুড মর্নিং মি. বী', খুশি খুশি গলায় বলল সে। হাতের পেপার ব্যাগটা নামিয়ে রাখল ড্রেসারের ওপর, রাতের নার্সের লিখে যাওয়া চার্টের দিকে অবহেলা ভরে একবার তাকালো। তারপর জানতে চাইল, কেমন আছেন আজ?

'বেঁচে আছি', জবাব দিলেন জ্যাকব।

'আজকের দিনটা খুব সুন্দর, না?' বলল মেয়েটি, হেঁটে গেল জানালার ধারে। 'আমি বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। মনে হচ্ছিল বসন্ত এসেছে। জানালা খুলে দিই?

'না। খুলো না। তোমার ডাক্তার বন্ধু বলেছে খোলা হাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

'ওহ, ঠিক আছে... ভুলেই গেছিলাম কথাটা। আসলে নার্স হিসেবে আমি কোন কর্মের নই, তাই না? হাসলো সে।'

'তুমি নার্স', বললেন জ্যাকব। 'তবে অন্যদের চেয়ে ভাল নার্স। আমাকে কখনও একা রেখে যেতে চাও না।'

'আপনি বাড়িয়ে বলেছেন, মি. বী। আমি তেমন নিবেদিতপ্রাণ নই।'

'নিবেদিতপ্রাণ? তুমি সুন্দরী, বয়স অল্প। তোমার তো অন্য কিছুতেও আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। তুমি হয়তো মনে মনে ভাবছ, "আমি কিছুদিন নার্সিং- এর কাজ করব। কাজটা সহজ। টাকাও পাওয়া যাবে ভাল। টাকা জমিয়ে বিয়ে করে ফেলব।"

অবাক দেখাল মেয়েটিকে। 'ড. হোমস যেদিন আমাকে এই কাজের অফার দিলেন ঠিক এসব কথাই ভেবেছি সেদিন। আপনি খুব বুদ্ধিমান মি. বী।'

'ধন্যবাদ', শুকনো গলায় বললেন জ্যাকব। বয়স বাড়লে মানুষের বুদ্ধিও বাড়ে। চায়ের কাপে চুমুক দিতেই চেহারা বিকৃত হয়ে গেল তাঁর। 'থু। কি বিশ্রী স্বাদ! সরাও এটাকে। কম্বলের নিচে লাথি মারলেন তিনি।

'চা-টা আপনার শেষ করা উচিত', বলল মিস নেভিনস।

'সরাতে বললাম না!' খেঁকিয়ে উঠলেন জ্যাকব।

'মাঝে মাঝে আপনি একদম বাচ্চা ছেলেদের মতো করেন], চায়ের কাপটা জ্যাকবের হাত থেকে নিয়ে নিল নার্স।

'ঠিক আছে। আমি বাচ্চা ছেলে আর তুমি বাচ্চা মেয়ে। এখন এসো দু'জনে গল্প করি।

মাথার বালিশ ঠিক করতে যাচ্ছিলেন তিনি, মেয়েটির হাত লাগাতে থেমে গেলেন।

'আচ্ছা, ফ্রান্সিস, 'নার্সের মুখের সাথে প্রায় মুখ লাগিয়ে বললেন তিনি, 'তুমি তোমার স্বামী হিসেবে কাউকে পছন্দ করেছ?

'মি. বী, কোন মেয়েকে এমন ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে নেই।'

'মেনে নিলাম এটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন। কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব তুমি আমাকে না বললে আর কাকে বলবে? আমি কি তোমার গোপন কথা কাউকে বলে দেব? কক্ষনো না। কাকে বলব? তোমার স্পেশালিস্ট ডাক্তার আমাকে একটা ফোন পর্যন্ত করতে দেয় না। আমার ব্রোকারের সাথে কথা বলারও সুযোগ নেই এ ঘরে ফোন নেই বলে। ডাক্তারের ধারনা, আমি যদি শুনি ব্যবসায়ে লোকসান হচ্ছে তাহলে নাকি আর ধাক্কা সামলাতে পারব না। সে জানে না খবরের কাগজ দেখেই আমি বলে দিতে পারি কত লাভ বা ক্ষতি হচ্ছে। ...আচ্ছা সত্যি করে বলো তো, দুষ্টুমির ভঙ্গিতে হাসলেন তিনি, তোমার লাভার দেখতে কেমন?'

মি. বী! ভবিষ্যৎ স্বামী এক জিনিস। কিন্তু লাভার...? জ্যাকবের মাথার বালিশ গুঁজে দিয়ে ফ্রান্সিস নেভিনস জানালার ধারের চেয়ারে গিয়ে বসল। বলল, 'জানি না আমার সম্পর্কে আপনি কি ঠাউরে বসেছেন।'

রাগ করলেন জ্যাকব। 'আমার ধারনা তুমি খুব সুন্দর, মিষ্টি একটি মেয়ে। তবে আজকালকার মিষ্টি মেয়েরা পঞ্চাশ বছর আগের মেয়েদের তুলনায় অনেক আলাদা। আমি খারাপ বা ভাল বলছি না, বলছি আলাদা। আর তোমার বয়স তো আমার স্ত্রীর চেয়েও কম। জানি লোকে আমার বউয়ের দিকে তাকালে আর চোখ ফেরাতে চায় না। তোমাকেও নিশ্চয়ই অনেকে ফিরে ফিরে দেখে।'

'আপনার স্ত্রীর সাথে আমার কিছুতেই তুলনা হতে পারে না। তাঁর মতো সুন্দরী দ্বিতীয়টি দেখিনি আমি।'

শুনলে আমার স্ত্রী খুশি হত, বললেন জ্যাকব। 'যাকগে, এবার তোমার লাভার সম্পর্কে একটু বলো তো শুনি।'

'এত করে যখন শুনতে চাইছেন... লাজুক ভাব ফ্রান্সিসের চেহারায়, তবে ভেতরে ভেতরে খুশি। অবশ্য এখন পর্যন্ত ব্যাপারটা স্থায়ী রূপ পায়নি। মানে আমরা এখনও ডেট-টেট করিনি।'

'করেছ নিশ্চয়ই', বললেন জ্যাকব। 'কিন্তু বলতে চাইছ না। ভাবছ ডেটিং-এর কথা বললে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেব।'

'সত্যি বলছি, মি বম্যান...'

'তবে ডেটিং-এর ডেট ঠিক করেছ কবে?' 'জুনে?'

'জুলাই, বলল মেয়েটি, হাসছে।

'তোমার প্রেমিক নিশ্চয়ই সুদর্শন এবং শক্তিশালী?'

'জ্বী।'

'আর ভদ্র।'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি, উদ্ভাসিত মুখ।

'ভাল কথা, বললেন জ্যাকব। 'ভদ্রলোকদেরই বিয়ে করা উচিত...তবে খুব ভদ্র হলে আবার বিপদ আছে। বেশি ভদ্রলোকরা বেশি আছাড় খায়। আমার কথাই ধরো। আমি অতিরিক্ত ভদ্র সেজে কি করেছি? কোথায় এসে পৌঁছেছি? কোথাও না। তাই একটু আলাদা হতে শিখেছি আমি। তারমানে এই নয় যে আমি আর আগের মতো ভুলচুক করি না। তবে ভুল করলেও সেটা শোধরানোর চেষ্টা করি।...আর ভুল মানুষকে বিয়ে করাটা জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল হয়ে দেখা দিতে পারে। তুমি যার সাথে প্রেম করছ তার নাড়ি-নক্ষত্রের খবর নিশ্চয়ই সব জানো?

'জ্বী। সে খুব অসাধারণ একজন মানুষ। আপনি তাকে চেনেন না, মি. বম্যান। যদি তাঁর সাথে একবার কথা বলতেন' ...থেমে গেল মেয়েটি ঠোঁট কামড়াচ্ছে।

'লোকটি কে জানত বড় ইচ্ছে করছে, বললেন জ্যাকব। 'আমার কোন বন্ধু'

'না, না। তেমন কেউ নয়।'

'ড. হোমস? ঢিল ছুঁড়লেন জ্যাকব।

'আরে না!'

'এই লোক কি আমার অধীনে কাজ করে? চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন জ্যাকব, মেয়েটির চেহারা দেখছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। চার্লস?....না, না। চার্লস না। চার্লসকে তুমি তেমন পছন্দ করো না জানি। করো, ফ্রান্সিস?'

'না করি না, হঠাৎ জ্বলে উঠলো মেয়েটি। ও আমাকে দেখলে এমন ভাব করে যেন আমি...আমি একটা... নিজেকে কেউকেটা ভাবে চার্লস। আসলে ও একটা ইঁদুর।'

মুচকি হাসলেন জ্যাকব। 'ঠিক বলেছ। চার্লস একটা ইঁদুর। ...তাহলে কে হতে পারে? আমার কেয়ারটেকারকেও তোমার সাথে মানাবে না। কারণ সে বুড়ো...থেমে গেলেন তিনি, হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল চাউনি, চোখের তারায় দুষ্টুমি, মুখ হাঁ হয়ে আছে। ফ্রান্সিসের পেছনে তাকালেন তিনি, জানালার বাইরে চলে গেল দৃষ্টি। বললেন, এক মিনিট। একটা ক্লু অন্তত দাও। সে কি কাজ করে? স্টক এবং বন্ড? তেল? টেক্সটাইল? গলায় স্বর ক্রমে উঁচুতে উঠছে। অথবা ট্রান্সপোর্টেশন?

'আপনি জেনেও না জানার ভান করছেন', বলল ফ্রান্সিস। 'আপনি জানেন ওর নাম ভিক। বাজি ধরে বলতে পারি আগেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন আপনি। আপনাকে অবশ্য আগেই আমার বলা উচিত ছিল। কিন্তু- দরজায় ন্‌ক করল কে যেন থেমে গেল মেয়েটি।

'দূর হও', বললেন জ্যাকব।

খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকলেন মিসেস বম্যান। লাল চুল তাঁর। টকটকে হলুদ সোয়াটার আর টাইট স্ল্যাক্সে দুর্দান্ত লাগছে তাঁকে। বোঝার উপায় নেই এই মহিলার বয়স ত্রিশ।

'সবাইকে সুপ্রভাত। না, না। উঠে দাঁড়াতে হবে না। বসো তুমি। বললেন তিনি ফ্রান্সিসকে। 'রোগীর কি অবস্থা?'

ভয়ঙ্কর, বললেন জ্যাকব। হেসে উঠলেন মিসেস বম্যান। হাসিটা প্রাণহীন আর কৃত্রিম লাগল জ্যাকবের কাছে। স্বামীর গালে হাত রাখলেন তিনি। 'রাতে ভাল ঘুম হয়েছে তো'?

'ওর সাথে থাকতে কষ্ট হয় না তোমার?' ফ্রান্সিসকে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস বম্যান। 'জানি না কিভাবে ওকে সঙ্গ দাও তুমি।'

'স্রেফ টাকার জন্যে', বললেন জ্যাকব। 'ঠিক তোমার মত।'

জোর করে মুখে হাসি ফোটালেন মিসেস বম্যান। 'ওর কথা-বার্তা একদম বাচ্চাদের মতো না? ভাল কথা কমলা রঙের বড়িটা ওকে খাইয়েছ?'

'খেয়েছি', বললেন জ্যাকব।

'না। খাননি', বলল ফ্রান্সিস। 'সোয়া ন'টা বেজে গেছে? ইস, আমি-'

'ন'টা বিশ, ঠাণ্ডা গলায় বললেন মিসেস বম্যান। 'আচ্ছা, আমি খাইয়ে দিচ্ছি। টেবিল থেকে একটা ভায়াল খুলে একটা বড়ি নিলেন তিনি গ্লাসে পানি ঢাললেন রূপোর জগ থেকে।

অন্য দিকে মাথা ঘুরিয়ে রাখলেন জ্যাকব। আমি আমার ওষুধ নিজেই খেতে পারি। 'আর তোমাকে নার্সের ভূমিকায় একদম মানাচ্ছে না।' বড়িটা মুখে পুরে পানি দিয়ে ঢক করে গিলে ফেললেন তিনি। তারপর বললেন, 'কলেজ ছাত্রীদের ড্রেস পরে কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?'

'মার্কেটে যাব। শপিং করব।'

'ভিক আপনার গাড়ি রেডি করে রেখেছে' জানাল ফ্রান্সিস। 'পালিশ করায় নতুনের মতো লাগছে।'

'তা তো লাগবেই।'

'নতুনের মতো লাগার কি দরকার। নতুন একটা গাড়ি কিনে ফেললেই পারো, বললেন জ্যাকব।

'নতুন গাড়ি কেনার কথা মাথায় আছে', বললেন মিসেস বম্যান। 'আগে তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো। তারপর দু'জনে চড়ার মতো একটা স্পোর্টস কার কিনব। লং ড্রাইভে বেরুব। শুধু দু'জনে।'

'শুনে আমার আর তর সইছে না', ব্যঙ্গ করলেন জ্যাকব।

স্বামীর বক্রোক্তি গায়ে মাখলেন না মিসেস বম্যান। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে, জানালা বন্ধ করে রেখেছ কেন?' বাইরে কি সুন্দর রোদ দেখেছ?'

'দেখেছি। কিন্তু জানালা খুলে ঠাণ্ডা লেগে মরতে চাই না। মুখে বাঁকা হাসি, মিসেস বম্যান লম্বা আঙুল ছোঁয়ালেন স্বামীর ঠোঁটে, তারপর কপালে খোঁচা দিলেন।

'আজ তোমার চুমু পাওনা হয়নি', বললেন তিনি ঠাট্টা করে। ফিরলেন ফ্রান্সিসের দিকে। ও যদি চ্যাটাং চ্যাটাং করে তাহলে ওর সাথে কথা বলো না। তাহলেই ও ঠিক হয়ে যাবে। ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে হাসলেন তিনি। ঘুরলেন স্বামীর দিকে। 'আজ তাড়াতাড়ি ফিরব।'

'আমার তো আর যাবার কোন জায়গা নেই', বললেন জ্যাকব। 'আমি আছি এখানেই।'

'আসি তাহলে, মিষ্টি করে বললেন মিসেস বম্যান। বেরিয়ে গেলেন।

'দরজাটা বন্ধ করে দাও', ফ্রান্সিসকে বললেন জ্যাকব।

'মিসেস বম্যানকে খুব সুন্দর লাগছিল, তাই না?' দরজা বন্ধ করে জ্যাকবের কাছে ফিরে এলো ফ্রান্সিস। 'ও রকম স্লাকস পরার সৌভাগ্য যে কবে হবে।'

'তোমার প্রেমিককে বললেই পারো। বিয়ের আগে পরবে।' ভিকের কাছে চাইলে ও কিছু মনে করবে না। ওর ভেতরে ঈর্ষা বলতে কিছু নেই। বহুবার আমাকে বলেছে লোকজন যখন আমার দিকে তাকিয়ে থাকে ব্যাপারটা নাকি উপভোগ করে ও।'

'আর ভিক যখন অন্য মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকে?'

'আমি সহ্যই করতে পারি না। জিজ্ঞেস করলেন জ্যাকব।

মেয়েরা তাহলে ভিককে দেখলে খুব আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, না?'

'মাঝে মাঝে এ নিয়ে বিব্রতকর ঘটনাও ঘটেছে। কিছু মেয়ে আছে হ্যাংলা টাইপের। সুদর্শন পুরুষ দেখলেই গলে পড়ে। এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে দুই হপ্তা আগে। নাইট ক্লাবে। সেদিন ভিকের ছুটি ছিল।

ফ্রান্সিসকে কথায় পেয়ে বসেছে। সে বকবক করেই চলল। জ্যাকব জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। স্ত্রীকে দেখলেন লন ধরে গ্যারেজের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। ধীরে সুস্থে,

নিতম্বে ঢেউ তুলে হাঁটছে। যে কোন পুরুষের মাথা খারাপ হয়ে যাবে তার হাঁটা দেখলে।

'মেয়েটাকে দেখলেই বমি আসছিল, বলে চলেছে ফ্রান্সিস। ওকে আমাদের টেবিলে আসতে দেখে খুবই অবাক হয়ে যাই আমি। কুচকুচে কালো চুল। তবে চুলে কদ্দিন চিরুনি পড়েনি কে জানে। ঠোঁটে মনে হয় লিপস্টিকের পুরো টিউবটা খালি করেছে...'

অন্যমনস্কভাবে ফ্রান্সিসের গল্প শুনছেন জ্যাকব, লক্ষ করছেন স্ত্রীকে। গাড়ির কাছে পৌছে গেছে সে, এবার দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল, কথা বলছে ভিকের সাথে। কি একটা কথায় খুব জোরে হেসে উঠল। হাসির আওয়াজ এতদূর থেকে শুনতে পাবার কথা নয়। তবু যেন শুনতে পেলেন জ্যাকব। চটুল, মোহনীয় ভঙ্গির হাসি। শরীরের রক্ত গরম করে দেয়। ভিক একটা পা তুলে রেখেছে গাড়ির বাম্পারে, চওড়া হাতজোড়া ভাঁজ করা বুকের ওপর, হাসছে তার মনিবনীর সাথে তাল মিলিয়ে।

'...মেয়েটা নির্ঘাত মদ খেয়েছে', নিজের গল্পে পুরোপুরি ডুবে গেছে ফ্রান্সিস। 'আমি কল্পনাই করতে পারি না কোন মেয়ের অত সাহস হয় কি করে! অচেনা একজনের কোলে ধপ করে বসে পড়ে তাকে চুমু খেয়ে ফেলল! তাও তার প্রেমিকের সামনে?

'ভিক তখন কি করল? জানালা থেকে দৃষ্টি ফেরালেন জ্যাকব।

'কি করবে? কিছুই না। মানে কিইবা বলার ছিল ওর? চারপাশে লোক গিজগিজ করছে। ও চেষ্টাকৃত হাসি ফোটাল মুখে, ভান করল যেন এটা একটা ঠাট্টা। কিন্তু আমি মেনে নিতে পারছিলাম না ব্যাপারটা। ওদিকে মেয়েটা ভিকের কোল ছেড়ে উঠছিল না। ভিক যে ওকে ঠেলা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবে তাও পারছিল না। কারণ সবাই দেখছিল আমাদেরকে। আমার খুব রাগ হচ্ছিল। আপনাকে একটা কথা বলি, মি. বম্যান। আমার কিন্তু সাংঘাতিক রাগ। বিশেষ করে ভিককে নিয়ে কিছু ঘটলে কি কান্ড করে ফেলি নিজেও বুঝতে পারি না।'

'বেটির মতো কান্ড?' জিজ্ঞেস করলেন জ্যাকব। নিচের ঠোঁট কামড়াল ফ্রান্সিস। 'আপনি ঘটনাটা জানেন জানতাম না তো! ওই ব্যাপারটা নিয়ে আমি সত্যি দুঃখিত, মিঃ বম্যান। আমি লাঞ্চ আনতে কিচেনে ঢুকেছি। এমন সময় দেখি বেটি জড়িয়ে ধরে আছে ভিককে। ধাঁ করে রাগ চড়ে গেল মাথায়।'

'শুনেছি আমি', হাসছেন জ্যাকব। 'বেটি চলে যাবার সময় দেখা হয়নি ওর সাথে। তবে চার্লস বলেছে মেয়েটার চেহারাটা নাকি আর দর্শনযোগ্য ছিল না।'

'বোধহয় বেশি জোরে খামচে দিয়েছিলাম', মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল ফ্রান্সিস। 'সত্যি আমি দুঃখিত। ওর কাছে ক্ষমা চাইতেও গেছিলাম। বেটি আমার কথা শুনতেই চাইল না। যেন সব আমার দোষ।'

'আর নাইট ক্লাবের মেয়েটার কি হলো?'

'মেয়েটার চুল টেনে ধরে ভিকের কোল থেকে নামিয়ে দিয়েছি', লাজুক গলায় নিজের কীর্তির কথা স্বীকার করছে ফ্রান্সিস।' ভিক বাধা না দিলে হয়তো খামচে

মেয়েটার চোখই গেলে দিতাম। মাথায় আগুন ধরে গেছিল আমার। কত বড় আস্পর্ধা, ভিককে চুমু খায়! আমার কাছে ছুরি থাকলে ঠিক খুন করে ফেলতাম শয়তানীকে।'

'তাই নাকি?' বললেন জ্যাকব। ফ্রান্সিসকে ছেড়ে আবার জানালার দিকে ফিরে গেল তাঁর দৃষ্টি। ভিক কিংবা তাঁর স্ত্রী কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। লন ছুঁয়ে গেল তাঁর চোখ, পাথর এবং ব্রোঞ্জের মূর্তির ধারেও কেউ নাই। কভেনি এখনও তার অ্যাজালিয়া বেড নিয়ে ব্যস্ত। মিসেস বম্যানের গাড়ির হুডে একটা অদ্ভুত ছায়া পড়ল তাঁর। চোখ কুঁচকে তাকালেন ওদিকে। ওটা সম্ভবত গাড়ি মোছার ন্যাকড়া ভাবলেন তিনি।

'তো ভিককে নিয়ে এভাবে যে মেয়েদের সাথে মারামারি করো, খারাপ লাগে না?' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'খারাপ লাগবে কেন? আর ভিককে আমি দোষও দিই না। সে তো আর কারও সাথে ভাব জমাতে যায় না। মেয়েগুলোই বরং ওর গায়ে ঢলে পড়ে।'

'ঠিক বলেছ', সায় দিলেন জ্যাকব। চোখ কুঁচকে গ্যারেজের জানালার দিকে তাকালেন। এক পলকের জন্যে হলদে রঙের একটা ঝিলিক যেন দেখতে পেলেন ওখানে। নাকি সূর্যের আলোয় কাঁচের প্রতিফলন দেখছেন? উহু জানালাটা খোলা; সূর্য রশ্মি প্রতিফলিত হয়নি। আবার হলদে রঙের চোখে পড়ল তার। উজ্জ্বল হলুদ রঙের এক টুকরো কাপড়। কোন কিছু থেকে ধীরে ধীরে খসে পড়ছে। এরপর জানালার কাঁচে আর কিছু দেখতে পেলাম না। মুচকি হাসলেন তিনি। 'আমার ধারনা ভিক খুব বিশ্বস্ত।' বললেন তিনি। 'দোষ যদি কারও থাকে তাহলে ওই মেয়েগুলোই দায়ী। তোমার রাগ এবং ঈর্ষা হওয়াটাই স্বাভাবিক। তোমার জিনিসের ওপর কেউ হাত বাড়ালে তুমি তাকে ক্ষমা করবে কেন? রাগের চোটে খুন করে ফেললেও তোমাকে দোষ দেব না। জানোই তো যুদ্ধ আর প্রেমে খুন-খারাবি অপরাধ নয়।'

'ভিক ছাড়া আমি কিছু বুঝি না। ও আমার জান।' কথাগুলো বলার সময় লালচে হয়ে উঠল ফ্রান্সিসের চেহারা।

'তাতে আমার কোনই সন্দেহ নেই', বললেন জ্যাকব। 'তুমি এখন যাও। আমি একটু ঘুমাব।'

'বই পড়বেন?' বলল ফ্রান্সিস। চমৎকার একটা থ্রিলার নিয়ে এসেছি। বাসে বসে পড়েছিলাম। আপনি পড়ে দেখতে পারেন। বই পড়লে ঘুম চলে আসবে তাড়তাড়ি।'

'ধন্যবাদ', বললেন জ্যাকব। রেখে যেয়ো বইটা। তবে যাবার আগে আমার একটা ছোট্ট কাজ করে দাও। বিছানার সাথে লাগোয়া টেবিলের ড্রয়ার খুললেন তিনি। ছোট, ধূসর রঙের একটা রিভলভার বের করলেন। 'ভয় পেয়ো না। এ জিনিস আমি রাখি চোর-ডাকাত মোকাবিলার জন্য। অনেকদিন ধরে ড্রয়ারে পড়ে আছে এটা। সাপসুতরো করা হয়নি। বুঝতে পারছি না কলকজা ঠিকঠাক আছে কিনা। তুমি এটা ভিককে দিয়ে আসতে পারবে? বলবে একটু যেন চেক করে দেয়।'

'পারব না কেন?' ফ্রান্সিস হাত বাড়িয়ে অস্ত্রটা নিল। 'বাহ্, কি হালকা! আমার ধারণা ছিল পিস্তল বা রিভলভার খুব ভারী হয়।'

‘এসব রিভলভার মহিলারা ব্যবহার করে’, বললেন জ্যাকব। ‘মহিলা এবং বুড়োরা। তবে সাবধান। ওটাতে কিন্তু গুলি ভরা আছে।’ গুলিগুলো খুলে নিলেই ভাল হত। কিন্তু কিভাবে খুলতে হয় জানি না।

‘আমি সাবধানেই নিয়ে যাব’, হাতলটা শক্ত করে চেপে ধরল ফ্রান্সিস। আপনি ঘুমানোর চেষ্টা করুন। চার্লসকে বলব আসতে?

‘দরকার নেই। তুমি তোমার প্রেমিকের সঙ্গে গল্প করো গে। কিছুক্ষণ আগে বোধহয় ওকে ওর দোতলায় ঘরে যেতে দেখেছি।’

‘আমি তো জানি ভিক ওর ঘরেই আছে। ঘুমুচ্ছে।’ বলল ফ্রান্সিস।

‘তাহলে ওকে ঘুম থেকে ওঠাও। ছেলেবেলার মতো কানের কাছে “কুক” করে ডাক দাও। লাফ দিয়ে উঠবে।’ হাসলেন জ্যাকব। হাসলো ফ্রান্সিসও। ‘জেগে উঠে যদি রেগে যায় তাহলে কিন্তু বলব আপনিই আমাকে কুবুদ্ধিটা দিয়েছেন।’

‘আচ্ছা বোলো’, বললেন জ্যাকব।

ফ্রান্সিস যাচ্ছে, তার দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর বালিশের মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লেন। চোখ বোজা। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে শরীর। চোখটা লেগে এসেছে এমন সময় প্রথম গুলির শব্দটা শুনলেন তিনি, তার পরপরই আরেকটা গুলির আওয়াজ হলো। তারপর আরও একটা বিস্ফোরণের শব্দ ছড়িয়ে পড়ল লনে। ইচ্ছে করল মাথা তুলে জানালা দিয়ে দেখেন, কিন্তু শরীর টেনে তুলতে কষ্ট হবে বলে চুপচাপ শুয়ে রইলেন। তাছাড়া, ভাবলেন তিনি, কিইবা করার আছে তাঁর? তিনি তো শয্যাশায়ী, পক্ষাঘাতগ্রস্ত একজন মানুষ মাত্র।

